

লেঅনাদোর নোটবই এবং...

নারায়ণ সান্যাল





ভোজ কয় যাহারে : নিম বেঙন থেকে আইসুত্রম ।
 দীঘদিন ধরে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিম্বিগু ভিন্নধর্মী রচনা
 যাতে মুড়ি-মশলার ঠোঙায় রূপান্তরিত হয়ে অস্তিমর্গতি
 লাভ না করে ঢাই এই সংকলন গ্রন্থের আয়োজন ।
 সূচিপত্র পাঠে বোঝা যাবে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের কথা—যা
 এই লেখকের বৈমিষ্ট্য লেখনার্দোর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের
 পাশাপাশি আচার্য সুনীতিকুমারের শিল্পজ্ঞান বা খালেদ
 চৌধুরীর শিল্পসৃষ্টি । কুৎব বা তাজমহলের মূল্যায়নে
 পাশাপাশি প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা কেমনজন ?
 বাস্তবে

boirboi.net

বিভিন্ন সময়ে সাময়িক পত্রিকায় যা প্রকাশ করেছি তার অনেক কিছুই কোনও স্থায়ী মূল্য নেই। কিছু কিছু রচনা পরিবর্তিত বা পরিমার্জিত আকারে হয়তো কোনও বৃহৎ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেমন ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য সংক্রান্ত রচনাগুলি “লা জবাব দেহলী — অপরূপা আত্মা” গ্রন্থে নূতন রূপে স্থান পেয়েছে। আবার সাময়িক পত্রিকায় লেখা কোন কোন রচনা হয়তো আমার ‘মগজস্থ’ গ্রন্থের উপাদান—যেমন এই সংকলন গ্রন্থের প্রথম রচনাটি। লেখনাদর্শের উপর পরিকল্পিত গ্রন্থটি যদি এ জীবনে শেষ করতে না-ও পারি তবু এই রচনাটিকে মুড়ি-মশলার ঠোঙায় রূপান্তরিত হতে দেখলে ওপার থেকেও হয়তো দুঃখ পাব।

পুরাতন রচনার ফাইল-কপি ঘেঁটে এ-জাতীয় রচনা এ পর্যন্ত যা উদ্ধার করেছি তা দুটি গ্রন্থে গ্রথিত করা গেল। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের সঙ্গেই প্রকাশিত হচ্ছে এর যমজ পুস্তকটি : “স্বর্গীয় নরকের দ্বার এবং....”

ক্রেতা-পাঠককে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন যে, এই সংকলনের কিছু কিছু রচনা অন্য কোনও সংকলন গ্রন্থে বা আমারই রচনায় হয়তো পরিবর্তিত আকারে পড়ে থাকবেন।

7392

কলকাতা

নবাবুল হক

কুন্ড ব্যক্তিগত পাঠাগার



www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

সূচিপত্র

লেঅনার্দোর নোটবই	9
গোপ্পদে প্রতিবিম্বিত পুষণ	42
ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য	58
কুব্ব কি হেলানো হিন্দু মানমন্দির	64
আলিওয়াল খাঁ : একজন 'রাজ'-মিস্ত্রির নাম	72
ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্য	95
তাজমহল ও হিন্দু শিল্পশাস্ত্র	106
তাজমহলের নবমূল্যায়ন	112
কলকাতার স্থাপত্য কী ভাবে এল	120
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা : বাতবে	126
হিন্দুধর্মের উষ্মাযুগ ও-আমি	137
প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী	144

ইচ্ছা চাচ্ছাচল



লেওনার্দো যদি 'মোনালিজা' অথবা 'চেনাকোলে' (Last Supper = শেষ সায়াশ) না আঁকতেন, রঙের ব্যটিতে কোনেদিন তুলি না ডোবাতেন তবুও তিনি মানব-সভ্যতার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকতেন শাখতকাল—তীর ঐ নোটবইয়ের জন্য। সারা পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষ নেই যে স্কুলের গভি পার হয়েছে, অথচ ঐ আশ্চর্য নোটবই-এর কথা শোনেনি, অথবা তার দু-পাঁচটা পৃষ্ঠার ছবি দেখেনি। কী নেই সেই নোটবইতে? কী-ভাবে "ট্যাকসালে মূদ্রার উপর ছাপ দিতে হয়, পরিপ্রেক্ষিতের ভেঙিতে কী-

ভাবে দ্বিমাত্রিক চিত্রে গভীরতার আভাস আনা যায়, সিংহের শব্দযন্ত্রের কার্যক্রম, হস্তী-হস্তিনীর একান্ত প্রণয়-পদ্ধতি, মানবদেহে হৃদপিণ্ড-ফুসফুস বা জরায়ুর কার্যকারিতা, ভূণের ক্রমবিকাশ, চন্দ্রকলার হাসবুদ্ধিজনিত কারণে জোয়ার-ভাঁটার হাসবুদ্ধি, কর্তিত বৃক্ষকাণ্ডের বলয়রেখা গুনতি করে গাছের বয়স-নির্ণয়, লেদ-মেশিন, জীবাণু, রিভার্টোরি ফার্নেস, লেন্স-ঘমার সহজ পদ্ধতি, হোডোমিটার, দরজায় ব্যবহারোপযোগী শিখ-সমকিত হিজ ইত্যাদি, 'এটসেট্টা', 'এট অল'; মায় 'পাগ্লা ষাঁড়ে করলে তাত্ত কেমন করে ঠেকাব ভায়!' শেষোক্ত বিষয়টি অবশ্য কিঞ্চিৎ ভয়াতরে: 'ছাঁৎ-ওঠা ঝড়ের কবল থেকে পালতোলা জাহাজকে কী-ভাবে বাঁচানো সম্ভব।'

আমরা জানি, ভাঙ্কর্ষে মিকেলোঞ্জেলো, স্থাপত্যে ভাজমহল পরিকল্পনাক্ষর 'অ্যানন', সুরসৃষ্টিতে বেটোফেন, চলচিত্রে চ্যাপলিন, বিজ্ঞানে আইনস্টাইন কিংবা স্মাইলসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আজও অনতিক্রম; কিন্তু একই ব্যক্তিতে একাধারে বিজ্ঞান-সৃষ্টি-সঙ্গীত-শারীরবিদ্যা-চিত্র-ভাঙ্কর্ষ-স্থাপত্য-জীববিদ্যার এমন আশ্চর্য প্রতিচ্ছা আর কোথায় দেখেছি? প্রতিটি শাখাতেই আনকোরা নতুন আবিষ্কার; তিনি নাকি এয়ারোপ্লেন-প্যারাসুট-হেলিকপ্টারের জনক, শারীর ও শব্দব্যবচ্ছেদ-বিদ্যার প্রথম পথিক, জীবাণুর আবিষ্কারক, জলবিদ্যা বা হাইড্রলিক্স-প্রযুক্তির ভূমীরথ, সমরায়-সেচপ্রণালী-নগরবিন্যাস-চার্টস্থাপত্য-মেটালার্জি-প্রভৃতি প্রভূত প্রজ্ঞার প্রথম প্রবক্তা। শুনলে মনে হয় বীরপুত্রের অভ্যন্ত বিরশিবাবার কোনও অঙ্গ প্রাণিক বুঝি গুরুর গুণকীর্তন করছে।

বাস্তবে কিন্তু এর কোনোটাই পুরোপুরি অস্বীকার করা চলে না।

পুরোপুরি চলে না? তবে কতটা স্বীকার্য? কতটা অতিশয়োক্তি?

সেই স্বতীয়ানই তো লিপিবদ্ধ করতে বাসেছি। বাংলাভাষায়, যতদূর জানি, সে মূল্যায়নের প্রচেষ্টা কখনও হয়নি। ইতালিয়ান, জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজিতে হয়েছে। অন্তত শেখোজটি শিক্ষিত ব্যঙালি পাঠকের অধিকারে। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে বলুন—আমরা কজন তা পড়েছি?

দোষ কিন্তু আমাদের নয়। গ্রন্থগুলি দুঃপ্রাপ্য ও দুর্মূল্যই শুধু নয়, তা যেন শুধু বিশেষজ্ঞের মুখ চেয়ে লেখা। তাই ইচ্ছে থাকলেও আপনার-আমার মতো সাধারণ-শিক্ষিত মানুষ সেখানে কলকে পায় না। আমার পাঠকদের যে ভগ্নাংশ বিজ্ঞান-শিক্ষিত নয়, অথবা আমারই মতো বিজ্ঞানে অর্ধশিক্ষিত, তাঁদের আমি সনির্বন্ধ অনুরোধ করব—এ-কটা পাতা উলটে যাবেন না। এ-টুকু বাদ দিয়ে লেওনার্দোকে জানা যায় না, জানা যাবে না। লেওনার্দো শুধুমাত্র চিত্র-শিল্পী নন।

প্রায় সারাটা জীবন (1452-1519) ধরে এই নোটবইগুলি তিনি লিখেছেন। পাঁচ-হাজার পৃষ্ঠার উপর। ইতালিয়ান ভাষায়; কিন্তু আদ্যন্ত উন্টো করে! যা শুধু আয়নার সামনে ধরলে পড়া যায়। বস্তব্য সর্বত্রই সচিত্র, পাতায় পাতায় ছবি। হবেই! জাত-আর্টিস্ট তিনি। ভাষার চেয়ে ছবি ঐকে তিনি সহজে বোঝান। অথচ আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি আদৌ সুবিন্যস্ত নয়—নিতান্ত এলোমেলোভাবে সাজানো। চিত্রাঙ্কনের বিষয় আলোচনা করতে করতে এসেছেন 'টোটাফেল্লো'-এর ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের গাণিতিক হিসাবে; এবং পরবর্তী আলোচনার প্রসঙ্গ কী হবে—ব্যাক্সের ব্যবচ্ছেদ না চার্চের গম্বুজ—তা খোঁদায় যালুম। ঊঁর মৃত্যুর প্রায় আড়াই শ' বছর পরে একজন গবেষক—জে. বি. ভেগুরি—ঐ পাণ্ডুলিপির বিবিধক পাঠোদ্ধার করেন। অকৃতদ্যর লেওনার্দো তাঁর ঐ পাণ্ডুলিপির পাহাড় দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শেষজীবনের শিষ্যকে। নানান হাত-ফেরতা হয়ে আড়াই শ' বছরে তা একাধিক ধনশালী ব্যক্তির এগ্জিয়ারে বিচ্ছিন্নভাবে চলে যায়। প্রভাববাবু যেমন সারাটা জীবন ধরে রবীন্দ্রনাথ ঘেঁটেছেন, ভেগুরিও তেমনি ঘেঁটেছেন ঐ সাড়ে-বত্রিশ ভাজা পাণ্ডুলিপি। তফাৎ এই, প্রভাববাবুকে দেশদেশান্তরে পাণ্ডুলিপির সন্ধান করতে হয়নি, ছাপা বই তিনি বিস্তারকী গ্রন্থাগারেই পেয়েছিলেন এবং প্রভাববাবুকে গবেষণার সময় কোনও দর্পণের সাহায্য নিতে হয়নি।

ভেগুরি কখনও পৃষ্ঠা সংখ্যা কখনও ব্যাচনার তারিখ মিলিয়ে সেই অতিবৃহৎ পাণ্ডুলিপিকে টোদ্দটি খণ্ডে বিভক্ত করেন। ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে তাদের নামকরণ করেন 'A' থেকে 'N'-খণ্ড। পাণ্ডুলিপি তখনও ছাপা হয়নি, এবং ঐ বিচিত্র পাণ্ডুলিপির কথা পরবর্তী দেড়শ বছর দুনিয়া জানত না। তার মূল্যায়ন প্রকৃত-প্রস্তাবে শুরু হয়েছে নিতান্ত হাল আমলে, বলা যায় গত শতাব্দীর শেষের দিকে। এখনও হচ্ছে।

বলা বাহুল্য উলটো-বক্রে লেখা ইতালিয়ান ভাষায় রচিত সেই পাণ্ডুলিপির ফটো কর্পি আমি দেখিনি, দেখলেও 'ইন্সক্রিপ্ট'-এর মর্মোদ্ধার করতে পারতাম না। ইংরেজিতে বেশ কিছুটা দেখেছি; আমরা এখানে আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা মতো কিছু শ্রেণীবদ্ধ


আলোচনা করব। প্রবন্ধ শেষে 'টীকা' অংশে কিছু ইঙ্গিত দিয়ে গেছি গবেষকদের কথা চিন্তা করে। যেমন, আমি যদি বলি 'massM.fol.62r' তাহলে বুঝতে হবে 'M'-খণ্ডের বাষট্টি নম্বর 'ফোলিও-র' 'r'- চিহ্নিত অংশে তথ্যটি প্রাপ্য। সত্যি কথা বলতে কি শুধু পণ্ডিত বা গবেষক নন, সদিচ্ছমনা সৃষ্টিকের কথা চিন্তা করেও আমাকে এ পরিশ্রমটুকু স্বীকার করতে হয়েছে—অর্থাৎ এই বিবিধবিধাটি মনু-পরাশরের সঙ্গে এক ছিলিমে গাঁজা খেতেন কি না তা আপনারা যাচাই করে জেনে নিতে পারেন।

লেওনার্দো এক বিশ্ববিদ্বান পণ্ডিত। তাঁর বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক হিসাবে দেকার্তে, গ্যালিলেও বা নিউটনইস্রা সী কম? তফৎ এই যে তাঁরা তিনজন তাঁদের আবিষ্কার ও চিন্তাসূত্রগুলি সুসংবদ্ধ প্রাঞ্জল ভাষায় পুস্তকাকারে প্রকাশ করে গেছেন, যা থেকে সমকালীন ও পরবর্তী যুগের বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভুতভাবে উপকৃত হয়েছেন; তাঁরা তিনজনেই নিরঙ্কুশ পণ্ডিত-দার্শনিক বা পণ্ডিতজ্ঞ-সুলেখক ও জাত মাস্টারমশাই।

দা-ভিঞ্চি না লেখক, না শিক্ষক, না মূলত বিজ্ঞানী। তিনি শিল্পী—না ছিল তাঁর কোন 'বোগেতা' (শিল্পশিক্ষা-প্রতিষ্ঠান) না কোনও ছাপা বই। তিনি যে-যুগের মানুষ তখন বই ছাপানো কঠিন হলেও অসম্ভব ছিল না। আর সারা জীবন তিনি বেশ কয়েকজন রাজা-রাজড়ার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। ইচ্ছা করলে তিনি অন্যায়ে বই ছাপাতে পারতেন। কিন্তু সে-চেষ্টা তিনি আদৌ করেননি। কেন? অথচ তিনি পুরোমাত্রায় জানতেন যে, তাঁর পাণ্ডুলিপিতে যে সম্পদ সংগীত আছে তার দাম : সাত পয়জার ! তা অমূল্য ! এই নেতিবাচক মনোভাবের জন্য দা-ভিঞ্চি নিজেই বঞ্চিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশি। তাঁর পাণ্ডুলিপিতে লিপিবদ্ধ করা অনেক তথ্যের আবিষ্কারক হিসাবে আমরা সম্মান দিয়ে থাকি এমনসব বিজ্ঞানীকে যারা জন্মেছেন অনেক-অনেক পরে।

সুতরাং নোটবইয়ের বিষয়বস্তুতে প্রৱেশের পূর্বে ঐ তিনটি রহস্যের কোনও কূলকিনারা করা যায় কিনা দেখা যাক। এক : কেন তিনি দর্পণ-প্রতিবিম্বে পাঁচহাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন। দুই : কেন ঐ বিজ্ঞানী এমনভাবে এলোপাথাড়ি রচনা করেছেন। তিন : কেন তা ছাপেননি ?

রচনার বামাগতি : লেওনার্দো দা-ভিঞ্চির জীবনীতে দেখছি ^(১) তিনি এভাবে উল্টো করে লেখা শুরু করেন একুশ বছর বয়স থেকে। সম্ভবত তিনি স্বপ্নমতভাবে ছিলেন যাকে প্রাক-চৈতন্য আমরা বলি 'পেঁয়ো', অর্থাৎ তাঁর বাঁ-হাতটাই অগ্রণী চলত। ^(২) তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টি রচনা বা ডিএ, বাঁ-হাতে লেখা বা আঁকা। ইহাে তাঁর এই স্বভাবগত বামহস্ত-কুশলতাকে বাণ্যে ও কৈশোরে ধমক দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। করেছিলেন তাঁর অভিভাবক অথবা শিক্ষক। বয়ঃপ্রাপ্তির মূহুর্তে স্বাধীনতার স্বাদ পাওয়ার পর তিনি বাঁহাতে লিখতে ও আঁকতে শুরু করেন। ফলে তিনি দিশ্চলিতকলায় এক বিচিত্র ব্যতিক্রম—একমাত্র সত্যসচী, যার জ্ঞান-বুদ্ধি দুহাতই সমান চলে।

আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করার মতো। তিনি ছবিতে ছায়াপ্রথ বা 'শেড' দিতেন উল্টো দিক থেকে। আক্ষরিকভাবে ডান-থেকে বাঁয়ে এবং উপর থেকে নিচে টান দিয়ে ছায়াপাত ঘটাই এভাবে :  অথচ লেওনার্দোর যে-কোনো স্কেচ লক্ষ্য করে দেখুন

‘শেড-রেখা’ পড়েছে এইভাবে : ∞ এ জন্যই মনে করছি নর্মান কার্পেন্টারের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। লেওনার্দো ‘আক্ষরিক’-অর্থে স্বভাবতই ‘বামপন্থী’।

তা বাঁ-হাতে তো অনেকেই লেখেন, কই তাঁরা তো দর্পণ-প্রতিবিম্বে লেখেন না ! এ যেন গারফিল্ড সোবার্ব বাঁ-হাতি ক্যাটস্ম্যান হিসাবে ক্রিকে এসে দাঁড়ালেন শির-পা হয়ে। এতটা ব্যাড়াবাড়ি কিসের জন্য ? নিঃসন্দেহে তার হেতু : গোপনীয়তা। গ্যালিলেওর (1564-1642) দুর্ভাগ্য তখনও অনাগত, ব্রুনোর (1548-1600) দুর্ভাগ্যের ইতিহাস তাঁর অজানা। বৈজ্ঞানিক ব্রুনো প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের মূলে কুঠারঘাত করেছিলেন বলে তাঁকে জীবন্ত দহন করা হয় ! লেওনার্দো-দ্য-ভিন্সি তার আগেও অনেক বৈজ্ঞানিকের নিগ্রহের কথা কিন্তু প্রত্যক্ষ জানে জানতেন। তাই তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে, তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তদানীন্তন পণ্ডিতসমাজ, বিশেষ করে চার্চ সম্প্রদায়, সহ্য করবে না। তিনি গোপনে কম-সে-কম ত্রিশটি মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করেছেন মানবদেহের অভ্যন্তরভাগকে জানতে। সেটা ছিল সে আমলে বে-আইনি। ধরা পড়লে হয়তো তাঁকেও জীবন্ত দহন করা হত। তাছাড়া তাঁর মৌলিক গবেষণা যাতে চুরি হয়ে না যায় তাই এই সাবধানতা। শুধুমাত্র উলটো করে লেখা নয় ; মাঝে মাঝে তিনি ধাঁধার মতো দুর্বোধ্য। ইচ্ছামতো সংক্ষেপ করেছেন রচনা, ব্যক্তিগত যতিচিহ্ন ব্যবহার করেননি, সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহারে রচনা ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বোধ্য করেছেন। কোথাও গাণিতিক ব্যাখ্যায় ধাপ ডিঙিয়েছেন—যাকে সাদা বাংলায় বলে ‘স্টেপ্ জাম্প’ করা—কোথাও বা ‘খারাগোল’ লিখতে ছড়া রচনা করেছেন : পায়ে ধরে সাধা, রা নাহি দেয় সাধা...

কেন এই বিচিত্র শৈলী ? একটিই হেতু। নোট বই : নোটবইই। লেওনার্দো সজ্ঞানে অসংলগ্ন হয়েছেন, দুর্বোধ্য হয়েছেন, দর্পণ-প্রতিবিম্বে রচনা করেছেন তার হেতু—ঐ রচনার পাঠক মাত্র একজন : তিনি নিজে। এই নোটগুলি অবলম্বন করে ভবিষ্যতে সুসংবদ্ধ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। সব মৌলিক বড়ো জাতের রচনার পিছনেই থাকে এক-একটা নোটবই। লেওনার্দোকে ধরব বলে আমি নিজেই বছর তিন-চার ফাঁদ পেতে বসে আছি। ইচ্ছা একটা বড়ো জাতের বই লিখব ; আকারে বড় হলেও তা মৌলিক রচনা নয়। ইতালিয়ান ভাষা আমি জানি না। ফলে মূল রচনা আমার অসম্ভবগম্য : তবু সেই সামান্য গ্রন্থ রচনার জন্য আমাকে তিন-চার বছর ধরে একটি নোটবইয়ের পাতা ভরাতে হচ্ছে। সেখানে বর্ষশুদ্ধির দিকে আমি নজর দিই না, ব্যাকরণশিক্ষণেও তেমন রেষা কলম চালাই। মার্জিনে টুকরো কথা, সাঙ্কেতিক সংক্ষেপিত ইঙ্গিত, সরই আছে। কারণ আমি জানি, তার পাঠক আমি নিজে। আমার বইটি রচনা শেষ হলে নোটবইটি দিয়ে চানচুরের চোঙ বানানো হবে। লেওনার্দোও একই উদ্দেশ্য নিয়ে—অর্থাৎ ভবিষ্যতে সুবিন্যস্ত গ্রন্থরচনার মূল উপাদান হিসাবে সারাদীর্ঘ ধরে তাঁর নোটবই লিখে গেছেন। একবার সন্দেহাতীত প্রমাণ আছে তাঁর লেখাটাই, “ফ্লোরেন্সে পেরো দ্য ব্রাচ্চিও মার্তেল্লোর ভদ্রাসনে অদ্য বাইশে মার্চ, 1508 তারিখে এই খণ্ডটি লিখিতে শুরু করিলাম ; বিভিন্ন সময়ে আমি যথ্য চিন্তা করিয়াছি গ্রন্থে তাহা প্রত্যহ লিপিবদ্ধ করিয়াছি ; এখনও বা অসংলগ্নভাবে। আশা প্রার্থি, ভবিষ্যতে তাহা বিময়বৎ অনুসারে পুনর্বিন্যাস

করিব। আশঙ্কা হয় : একই কথা এখানে আমি হয়তো বারে বারে বলিব। হে পাঠক ! এ জন্য আমাকে গালমন্দ করিও না। এ রচনা তোমার জন্য নয়, আমার জন্য। অসংখ্য জাগতিক বিষয়ে আমার নিরন্তর কৌতূহল এবং আমার স্মৃতিশক্তি এত তীক্ষ্ণ নহে যে, নিজেকেই ধমক দিব : “এ-কথা আবার কেন লিখিতেছ ? পূর্বেই তো ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছ।” কি জানি, পূর্বে কবে-কখন কী লিখিয়াছি তাহা যাচাই করিতে হইলে প্রতিবারেই পূর্বতন পাণ্ডুলিপির আদ্যন্ত তন্মাস করিতে হয় ! সে বড় বিড়ম্বনার। সময়ও যে অল্প। প্রতিটি রচনার মাঝখানে কালের ব্যবধান তো বড়ো কম নহে।”^(৩)

নোটবই রচনার উদ্দেশ্য এবং তার বিচিত্র শৈলীর ব্যাখ্যা ঐ উদ্ধৃতি থেকে কিছুটা পাওয়া গেল। পাঠকের অস্তিত্ব সহজে তিনি সচেতন। তাকে সম্বোধনও করেছেন স্থানে স্থানে। এমনকি বক্ষিমী রসিকতাও। উভয় অর্থেই। নির্মলকুমারীর সঙ্গে মানিকলালের প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিগুণ বর্ণনা দিয়ে বক্ষিম নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন—বড় বেশি তাড়াহুড়ো করা হল। কিন্তু সেজন্য কোথায় লজ্জিত হবেন, তা নয়, উলটে ধমক দিলেন হতভাগ্য পাঠককে : “বোধ হয় কোর্টশিপটা পাঠকের বড় ভাল লাগিল না। আমি কি করিব ? ভালবাসাবাসির কথা একট্যাও নাই—বহুকাল সঞ্চিত প্রণয়ের কথা কিছু নাই—‘হে প্রাণ ! হে প্রাণধিক !’ সেসব কিছুই নাই...ধিক !” এর সঙ্গে তুলনা করুন লেওনার্দোর পাণ্ডুলিপির একটি পঙ্‌ক্তির। বক্ষিম যেমন গঙ্গাবতরণ কালে ঐরাবতের মতো কাহিনীর দুর্বীর গতির সঙ্গে ভাল রাখতে প্রণয় কাহিনীর ছাঁটকাটি করে ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছেন, লেওনার্দোও ঠিক তেমনি মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আনন্দে, দুর্বীর আন্তরবেগের তাড়নায় অঙ্কে ‘স্টেপ-জাম্প’ করেছেন। এবং বক্ষিমী-চণ্ডে পরক্ষণেই প্রণিধান করেছেন যে, তথ্যটা সাধারণ পাঠকের বোধগম্য হবে না। কোথায় সেজন্য লজ্জিত হবেন, তা নয় তিনিও উলটে পাঠককে ধমক দিচ্ছেন, “পাঠক বুঝিবে না ? আমি কি করিব ? ভূমিকাতেই তো বলিয়াছি—‘Let no man who is not a mathematician read the elements of my works’ (গণিত যাহার আয়ত্তাধীন নহে তাহার জন্য আমার রচনারাজ্যে প্রবেশ নিষেধ)।”^(৪)

এ-কথা সন্দেহাতীত যে, এই বিভিন্ন নোট-পৃষ্ঠাগুলির সাহায্যে এক-একটি একাধিক গ্রন্থ রচনার বাসনা ছিল তাঁর। দুর্ভাগ্যবশত সে কাজে তিনি সারাজীবন ব্যস্ত হতে পারেননি। কিছুটা দায়ী তাঁর চরিত্রগত পল্লবগ্রাহিতা—ক্রমাগত তিনি বিদ্যা থেকে বিষয়াস্তরে ঝুঁকছেন ; কিছুটা তাঁর ভাগ্য—রাজা-রাজড়ার খুঁয়ালে তিনি ক্রমাগত ভেসে বেড়িয়েছেন ; কিছুটা তাঁর চরিত্রগত দীর্ঘসূত্রতা (সুফারার অধারোহী মূর্তি, শেষ-সায়মাশ প্রচীর চিত্রই শুধু উদাহরণ নয়—লেওনার্দোর নিজের মতো মোনালিসা তাঁর অসমাপ্ত চিত্র)। তাই অতি বৃদ্ধ বয়সেও পুষ্পনগরীর^(৫) এই অজীব নাগরিক ক্রমাগত পুষ্পচয়ন করে গেছেন, মালাকারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেননি। পারলে কী হত সে-কথা আপনাদের বিবেচ্য।

সমালোচকের অভিযোগ : দা-ভিগ্লির এই নোটবইগুলির প্রভূত সুখ্যাতি সত্ত্বেও লক্ষ্য করে দেখছি কট্টর সমালোচকেরা তিনজাতের অভিযোগ এনেছেন :

এক : তাঁর ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির নির্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ (definition) নেই।

দুই : এই বিজ্ঞানী স্থানে স্থানে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসী।

তিন : বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় স্বচ্ছন্দ পরিক্রমাকালে লেখকের রচনা আদৌ সূচীমুখ হয়নি !

হয়তো তিনটি অভিযোগই সত্য ; কিন্তু সেজন্য দায়ী কে ? লেখক ? না ! দায়ী সেই 'যুগ', অপরাধী সেই 'কাল'। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক শব্দের সুনির্দিষ্ট অভিধা তখনও সৃষ্টি হয়নি ; বক্ষ্যায়ুগের অন্ধ-বিশ্বাসের অমরাত্রির অবসানে লেওনার্দো জন্মেছিলেন, উহার প্রথম আলোকচ্ছটার ব্রাহ্মমুহুর্তে—পাথির কাকলি তখনও জাগেনি, বিজ্ঞান নিশ্চিন্তে তখন ঘুমাচ্ছিল পাশবাশিশ আঁকড়ে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রহলে তখন পৃথিবী স্থির ; পৃথিবীর কেন্দ্রহলে রোম নিশ্চল ; রোমের কেন্দ্রহলে ভাটিকান গতিহীন এবং ভাটিকানের কেন্দ্রহলে মহ্যমহিম পোপ স্বাবর। সূর্যসম্মত যাবতীয় গ্রহনক্ষত্র সেই কেন্দ্রস্থিত অচল-অনড় পোপকে আবর্তন করছে। তখন গতির কথা বলতে পারাই তো যুগান্তরের উত্তরণ ; 'ত্বরণ' এর ধারণা তখন আশা করি কেবল মূর্খামিতে ? ফলে লেওনার্দো ব্যারে ব্যারে 'গতি' ও 'ত্বরণ'—'ভেলসিটি' ও 'অ্যাকসিলারেশন' গুলিয়ে ফেলেছেন। অতিপ্রাকৃত তত্ত্ব তাঁর রচনায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু তা কি অস্বাভাবিক ? বিজ্ঞানজগতের উপর সেযুগে যে অতিপ্রাকৃতির ছিল একচ্ছত্র অধিকার। বরং বলব, লেওনার্দো সেই ত্রিশীর্ষ-দৈত্যের সঙ্গে এক হাতে পাঞ্জা কাষে গেছেন। 'ত্রিশীর্ষ' শব্দটা ব্যবহার করেছে দুটি কারণে। প্রথম কথা রেনেসাঁস-যুগে ঐ অতিপ্রাকৃত দৈত্যটার কথা চিন্তা করলেই আমার মনশ্চক্ষে ভেসে ওঠে আবোল-তাবোল-এর সেই 'ভয় পেওনা' কবিতাটির তিন-শিংওয়াল্য দৈত্যটির চিত্র। অন্ধযুগের শেষরাত্রে যে কোনও প্রগতিশীল পণ্ডিতকে দেখে সে আদর করে ডাকত—'এস এস গর্তে এস, বাস করে যাও চারটি দিন/আদর করে শিক্যে ভুলে রাখব তোমায় রাত্রিদিন।' অনেকেই তার কুহকী মায়ায় ভুলে ঐ গহ্বরে প্রবেশ করত। আর বার হয়ে আসত না ! মনে আছে নিশ্চয়, ছবির সেই দৈত্যের মাথায় ছিল তিনটি শিং।

দ্বিতীয়ত সে আমলে রাজা-রাজড়া খনবানেরা ক্রমাগত তিনটি শিংয়ের খঁতো খেয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। সেই তিনটি বুজবুকির শিং হচ্ছে : এক—লোহা থেকে সোনা তৈরি ; দুই—মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃত (elixir of life) বানানো এবং তিন—'বিনা ইন্ধনে অমৃতগতির অধিকারী হওয়ার উপযুক্ত যন্ত্রনির্মাণ।' এই তিনজাতের বুজবুকিকে প্রতিহার করে অনেক-অনেক তথাকথিত বৈজ্ঞানিক রাজা-রাজড়ার মন্তকে পুনর্জন্ম-বিদীর্ণ করেছেন। বিজ্ঞানের উষা-মুহুর্তে দাঁড়িয়ে এই একক চিত্রশিল্পী-বিজ্ঞানী দুন্দুভ বলে গিয়েছিলেন—এ তিনটির একটিও হবার নয়, হবে না ! বলেছিলেন, মানুষ একাদিন মাটি ছেড়ে আকাশে উড়বে কিন্তু লোহা কোনোদিন সোনা হবে না। পরবর্তী অর্ধসহস্রাব্দীতে দেখতে পাচ্ছি ইউরেনিয়াম ভেঙে ক্রিপটন-বেরিয়াম স্ফেট ও আজও আমরা লোহা থেকে সোনা পাইনি—মানুষ আকাশে উড়ছে কিন্তু অমৃত অমৃতগতি আজও বিজ্ঞানের অনায়ত্ত ! 'অমৃতগতি' (perpetual motion) প্রসঙ্গে তিনি তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে নোটবইতে লিখেছিলেন,

“অনন্তগতির হবু আবিষ্কারকগণ ! আর কতকাল এইভাবে পরীক্ষার বৃজবুকি চালাইবে ? তোমরা বরং—ঐ যন্ত্রেরা অনায়াসে লৌহ হইতে স্বর্ণ পয়সা করিতে সক্ষম হইয়াছে উহাদের দলে ভিড়িয়া পড়।” (১)

কারণ ‘কার্য, শক্তি এবং ক্ষমতা’ এই তিনটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা—যা নাকি পরবর্তী বিজ্ঞানীরা লিপিবদ্ধ করেছেন, তাদের মৌল স্বরূপটি তিনি ধরতে পেরেছিলেন ; কিন্তু ভাষায় প্রকাশ করতে পারেননি ! কী ভাবে তাদের মাপা যাবে, কী ‘একক’ তাদের হওয়া উচিত তার নাগাল পাননি ; কিন্তু তথ্যগুলির বনিয়াদে প্রবেশ করেছিলেন ঠিকই ! তাই বলতে পেরেছেন, “কোনো অচেতন পদার্থ স্বয়ংক্রিয় হইতে পারে না। সুতরাং কোনও অচেতন পদার্থকে গতিশীল দেখিলে সিদ্ধান্তে আসিলে যে, তাহাতে দ্বিতীয় কোনও ক্ষমতা প্রভাব বিস্তার করিতেছে। এই দ্বিতীয়োক্ত প্রাথমিক ক্ষমতাকে (মূল ইতালিয়ান শব্দটা কী ছিল জানিনা, ইংরাজি অনুবাদে কেউ বলেছেন *motive power*, কেউ *prime mover*) সরহিয়া লও, দেখিবে অচেতন পদার্থটি অচিরে গতিশীল হইয়া যাইবে।” (২)

‘অচিরে’ শব্দটা লক্ষণীয়, কারণ এটি ‘গতিজাডা’ আবিষ্কারের পূর্বযুগের রচনা।

আমার পক্ষে সবচেয়ে মুশকিল এই যে, ষোড়শ শতাব্দীর লেখকের পক্ষে এই রচনা—*work, energy* এবং *power*—এর পারস্পরিক সম্পর্কের এই আদিম বিশ্লেষণ যে কতো বড়ো বৈপ্লবিক চিন্তা তা আজকের দিনের পাঠককে বুঝিয়ে বলতে পারছি না !

একই পাণ্ডুলিপিতে বেশ কয়েক পৃষ্ঠা পরে তিনি ঐ সাধারণ তত্ত্বের একটা বাস্তব উদাহরণ দিয়ে পাঠককে তত্ত্বটা আরও প্রাঞ্জল করে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, “মনে কর, জলের বেগে একটি চক্র ঘূর্ণমান হইল। চাকাটি ততক্ষণই ঘুরিবে যতক্ষণ নূতন জলের তোড় আসিতে থাকিবে। প্রথম জলবেগের ঝাঝা নিঃশেষিত হইলে চক্রটি নিশ্চল হইয়া যাইবে।” (৩)

লক্ষণীয় পূর্বোক্ত সূত্রের ‘অচিরে’ শব্দটির কিছু ব্যাখ্যা এখানে আছে—‘জলবেগের ঝাঝা নিঃশেষিত হইলে’।

কটর সমালোচকদের তিন নম্বর অভিযোগটি ছিল—লেওনার্দোর বৈজ্ঞানিক রচনা সৃষ্টিমুখ নয়। এবিষয়ে সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দাখিল করেছেন প্যারিসপ্রবর সি. এইচ. হোমস্। তাঁর একটি রচনার আংশিক অনুবাদ শোনাই—“বৈজ্ঞানিক আলোচনা একমুখী হওয়া বাঞ্ছনীয়, এ-কথা অনস্বীকার্য। বর্তমান পৃথিবীতে চলছে পেশানাইজেশনের জমানা। তাই ইদানিং মনোগ্রাফ লেখার হিড়িক। কিন্তু পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বিজ্ঞান ছিল দিগন্ত-অনুসারী অকর্ষিত কুমারী ভূমিভাষী বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওয়ারিস সে-ভূমিতে নিজ নিজ এস্ত্রিয়ার জারি করে তখনও বাউভারি-পিলার পৌতেনি। গোটা রাজ্যটাই ছিল আদি মালিক প্রাকৃতিক বিশ্বাসের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য। ফলে বিচরণ ক্ষেত্রে লেওনার্দো স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্রবিশ্ববী—কোনও রাজ্যের ভৌগোলিকসীমা অতিক্রমণের প্রশংসাই তখন ছিল অসিদ্ধ।” (৪)

পূর্বসূরীদের কাছে লেওনার্দোর ঋণ : গ্রীক উনি আদৌ জানতেন না। লাতিন জানতেন

অতি সামান্য। কোনও বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পাননি পিতার এই অবৈধ সম্ভান। অথচ সমকালীন পণ্ডিতেরা যা কিছু গবেষণা করতেন তা হয় মূল গ্রীক অথবা লাতিন থেকে। ইতালিয়ান ভাষায় তখন গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত মুষ্টিমেয়। স্বরণে রাখা দরকার যে, ইতালিতে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ আত্মপ্রকাশ করে 1465 খ্রীষ্টাব্দে; অর্থাৎ লেওনার্দো তখন তের বছরের বালকমাত্র। তাও প্রথম দিকের কয়েক দশকে ছাপা হয়েছে শুধুমাত্র বাইবেল, ধর্মগ্রন্থ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সাহিত্য। তার অনেক পরে ছাপা শুরু হল বিজ্ঞান-বিষয়ক পুস্তকাবলী; অর্থাৎ ততদিনে লেওনার্দোর রচনার প্রায় ব্যাধি আনা সম্পূর্ণ! সুতরাং লেওনার্দো যে কেমন করে তাঁর পূর্বসূরীদের নাগাল পেয়েছিলেন সেটাই একটা প্রকাণ্ড বিষয়। যদি প্রতিপ্রশ্ন করেন, পূর্বসূরীদের রচনার বিষয়ে যে তিনি অবহিত এটা কেন ধরে নিচ্ছেন? তাহলে বলব, গুলে দেখা গেছে—পাঁচহাজার পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিতে অন্তত বাহ্যন্তরজন পূর্বসূরীর উল্লেখ আছে।

ষাটশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই আরিস্তটল্ এবং আরবীয় পণ্ডিতদের রচনা লাতিন ভাষায় অনূদিত হতে থাকে—যদিও তা পাওয়া যেত শুধু পুঁথির আকারে। মেসিচি ও স্ফরজা-রাজের গ্রন্থাগারে ছিল কিছু পাণ্ডুলিপি, কিছু ডোমিনিকান ও ফ্রান্সিস্কান যাজকদের সংগ্রহশালায়। সমকালীন ইতালীয় পণ্ডিত লেওঁআলবের্তি (1404-1472), পাওলো তস্কানেল্লি (1397-1482) দা-পার্তো প্রভৃতি ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে বড়। তাঁদের তিনজনের সঙ্গে লেওঁ-র ঘনিষ্ঠ আর্থিক যোগাযোগ ছিল। ফলে ঐ সব পণ্ডিতদের মাধ্যমেও তিনি নিশ্চয় প্রাগ্বর্তী জ্ঞানরাজ্যের ধ্যান-ধারণার নাগাল পেয়েছিলেন।

সে-আমলে দার্শনিক ও পণ্ডিতদের জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজ্যে প্রবেশের ছিল তিনটি রাজপথ। লেওনার্দো ঐ তিনটি সড়ক ধরেই যতটা তাঁর ক্ষমতায় সম্ভব গিয়েছেন। সড়ক তিনটি হচ্ছে : এক—গ্রীক চিন্তাধারা; দুই—রোমক ও অন্যান্য চিন্তাসূত্র; তিন—আরবীয় বিজ্ঞানীদের পথ।

(ক) গ্রীক-প্রভাব : গণিত ও পদার্থবিদ্যায় আরিস্তটল্, আর্কেমেডেস ও ইউক্লিড; শারীর-বিদ্যায় গ্যালেন, গণিত-জ্যোতিষে টলেমি—এই পাঁচজনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

আরিস্তটল্—কীভাবে ও কী ভাষায় জানিনা—উনি নিশ্চয় পড়েছিলেন F-কারণ F-পাণ্ডুলিপিতে দেখছি ঐ গ্রীক পণ্ডিতের একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব—তুল্যদণ্ড বা ব্যালেন্সের ধর্ম—লেওনার্দো সুসংবদ্ধভাবে আলোচনা করেছেন। আরিস্তটল্ হিতি ও গতিবিজ্ঞানের মধ্যে কোনও পার্থক্য করেননি—সে চিন্তাধারা পরবর্তী কালের। তুল্যদণ্ডের সাম্য (equilibrium)—বিষয়ে ছয়টি স্বতঃসিদ্ধকে লেওনার্দো যেভাবে লিপিবদ্ধ করে বিজ্ঞানের আওতায় এনেছেন তা আরিস্তটল্-অনভিজ্ঞের স্বপ্নে করা প্রায় অসম্ভব। অথচ লেওনার্দোর বোধগম্য ভাষায় আরিস্তটল্ সে-আমলে লভ্য ছিল এটাই বা প্রমাণ করতে পারছি কই? তবে কি ধরে নেব কোনো গ্রীকভাষায় পণ্ডিতের কাছে শুনে শুনে এতবড়ো কাণ্ডটা তিনি করেছেন, গ্রীকভাষা নষ্ট জেনেই। জগন্নাথ তর্কপণ্যাননের প্রচলিত সাক্ষ্যদানের কাহিনীর মতো?

আর্কেমেদেস-এর (আ: 287-212 খ্রী: পূ:-) প্রভাব আরও বেশী। স্বাভাবিক ভাবেই—কারণ আরিস্তটল্ অপেক্ষা আর্কেমেদেস-এর রচনা আরও বিজ্ঞান-ঘেষা। বিশ্ববিজ্ঞানে আর্কেমেদেস-এর অবদান মূলত দ্বিধারায়—দ্বিমাত্রিক বস্তুর ভারকেন্দ্র (centre of gravity of plane figures) নির্ধারণে এবং ভাসমান নিমজ্জমান পদার্থের ধর্ম-বিষয়ে। প্রথমটিকে বলা যায় যন্ত্রবিজ্ঞানের—‘মেকানিক্সের’—জয়যাত্রার প্রথম শত্খনির্যোষ। দ্বিতীয়টি উদ্ভৃতিবিজ্ঞানের—হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের—আদি বনিন্যাদ। লেওনার্দো—আবার বলি কোন ভাষায় জানি না—দুটি গ্রন্থই যে পাঠ করেছিলেন এটা প্রায় সন্দেহাতীত। পাঠ না করে থাকেন তবে গুলে খেয়েছেন। যেহেতু ঐ সূত্রগুলি ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে তার যথার্থ্য, প্রতিষ্ঠা, অপনোদন প্রভৃতি অনেক কিছু আলোচনা করেছেন।

ইউক্লিড সম্ভবত আর্কেমেদেস-এর সমকালীন পণ্ডিত (আঃ তৃতীয় খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ)। জ্যামিতি-বিজ্ঞানের আদিসূরী। অথচ অভ্যন্তর আশ্চর্যের কথা অধিকাংশ পরবর্তীকালীন গণিতজ্ঞের দল ইউক্লিডের নামোল্লেখ মাত্র করেননি। তাঁরই উপপাদ্য-সম্পাদ্য ব্যবহার করে অগ্রসর হয়েছেন, অথচ কোথাও মূল রচয়িতার স্বীকৃতি নেই। পশ্চিমজগৎ বহুত ইউক্লিডকে পুনরাবিস্কার করেছে আরবীয় রচনাকে অনুবাদ করতে গিয়ে। 970 খ্রীষ্টাব্দে সিরাজ-নগরীর পণ্ডিত বেনি মৌচা লিখিত একটি তথাকথিত মৌলিক জ্যামিতির বই বাস্তবে আদ্যন্ত ইউক্লিড অনুসৃত। রচনাশৈলী, বিন্যাস সবই ইউক্লিডের ছন্দে। সবচেয়ে মজার কথা, এই আরবি গ্রন্থের লেখক তাঁর জ্যামিতিক নকশায় যে অক্ষর (ধ্বনি) গুলি ব্যবহার করেছেন সেগুলি আরবীয় ভাষায় বর্ণমালা ধরে আদি বর্ণগুলি নয়; সেগুলির ধ্বনি পরপর ইংরাজী বর্ণমালার a, b, g, d, e, z, h, t—এই পর্যায়; যা নিঃসন্দেহে গ্রীক বর্ণমালার আদি বর্ণগুলির পর্যায়ক্রমে; আল্ফা, বিটা, গামা, ডেল্টা, এপ্সাইলন থেকে থিটা। প্রশ্ন হচ্ছে লেওনার্দো কার বই পড়ে জ্যামিতির আলোচনা করেছেন? বেনি মৌচার তথাকথিত প্রামাণিক-গ্রন্থ থেকে? নাকি ইউক্লিড থেকে? ইতিহাস^(৩) বলছে আরবীয় ভাষা থেকে ইউক্লিডকে লাতিন ভাষায় অনুবাদ করা হয় 1482 খ্রীষ্টাব্দে, যখন লেওনার্দোর বয়স ত্রিশ। সে যাই হোক, লেওনার্দো ইউক্লিড সম্বন্ধে সম্বন্ধ অবহিত ছিলেন একথা ধরে নেওয়া যায়—কারণ উপপাদ্যগুলির পর্যায়ক্রম আলোচনা তাঁর পাণ্ডুলিপিতে বর্তমান।

টলেমি (আ: 90-168 খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন মিশরের মহানগরী আলেকজান্দ্রিয়ার অধিবাসী। তাঁর গ্রন্থ ‘মহাজাগতিক নিয়ম’ (ইংরাজিতে ‘The Great Compendium of Astronomy’) প্রথমে আরবীয় ভাষায়, পরে সেখান থেকে লাতিনে অনূদিত হয়। গণিত-জ্যোতিষ বিজ্ঞানে তিনি ‘কোপারনিকাস’-এর পূর্বসূরী। টলেমির মতে মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে পৃথিবী অবস্থিত; সূর্যমণ্ডল সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র সেই কেন্দ্রস্থিত পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এই ভ্রান্ত ধারণার সম্ভ্রমশোধন করে সূর্যকে এই সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে সংস্থাপন করার কৃতিত্ব বিজ্ঞান-নিরাক্রুশভাবে দিয়ে এসেছে যে জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে তিনি কোপারনিকাস (1473-1543)। তিনি ছিলেন লেওনার্দোর চেয়ে বয়সে একুশ বছরের ছোটো। কোপারনিকাস-এর ঐ যুগান্তকারী গ্রন্থটি (De Revolutionibus) রচিত হয়

লেওনার্দোর মৃত্যুর এগারো বছর পরে। এই গ্রামাণ্য তথ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এবার শুনুন লেওনার্দো টলেমির ঐ থিয়োরির বিষয়ে তাঁর অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে কী বলেছেন: “il sole no si muovo”—অর্থাৎ “সূর্য আদৌ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে না”। ঠিক কোন তারিখে ঐ পংক্তিটি তিনি লিখেছিলেন তার উল্লেখ নেই; কিন্তু পরপৃষ্ঠায় তারিখ আছে : এপ্রিল, 1489।

অর্থাৎ গ্যালিলেও ভূমিষ্ঠ হতে তখনও পঁচাত্তর বছর বাকি, এবং কোপারনিকাস তখন ষোল বছরের নাবালক। বেচারি লেও!

গ্যালেন বা ক্লডিয়াস গ্যালেন নাম একজন মহাপণ্ডিত। গ্রীক, যদিও দীর্ঘদিন আলেকজান্দ্রিয়াতেও ছিলেন। টলেমির মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ছিল প্রায় ত্রিশ। তিনি ছিলেন একজন অতিবিচক্ষণ ভেষজ-বিজ্ঞানী ও শল্য-চিকিৎসক। রোমান সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস-এর তিনি ছিলেন ব্যক্তিগত চিকিৎসক। শবব্যবচ্ছেদ ও নাড়ি-দেখার ব্যাপারে তিনিই পশ্চিমযাঙে আদিসূরী। শরীর বিজ্ঞান বা ‘অ্যানাটমি’ তাঁর প্রিয় বিষয়। এ-ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিদ্যার ধারে-কাছে যিনি যাননি সেই লেওনার্দো তাঁর নোটবইতে একের পর এক গ্যালেনের শাস্ত তথ্য সংশোধন করে গেছেন। কেমন করে তা সম্ভব হয়? তিনি গোপনে শবব্যবচ্ছেদ করেছেন এবং মৃতদেহের অভ্যন্তরের যে নিখুঁত চিত্র ঐকেছেন তা বিস্ময়কর! গ্যালেনের দুটি শাস্তি-সংশোধনের কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। প্রথম: গ্যালেন লিপিবদ্ধ করে যান মানব দেহে হৃৎপিণ্ডের প্রয়োজন নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য। লেওনার্দো সে কথা নাকচ করে লিখছেন হৃৎপিণ্ডের কাজ রক্ত-সঞ্চালন—নিশ্বাস-প্রশ্বাসের প্রয়োজনে মানবদেহে যে যন্ত্রটি কার্যকর তা ফুস্ফুস! দ্বিতীয় কথা, গ্যালেন বলেছেন মানবদেহে হৃৎপিণ্ডের দুটি মৌল অংশ, যাকে আজ আমরা বলি ভেন্ট্রিকুল। লেওনার্দো ছবি ঐকে দাগ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন—ধারণাটা শাস্ত; হৃৎপিণ্ডের মূল অংশ চারটি: দুটি ভেন্ট্রিকুল এবং দুটি অরিকুল। হৃৎপিণ্ডের বিভিন্ন অংশে শিরা ও ধমনী বাহিত রক্ত চলাচলের জন্য ভাল্ভগুলি কীভাবে কাজ করে তাও তিনি সচিত্র ব্যাখ্যা করেন।

রোমক পণ্ডিতদের প্রভাব: গ্রীক দার্শনিকদের তুলনায় বিজ্ঞানে রোমক পণ্ডিতদের অবদান অপেক্ষাকৃতভাবে কম। নূতন কোনও তথ্য, তত্ত্ব বা সূত্র তাঁরা আবিষ্কার করেননি। তবু লেওনার্দোর উপর চারজন রোমক পণ্ডিতের প্রভাব কিছু কিছু পড়েছে। তাঁরা হলেন, মার্কাস ভারুরো (খ্রীঃ পূঃ 127-116); প্লিনি (23-79 খ্রীঃপূঃ); ক্লিসিয়াস সেনেকা (খ্রীঃ পূঃ 0-65 খ্রীঃপূঃ) এবং বিশেষ করে সম্রাট অগুস্টাসের সমকালীন বিখ্যাত স্থপতি তথা বাস্তুরকার মার্কাস ভিট্রুভিয়াস (প্রথম খ্রীঃপূঃ)।

ভারুরো আলোচনা করেছেন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য ও কীটপতঙ্গ নিয়ে। তাঁর প্রভাব লেওনার্দোর উপর পড়ে থাকলেও সামান্য। যদিও লেওনার্দোই বলতে গেলে প্রথম শিল্পী যিনি তাঁর চিত্রে গাছপালা ঐকেছেন উদ্ভিদবিজ্ঞানকে স্বীকার করে। প্রতিটি পাতা, ডাল, ফুল নিখুঁতভাবে উদ্ভিদবিজ্ঞান অনুসারী। অপরপক্ষে মনে হয় লেওনার্দো প্লিনির কাছে প্রভুতভাবে স্বামী। প্লিনির মহাগ্রন্থ—প্রাকৃতিক ইতিহাস (Historia Naturalis) সাঁইত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত। তাঁর বিচরণক্ষেত্রও লেওনার্দোর মতো বিচিত্রধর্মী: মহাজাগতিক রহস্য,

ভূগোল, নৃত্য, জীববিদ্যা, উদ্ভিদবিজ্ঞান, ভেষজশাস্ত্র, শারীরবিজ্ঞান, ষাটুবিদ্যা এবং কলাশাস্ত্র। মৌলিক চিন্তা অল্পক্ষেত্রেই প্রতিফলিত ; কিন্তু বেশ বোঝা যায় তিনি সারাজীবন প্রাগ্‌বর্তী জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা করেছেন এবং সারাজীবন ধরে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। একাই যেন একটি এনসাইক্লোপিডিয়া লিখেছেন ! এই বিজ্ঞানভিক্ষুর মৃত্যুও নাটকীয়—ভিসুভিয়াস-এর অগ্ন্যুৎপাত বিষয়ে প্রত্যক্ষজ্ঞানে লিখতে হবে বলে তিনি খুব কাছে গিয়ে ঐ প্রাকৃতিক বিস্ময়টিকে প্রত্যক্ষ করতে যান। আর ফিরে আসেন না।

লেওনার্দো তাঁর পাণ্ডুলিপিতে সেনেকার উল্লেখ করেছেন বটে তবে তাঁর দ্বারা লেও যে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন তা মনে হয় না। অপরপক্ষে লেওনার্দো যেখানে স্থাপত্য-ভাস্কর্য ও শিল্পকলার বিষয় আলোচনা করেছেন সেখানে ভিসুভিয়াস-এর প্রসঙ্গ বারে বারে এসেছে।

(গ) আরবীয় প্রভাব : লেওনার্দোর পূর্বসূরী হিসাবে অন্তত তিনজন আরবি পণ্ডিতের নাম করতে হয়। প্রথমজন বাগদাদের তাবির ইব্ন খুররা (নবম শতাব্দী)। তাঁর একটি গ্রন্থে (Liber Charastonis) ইউক্লিড, আরকিমিডেস ও টলেমির নানান তথ্যসূত্র সঙ্কলিত। এই বইটির কোনও অনুবাদ যদি লেওনার্দোর হস্তগত হয়ে থাকে তবে তিনি কীভাবে ইউক্লিডের নাগাল পেলেন তা বোঝা যায়।

দ্বিতীয় আরবীয় পণ্ডিত জ্যাকব অল্ কিস্তি বা সংক্ষেপে কিস্তি। তিনি গণিত, উদ্ভাবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান, জীববিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান (optics) প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এক্ষেত্রে মৌলিক তথ্যের চেয়ে গ্রীক চিন্তাধারার সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক আলোচনার দিকেই লেখকের প্রবণতা লক্ষণীয়। লেও-র দিনপঞ্জিকায় দেখছি উল্লেখ রয়েছে : “আজ বন্ধুবর কাঁজিও-র নিকট হইতে কিস্তির গ্রন্থটি পাঠ করিবার জন্য গ্রহণ করিলাম।”

তৃতীয়ত, পণ্ডিত ইব্ন সিনার (980-1037 খ্রীঃ) পরিবেশিত নানান তথ্যকে লেওনার্দো বিশ্লেষণ করেছেন, বিশেষ করে তাঁর শারীরবিদ্যার চর্চাকে। এছাড়া হ্যাসিডান দার্শনিক রজার বেকন-এর (1220-1294) একাধিক উল্লেখ আছে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে।

সমকালীন পণ্ডিতমণ্ডলীর কাছে স্বাধীন : লেওনার্দো কখনও কোনও বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন না ! কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো গৃহশিক্ষকের কাছে শিক্ষালভের সুযোগও তিনি পাননি। পাননি পারিবারিক বয়োজ্যেষ্ঠদের কাছে কোনও প্রেত নিদেশ বা সুযোগ-সুবিধা। আর্গেই বলেছি তিনি কানীন পুত্র—‘বাস্টার্ড’ ! তাঁর পিতা মনী আর্টিনি ছিলেন ; কিন্তু কৈশোরকালেই লেওনার্দো যে গৃহত্যাগ করে উয়ুজমুনিয়ায় বেরিয়ে পড়েন তারপর আর পিতার সংসারে ফিরে আসেননি। ডেরোজিও-র ‘ব্যাগ্‌গায়’ (গুরুগৃহে) পিতা তাঁকে ভর্তি করে দিয়ে যান ; কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সমরকমিতার মিথ্যা অপবাদে তিনি অভিযুক্ত হন। বিচারে লেওনার্দো সসন্মানে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হন ; কিন্তু মনের বেদে তিনি ঐ গুরুগৃহ ত্যাগ করেন। এ ঘটনা পুস্পনগরী ফ্লোরেন্স-এর। এই সময়েই তিনি ফ্লোরেন্স ত্যাগ করে মিলানে চলে যান। সুতরাং তিনি পড়াশুনা যা করেছেন তা নিজের চেষ্টায় নিজের অধ্যবসায়ে ও অনুসন্ধিৎসায়—বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে। জীবনের

বিভিন্ন পর্যায়ে তিনি কয়েকজন সমকালীন পণ্ডিতের সংস্পর্শে আসেন, তাঁদের স্নেহস্ব্য হন, অথবা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। তার ভিতর প্রথম যে নামটি করতে হয় তা ফা লুকা পাচিওলির। তিনি ছিলেন ধর্মযাজক। রোম, পীসা অথবা ভেনিসের মহাবিদ্যালয়ে তিনি পর্যায়ক্রমে নানান বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন। সংবাদ শু্য সুযোগ পেলে লেওনার্দো ঐ বক্তৃতা শুনতে যেতেন। পরে পাচিওলি স্থায়ীভাবে মিলান-এর ডিউক ইল-মরোর বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হন। ঐ সময় লেওনার্দো সেখানে 'শেষ সায়মাশ' আঁকছেন। ফলে ঐ সময়ে দুজনের ঘনিষ্ঠতা হয়। লেওনার্দো বিজ্ঞানশিক্ষার প্রভূত সুযোগ পান।

দ্বিতীয়ত লেওনার্দো মহাপণ্ডিত পাওলো তস্কানেল্লির স্নেহভাজন হয়ে পড়েন। তস্কানেল্লি গণিত ও ভূগোলে অসামান্য ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। জনশ্রুতি-এবং সম্ভবত সত্য যে, ঐই ভদ্রলোকই একটি ব্যক্তিগত পত্রে ক্রিস্টফার কলম্বাসকে জানিয়েছিলেন যে, পৃথিবী যেহেতু গোল তাই অতলান্তিক বরাবর ক্রমাগত পশ্চিমমুখো চলতে থাকলে ভারতবর্ষে পৌঁছানো সম্ভব। এবং দূরত্বটা সে-কালীন অর্ধবাপোতের পক্ষে অনতিক্রম্য নয়। তস্কানেল্লি ছিলেন ফ্লোরেন্সের নাগরিক : ফলে জ্ঞানভিক্ষু লেওনার্দো যে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়বেন এ আর বিচিত্র কী ?

তৃতীয়ত কাজিও ফার্দানো ছিলেন লেওনার্দোর চেয়ে বছর সাতেকের বড়। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও আইনের দ্বাতক, কিন্তু অঙ্কের পোকা। লেও প্রায়ই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতেন ও গ্রন্থ হার নিতেন।

ফ্লোরেন্সের ধনকুবের-তদানীন্তন পশ্চিম খণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধনী-মেদিচি পরিবারের লরেঞ্জো দ্য ম্যাগনিফিশিয়ন্ট তাঁর প্রাসাদের অভ্যন্তরে কয়েকজন বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতকে স্থায়ীভাবে সমবেত করেছিলেন-বিক্রমাদিত্যের অথবা আকবরের নবরত্ন সভার সভ্যদের মতো। ঐরা যে পণ্ডিত্যের আসর জমাতেন-যা থেকে মিকেলঞ্জেলো প্রভুতভাবে উপকৃত হয়েছিলেন-তার নাম 'প্ল্যাটিনিক অ্যাকাডেমি'। তার তিনটি উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্কর ভিতর মার্সিলিও ফিসিনো (1433-1499) ছিলেন লেওনার্দোর চেয়ে বয়সে বড় ; অপর দুজন, অর্থাৎ আঞ্জেলো পলিজিয়ানো (1454-1494) এবং জোভারি পিকো মিরাস্তেলা (1463-1494) ছিলেন বয়স্কনিষ্ঠ। ফ্লোরেন্সের বসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও লেওনার্দো ঐ পণ্ডিতত্রয়ীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসতে পারেননি। ফ্লোরেন্সে নিজেকে উপেক্ষিত মনে করে তিনি মিলানে চলে যান।

এখানেই মুখবন্ধের যবনিকাপাত করে আসুন নেটিবইয়ের মহাসমুদ্রে ঝাঁপ দিই। ডুবুরি যেমন বিশাল সমুদ্রের একটি গ্রাস্তে বার কতক ঘুর ঘুরে মনে করে যে, তার সমুদ্রের তলদেশ দেখা সম্পূর্ণ হল, আমরাও তেমনি এখানে-ওখানে কিছু ঠুকরে আত্মসন্তুষ্ট হব। ঐ পান্ডুলিপির বিষয়ে মেজিমাটি ধারণা করা গেছে।

গতিবিদ্যা : (dynamics) লেওনার্দোকে বলা যায় : গতিবিদ্যার জনক। কারণ প্রাথমিক কোনও বিজ্ঞানী স্থিতিবিদ্যা (statics) এবং গতিবিদ্যা (dynamics)-কে পৃথকভাবে আলোচনা করেননি ; গতিবিদ্যা সম্বন্ধে বস্তুত ততদিন কোনও আলোচনাই হয়নি।

স্থিতিবিদ্যার আলোচনায় প্রাক্ষিপ্তভাবে গতিবিদ্যার কিছু প্রসঙ্গ প্রবেশ করেছে মাত্র। সেক্রেটিস-প্লেটোর যুগ থেকে দীর্ঘ সহস্রাব্দীকাল গতিবিদ্যা বিষয়টি বিজ্ঞানীদের কাছে উপেক্ষিত থাকার মূল হেতু—আমার যা মনে হয়েছে—এই বিজ্ঞানশাখার মৌলতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান তখনও কোনও ধারণাই করতে পারেনি। যথা : মহাকর্ষ (gravitation), বল (force) ; ত্বরণ (acceleration) প্রভৃতি। নিউটনীয় গতিবিদ্যার যে মূলসূত্র $P=mv$; অর্থাৎ ‘বল’ হচ্ছে ‘ভর’ ও ‘ত্বরণ’-এর গুণফল, ঐ মৌলিক তথ্যটাই তখনও অনাবিস্কৃত। লেওনার্দোও ঐ মূল তথ্যটির নাগাল পাননি ; তাদের সংজ্ঞার্থ (definition) এবং সম্পর্ক কোনও সমীকরণের মাধ্যমে ধরতে পারেননি। কিন্তু আমরা এখনই আলোচনা করে দেখব যে, তিনি সে তত্ত্বের একেবারে কোন ঘেঁষে গেছেন। নিউটন যে পথে পর্বতচূড়ায় উপনীত হবেন লেও সে পথের প্রাথমিক বাধাগুলি অপসারিত করে পাকদণ্ডী পথের জটিলতা বিদূরিত করে দিয়েছিলেন।

বৈজ্ঞানিক সত্য-সন্ধানের যে ধারাটির আজ সারা বিশ্ব মেনে নিয়েছে : প্রথমে পরীক্ষা (experiment) ; তারপর নিরীক্ষা (observation), অতঃপর ফলনির্ণয় (deduction) এবং সবশেষে সাধারণসূত্র-সঙ্কলন (theorisation)—এই পর্যায়ক্রম লেওনার্দোর পূর্বে কোনও বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা নিয়ে করেছেন বলে তো মনে পড়ে না। সমালোচক হার্ট বলছেন, “Leonardo, more than one hundred years before Galileo, was most definitely an experimentalist. If the great Tuscan Philosopher was indeed the Father of Experimental Philosophy, then da Vinci was its Grandfather.”—অর্থাৎ গালিলেওর শতাধিক বর্ষ পূর্বে লেওনার্দো ছিলেন সূচিহিতভাবে একজন পরীক্ষা-নির্ভর বিজ্ঞানী। তাসকানির ঐ দার্শনিককে (অর্থাৎ গালিলেওকে) যদি পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানচর্চার জনকরূপে অভিহিত করা যায়—এবং যে-কথা অবিসংবাদিত—তাহলে দা-ভিন্চি হচ্ছেন ঐ চিন্তাধারার পিতামহ।

লেওনার্দো বলছেন, “পরীক্ষা কখনও তোমাকে বিপথগামী করিবে না। যদি করে, তবে বুঝিয়ে আশি তোমার ব্যক্তিগত ত্রুটিতে—পরীক্ষকের অনবধানজনিত। কারণ প্রকৃতি কখনও ভুল করে না ; প্রাকৃতিক নিয়মে ব্যতিক্রম অসিদ্ধ।”^{১১}

তিনি নিজেই কীভাবে এ জাতীয় আশ্রিত শিকার হয়েছেন এবার তাঁর একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বল, শক্তি এবং গতি (Force, energy & velocity) : ‘বল’-তত্ত্বের কোনও সঠিক সংজ্ঞার্থ লেওনার্দো লিপিবদ্ধ করতে পারেননি। সুতরাং ধরেছেন—মস্তিস্কের গ্রে-সেল-এ, বুদ্ধির বীতংসে—ভাষার পিঞ্জরে নয়। তবু বলেছেন, “কোনও অচেতন বস্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে গতিশীল হইতে অসমর্থ। যদি গতি প্রত্যক্ষ কর, তবে বুঝিবে কোনও দ্বিতীয় সত্তার দ্বারা প্রথমোক্তে ঐ গুণ আদ্রোপিত। ঐ দ্বিতীয় গুণকে আমরা বলিতে পারি : ‘বল’।”^{১২} শুনো আপনি—আমি এই বিংশশতাব্দীর শেষ পাদে দাঁড়িয়ে বলব, এটা ‘বল’-এর বিবিধ সংজ্ঞার্থই হল না। মানলাম। কিন্তু স্থিতিজাড়ের মূল-তথ্যটি কি ঐ পঙ্ক্তিতে বীজের আকারে উদ্ভূত হল না ? নিউটনের প্রথম সূত্রটি মনে করে দেখুন—তফাৎ

কোথায় ? বিবিধ ভাষায় ! মৌল তত্ত্বে ফারাক কতটা ? বিজ্ঞানের উর্বর কুমারী ভূখণ্ডে ঐ পদ্ধতিটি কি নিউটনের প্রথম সূত্রটির বনিয়াদ গড়ে দিয়ে গেল না ? আবার বিহঙ্গ-বিজ্ঞান (aviation) প্রসঙ্গে যখন তিনি বললেন, “বিহঙ্গ একই গতিতে নিরবধিকাল একই পথে চলিতে থাকিবে, যতক্ষণ না ঐ প্রাথমিক বলের (উনি অবশ্য যে লাতিন শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার ইংরাজি প্রতিশব্দ ‘energy’, বাঙলায় যা নাকি ‘শক্তি’) প্রভাব তাহার উপর কার্যকরী, এবং যতক্ষণ কেহ তাহাকে বাধা দিতেছে না।” (৩) তখন গতিজাড তত্ত্বটার একটা পরিষ্কার ধারণা হয়। গালিলেওকে এই গতিজাড-তত্ত্বের বা Principle of Inertia-র জনক বলে বিজ্ঞান চিহ্নিত করেছে। কিন্তু লেওনার্দোর ঐ পদ্ধতিটি শতবর্ষ পূর্ব থেকেই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিতে উপেক্ষিত হয়ে পড়ে ছিল।

তারপর ধরুন, নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র—“Every action has its equal and opposite reaction”; অর্থাৎ ক্রিয়া ও তার প্রতিক্রিয়া সমান ও বিপরীতমুখী।

প্যারাসুট প্রসঙ্গে লেওনার্দো যা লিখে গেছেন তার আক্ষরিক অনুবাদ “কোনও ভাসমান বস্তু বাতাসে ততখানিই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, যতখানি বাতাস করে ঐ ভাসমান বস্তুর উপর।” (৪)

‘দ্রবণ’ সম্বন্ধেও এ একই কথা। তাকে পুরোপুরি করায়ত্ত করতে পারেননি। বুঝেছেন; কিন্তু হস্তশূদ্র আমলকি ফলের মতো দেখাতে পারেননি। ‘গতি’ ও ‘দ্রবণ’ তাঁর চিন্তায় গুলিয়ে গেছে—কিন্তু তফাৎ যে কিছু একটা আছে এটুকু বুঝেছিলেন। প্রথমে দেখি গুলিয়ে যাওয়ায় তিনি কীভাবে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছেন। বললেন, “যদি কোনও ‘বল’ কোনও বস্তুকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে ঐ একই ‘বল’ ঐ বস্তুর অর্ধপরিমাণ ‘ভর’-বিশিষ্ট একটি দ্বিতীয় বস্তুকে একই সময়ে অর্ধপরিমাণ দূরত্বে লইয়া যাইতে পারিবে।”

তথ্যটি ভ্রান্ত। লেওনার্দো সম্ভবত তাঁর পরীক্ষাগারে এই সূত্রটি নিয়ে কোনও পরীক্ষা করেননি। অন্তত তাঁর নেটিবইয়ে তেমন কোনও নজির নেই। হয়তো উপযুক্ত যন্ত্রপাতি তাঁর এস্তিয়ায়ে ছিল না; অথবা সময় হয়নি; কিংবা পরীক্ষা করে দেখবার পূর্বেই তিনি কোনও ছবি নিয়ে মেতেছেন, অথবা আর কিছু নিয়ে। মোট কথা তথ্যটি যে ভ্রান্তক তা আমরা আজকের দিনে মাধ্যমিক-পর্যায়ের জ্ঞানেই যাচাই করে প্রমাণ করতে পারি :

প্রথম ক্ষেত্রে $P = mf$ (P = বল ; m = ভর ; f = দ্রবণ)

অর্থাৎ দ্রবণ = $f = P/m$.

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে $P = \frac{m}{2} \times f$, অর্থাৎ $f_1 = 2P/m$

সুতরাং $f_1 = 2f$.

মনে করি m ভর t সময়ে, $m/2$ ভর t_1 সময়ে অতিক্রম করে।

সুতরাং $s = \frac{1}{2} ft^2$ অর্থাৎ $t^2 = 2s/f$.

এবং $s = \frac{1}{2} f_1 t_1^2$ অর্থাৎ $t_1^2 = \frac{2s}{f_1} = \frac{2s}{2f} = \frac{s}{f}$

ফলে, $t^2/t_1^2 = 2/1$ অসম্যাব্দ $t : t_1 = \sqrt{2} : 1$

লেওনার্দোর হিসাব মতো $1:1 = 2:1$ নয়।

আগেই বলেছি, এই ভুলটি হয়েছে 'গতি' ও 'ত্বরণ'কে অভিন্ন মনে করায়। তা সত্ত্বেও বলব 'গতি' ও 'ত্বরণ' যে অভিন্ন নয় এমন একটা ধারণাও তাঁর ছিল। তফাৎটা কী না জানাতে পারলেও, তফাৎ যে একটা কিছু আছে এটা বুঝতে পেরেছিলেন। একথা কেন বলছি? বেশ দেখুন :

পতনশীল কোনও বস্তুর বিষয় পরীক্ষা করতে বসে লেওনার্দো তাঁর নোটবকে একটি অঙ্ক কষতে বসলেন :

"If a weight falls a distance of two hundred fathoms, by how much would it fall quicker in the second hundred fathom than in the first"—অর্থাৎ "যদি কোনও পতনশীল বস্তু দুই শত ফ্যাদম নিচে পতিত হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় শত ফ্যাদমে পড়িবার সময় বস্তুটি প্রথম শত-ফ্যাদমের অপেক্ষা কত দ্রুতহারে পড়িবে?"

অঙ্কটা লেওনার্দো নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মতো কষে ফলাফল জানিয়েছেন। সেটা ভুল হয়েছিল। উনি বলেছিলেন দ্বিতীয় শত-ফ্যাদম অতিক্রমকালে গতিবেগ দ্বিগুণ হবে। সেটা ভুল উত্তর। হবেই। কারণ ওটা গতি (velocity) নির্ধারণের অঙ্ক নয়; ত্বরণ (acceleration) নির্ধারণের আঁক। যে ছাত্র গতি আর ত্বরণের প্রভেদটা জানে না তার পক্ষে সঠিক উত্তর পাওয়া সম্ভবপর নয়। কথা সেটা নয়, কথা হচ্ছে এই যে, তিনি অনুমান করেছেন, উপলব্ধি করেছেন—শুধুমাত্র মস্তিষ্ক খাটিয়ে (কারণ তাঁর আয়ত্তে না ছিল স্টপ-ওয়াচ না অত উঁচু মিনার) যে, পতনশীল বস্তুর গতিবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। মহাকর্ষ যিনি জ্ঞানেন না, 'ত্বরণ' সম্বন্ধে যার ধারণা নেই, এ তথ্যটা তিনি কোথায় পেলেন? উত্তর নয়, প্রশ্নটা তিনি কেমন করে তৈরি করলেন?

স্থিতিবিদ্যা (Statics) : লেওনার্দোর যুগে বিজ্ঞানের এই শাখাটি অকর্ষিত কুমারী ভূখণ্ড ছিল না। গ্রীক যুগ থেকে অনেক বিজ্ঞানীর হাত ধরে বালিকাটি পায়ে পায়ে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবরাজ্যের সিংহদ্বারে উপনীত। কিন্তু এতদিন সে ছিল তরুণীর আলেখ্য—ত্রিমাত্রিক পূর্ণযৌবনা নারী নয়। লেওনার্দোর জিয়নকাঠির স্পর্শেই পাষাণী অহল্যা প্রথম চোখ মেলে তাকাল—তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। কেন, কীই বলি :

স্থিতিবিদ্যার যে অঙ্কগুলি লেওনার্দো কষেছেন, সূত্রনির্দেশ করেছেন, তা অস্বাভাবিক নির্ভুল। আরিস্তটল, আর্কেমেদেস, নেমোরেরিয়াম প্রভৃতি স্থিতি-বিজ্ঞানীদের সূত্রগুলির অনেক কিছু তিনি বাস্তবে পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন। অনেকক্ষেত্রে ভাটিকি বিচার করেছেন অথবা নূতন নূতন সূত্র লিপিবদ্ধ করেছেন।

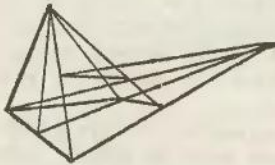
যেমন যরা যাক ভারকেন্দ্রের (centre of gravity) কথা। আর্কেমেদেস শুধু ত্রিমাত্রিক বস্তুর—সরল জ্যামিতিক চিত্রের—ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। আরবীয় পণ্ডিতেরাও ত্রিমাত্রিক জগতে (plane geometry) বস্তুর ভারকেন্দ্র বিষয়ে আলোচনা করেছেন। লেওনার্দোই প্রথম ত্রিমাত্রিক বস্তুর ভারকেন্দ্র নিরূপণে সচেষ্ট হলেন। যা ছিল ছবির কেন্দ্র আবিষ্কারের চেষ্টা—এতদিনে যেন হল স্থিতিবিদ্যা-রূপসীর অন্তরাত্ম স্পর্শ করার আয়াস। লেওনার্দো এ দিকে ঝুঁকেছিলেন একটি বিশেষ কারণে : বিহঙ্গ-

বাসনায় ! তিনি জানতে চান...পাখি কেন ওড়ে, মানুষ পারে না। বলাকার পাখার স্পন্দনে সহসা তাঁর বাসনা জেগেছে—‘ঐ শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা ; আকাশের ঝুঁজিতে কিনারা।’ সেই কবি-কল্পনাকে সফল করতে হলে বিজ্ঞানী-হিসাবে ঐকে প্রথমে জানতে হবে পাখির ভারকেন্দ্র দেহের ঠিক কোথায় অবস্থিত। নিজেকেই তিনি প্রশ্ন করেছেন, “উঁচুতে উঠবার সময়, নিচে নামবার সময় দেহাভ্যন্তরস্থ সেই ভারকেন্দ্র কি স্থান পরিবর্তন করতে পারে ? | লেওনার্দো জেনে যেতে পারেননি, আজ আমরা জানি—হ্যাঁ করে, সামান্য। জৈবিক প্রয়োজনে, reflex action—এ পাখি তার দেহাভ্যন্তরস্থ বায়ুকে শ্বাসনালী থেকে ফুসফুসে পাঠিয়ে দেহের ভারকেন্দ্রকে স্থানান্তরিত করতে পারে। | করলে কতটা ? কীভাবে ?”

তত্বটা ঊঁর আরও একটি প্রয়োজনে জানা দরকার ; বাস্তবানুগ চিত্রাঙ্কনের প্রয়োজনে। দণ্ডায়মান মানুষ সবসময়ে দু-পায়ে সমান ভর দিয়ে সমভঙ্গ্যামে দাঁড়ায় না। তখন তার দেহের ভারকেন্দ্র কেন্দ্রীয়রেখা থেকে কতটা সরে যায় ? যখন বসে, দৌড়ায়, ডিগবাজি খায়, তখন ভারকেন্দ্রের অবস্থান কোথায় ? জানতে হবে। বন্ধুরা পরামর্শ দিয়েছে—‘জেনে কী ফয়দা ? তুমি কি জীবদশায় উড়তে পারবে ?’ উনি বলেছেন: ‘জানি না। হয়তো পারব, নয় তো নয়—তবে মানুষ যে একদিন আকাশে উড়বে তা নির্বাণ—যেমন কাল পূব আকাশে আবার সূর্য উঠবে।’ বন্ধুরা রাগ করে বলেছে, ‘ভারকেন্দ্র যেখানেই থাকুক তুমি প্রকান্ত একটা ডিগবাজি স্বাবে—এটাও নির্বাণ—যেমন কাল সন্ধ্যায় পশ্চিম-আকাশে সূর্য ঘাড় গুঁজড়ে পড়বে।’

দু-বন্ধুর ভবিষ্যদ্বাণীই সার্থক। মানুষ আকাশে উড়েছে, লেওনার্দোও ঘাড় গুঁজড়ে ডিগবাজি খেয়েছেন—কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা—লেওনার্দো-সূর্য আজও অম্লান !

ত্রিমাত্রিক-বস্তুর গোড়া থেকে শুরু করলেন। ‘যাকে আঙ্গকালকার ছেলেরা বলে একেবারে ‘ফাড়া’ থেকে। লুডের ছকা অথবা গোলক কোনও গোল পাকাল না। হেলে ধঁরা ছেড়ে এবার কেউটে ধরতে বসলেন : টেট্রাহেড্রন এবং পিরামিড। অনায়াসে তিনি সেই দুটি কেউটের ফণা চেপে ধরলেন। কিন্তু কায়দাটা এতদিনেও আমি—এ প্রবন্ধের



চিত্র ১

লেখক আমি—সমঝে উঠতে পারিনি।

দেখি, আপনারা পারেন কি না।

পিরামিডের ভারকেন্দ্র নির্ণয়ের প্রচেষ্টায় তিনি তাঁর নোটবুকে একটি স্কেচ ঐকে একটি মাত্র পঙক্তিতে কিস্তিমাং করলেন—“ইহা হইতে বুঝা যায় যে, পিরামিডের ভারকেন্দ্র তাহার কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার উপর অবস্থিত—শিখর হইতে তিন চতুর্থাংশ

দূরত্বে এবং ভূমি-রেখা হইতে এক-চতুর্থাংশ উপরে।” Q.E.D ! (চিত্র-১)।

হ্যাস ! কোনও শ্যাখ্যা নেই ! কোনও বিস্তার নেই।

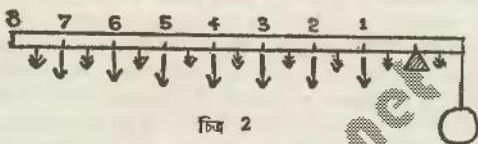
উত্তর নির্ভুল। কিন্তু ঐ ত্রিমাত্রিক-জ্যামিতি চিত্রটির পায়ে ধরে অনেক সেধেও দেখেছি রাধা রা দেয় না! “ইহা হইতে” বলতে সেই দাড়িওয়ালা ডব্রলোকটি “কিহা হইতে” বলতে চেয়েছেন তা খোদায়-তলা-লেও-য়া মালুম!

লিভার তত্ত্ব : লিভার-তত্ত্বের আলোচনায় অবশ্য লিভার-প্লীহা কোনোটাই চম্কাই না—কারণ এ তত্ত্বটা গ্রীকযুগ থেকে আলোচিত। লেওনার্দো প্রাগ্‌বর্তী গণিতজ্ঞদের আলোচিত জটিল তত্ত্বটা অতি সরল ভাষায় পরিবেশন করেছেন মাত্র—“তুলাদণ্ডকে ভূমির সমান্তরালে রাখিতে অসমবাহুর দুটি প্রান্তে এমন ওজন রাখিতে হইবে যাহা অসমবাহুদ্বয়ের ব্যাস্তানুপাতে।” (১৩)

লিভার-তত্ত্ব আলোচনায় তিনি মাঝে মাঝে ভুল করেছেন। ভুল হয়েছে এজন্য যে, তিনি ধরে নিয়েছিলেন কোনও সমভাবে ভারাক্রান্ত লিভারে ওজনটি সক্রিয় হয় শেষ প্রান্তে। বাস্তবে তা কার্যকর প্রতিটি অংশের মধ্যবিন্দুতে। লেওনার্দোর ভ্রান্তির একটা উদাহরণ দিয়ে আলোচনা করা যাক। তিনি নিম্নলিখিত অঙ্কটি করতে চাইছেন। (১৪)

“কোনও একটি তুলাদণ্ডে আলম্ব-বিন্দুর একপ্রান্তের দৈর্ঘ্য যদি অপর প্রান্তের দৈর্ঘ্যের তুলনায় অটপুণ হয়, এবং প্রতিটি একক দৈর্ঘ্যের ওজন যদি একক হয় তাহা হইলে চিত্রে নির্দিষ্ট অবস্থায় W-র ওজন কত একক হইবে যাহাতে তুলাদণ্ডটি জমির সমান্তরাল হইবে?” (চিত্র-২)।

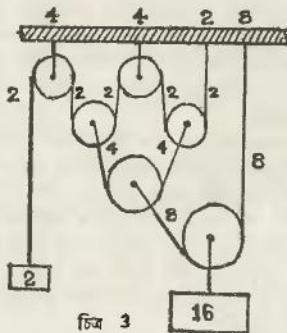
লেওনার্দো ধরে নিয়েছিলেন প্রতিটি ভাগের ওজন ঐ অংশের শেষপ্রান্তে কার্যকর (তীর চিহ্নে যেমন দেখানো হয়েছে)। ফলে তার অঙ্কের শেষ ফল হয়েছিল: $W=35$ একক। বাস্তবে প্রতিটি অংশের ওজন ডব্লু-তীরচিহ্নে নির্দিষ্ট স্থানে, অর্থাৎ প্রতিটি অংশের মধ্যস্থলে কার্যকর, তাই সঠিক উত্তর : $W=31.5$ একক।



গীয়ার ও পুলি-তত্ত্ব

গীয়ার ও পুলি-তত্ত্বের বিচারপাণ্ডুলিপির যে অংশে রয়েছে সেখানে ভুল প্রায় হয়নি। অনেক নতুন ধরনের গীয়ার এবং পুলির ব্যবহার তিনি দেখিয়েছেন। স্থানে স্থানে শুধুমাত্র ছবিই ঐকেছেন, কোনোকিছু ব্যাখ্যা না দিয়ে। যেমন চিত্র-৩: এক্ষেত্রে বিনা ব্যাখ্যাতোও চিত্রটি ব্যাখ্যায়। অর্থাৎ কীভাবে ২ কে.জি. (তখনও অল্প কিলোগ্রাম জন্মায়নি) ওজন দিয়ে পুলির সাহায্যে ১৬ কে.জি. ওজনকে উপরে তোলা যায়। একপ্রান্তে ১৬ এবং অপর-প্রান্তে ২

কে.জি.—সর্বমোট 18 কে.জি. ওজন বহন করলে উপরিস্থিত বীমের কোন বিন্দুতে কতটা রিয়াকশন হবে তাও উনি দেখিয়ে দিয়েছেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার



পর তার প্রয়োগকৌশল বোঝাতে যে স্কেচগুলি ঐকেছেন তা অনবদ্য। সেগুলি নকশানবিশেষের কাজ নয়, চিত্রশিল্পীর স্পর্শধন্য।

বিহঙ্গ-বিজ্ঞান বা এয়ারোনটিক্স : জানি, আপনাদের হিসাবে aeronautics-এর বঙ্গানুবাদ বিহঙ্গ-বিজ্ঞান নয়—বিমানবিদ্যা, নভশচরবিজ্ঞান বা ঐ জাতীয় কোনো খটমট শব্দ। কিন্তু লেওনার্দো যে লাতিন শব্দটি ব্যবহার করেছেন তার ভাবানুবাদ : বিহঙ্গ-বিজ্ঞান। ‘আকাশযান’ শব্দটাকে তিনি বারে বারে বলেছেন : ‘মহাবিহঙ্গ’।

সে যাই হোক, বাতাসের চেয়ে ওজনে ভারি কোনো যান নিয়ে আকাশে পাড়ি দেবার যে প্রয়োগবিদ্যা তা নিতান্ত হাল-আমলের। ফরাসি অধ্যাপক ল্যাভলে তাঁর আকাশযান ‘এয়ারোড্রাম’-কে মাত্র কিছুক্ষণের জন্য গগনচাষী করতে পেরেছিলেন বর্তমান পতাবীর উষালগ্নে। ঠিক তার পরেই মার্কিন শ্রাতৃদ্বয় রাইট ব্রাদার্স-কেই বল্যাই ‘আকাশযানের জনক’, কারণ তাঁদের বিমানপোত একজন মানুষের ওজন সঙ্কেত আকাশে উঠে গিয়েছিল 1903 খ্রীষ্টাব্দের সতেরই ডিসেম্বর। অপরপক্ষে বাতাসের চেয়ে হালকা কোনও যান—বেলুন-এর আবিষ্কর্তা হিসাবে বিশ্ববিজ্ঞান মেনে নিয়েছে দুজন ফরাসিকে : মন্টলফিয়ার শ্রাতৃদ্বয় ; সেটা 1783 সালের ঘটনা। তাহলে লেওনার্দোর অতি-উৎসাহী স্বাকেরা কোন আক্কেলে সেই সকলকলাপারসমূহকে এ রাজ্যেও চুকিয়ে দিতে চান ? সেই হিসাবটাই এবার খতিয়ে দেখা যাক।

মানবসভ্যতার অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পাখির মতো আকাশে ওড়ার স্বপ্ন দেখে আসছে। কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, স্তন্যপায়ী জীব উদ্ভব হওয়ার

সমসময়ে যখন এক ধরনের মেঘদণ্ডবিশিষ্ট জীব আকাশে উড়তে শিখল, অর্থাৎ পাখি হবার দিকে ঝুঁকল, তখন থেকেই এই 'বিহঙ্গ বাসনা' ভূচরদের মস্তিষ্কে রয়ে গেছে। তার মানে এ 'বিহঙ্গ-বাসনা' প্রাক্‌মানুষ রাম্যপিথেকাস নামধারী দ্বিপদীজীব, যার বয়স দেড় কোটি বছর হয়-কি-না-হয়, তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি প্রাচীন—মেজজয়িক-যুগের শেষাংশে থেকে, অর্থাৎ দশবারো কোটি বছর ধরে টিকে আছে।

মিশর, চীন, গ্রীসের প্রাচীন উপকথায় রয়ে গেছে বিহঙ্গ-বাসনার স্বাক্ষর। ক্রীটদেশের রাজা মিন্স এর কারাগার থেকে বন্দী পিতাপুত্র—দায়াদালাস ও ইকারাস কীভাবে বাহুতে ডানা বেঁধে আকাশপথে সিসিলিতে উড়ে পালাবার চেষ্টা করেছিলেন তার নানান শিল্পকর্ম আমরা দেখেছি। শেত্রপীয়ার বর্ণিত ইংল্যান্ডের রাজা কিং লীয়ারের পিতৃদেব ব্রাদুদ নাকি ঐভাবে উড়তে গিয়ে শহীদ হন। 1020 খ্রীষ্টাব্দে সল্‌স্‌বেরির একজন ইংরাজ পাদরি, অলিভার—ঐ একইভাবে ওড়বার চেষ্টা করেন। তাঁর নামই হয়ে যায় 'দ্য ফ্লাইং মংক' (উড়ুক্কু পাদরী)। তিনি শহীদ হননি, প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছিলেন। প্রায় একই সময়ে কনস্টান্টিনোপল্‌-এর একজন দূতসাহসী বীর নাকি আকাশে উড়বার প্রচেষ্টায় প্রাণ দেন। লেওনার্দো এই দীর্ঘস্থায়ী স্বপ্ন-ইতিহাসের একজন শরিক। তফাৎ এই যে, ইতিপূর্বে সকলে উদ্ভট কল্পনা-বিলাসের তাড়নার শিকার হয়েছিলেন, লেও সোঁটাকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে চাইলেন। বোধকরি উড্ডয়ন ইতিহাসে তিনিই প্রথম।

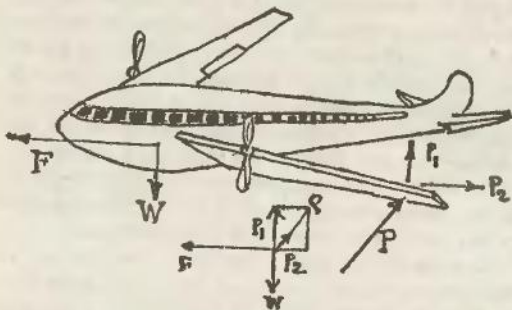
তিনি ক্রমাগত নোট নিতে থাকেন, পাখিদের উড্ডয়ন প্রক্রিয়া দেখেন আর স্কেচ আঁকেন। পাতার পর পাতা, খাতার পর খাতা। এই পর্যায়ের রচনা শুরু হয়েছিল মিলানে 1488 খ্রীষ্টাব্দে এবং এই ব্যাপারে নোটবইতে তাঁর শেষ হস্তাক্ষর 1514-এ, অর্থাৎ মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে। সহজ হিসাবে দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর ধরে ব্যাপারটা তাঁর রাত্রির নিদ্রায় ব্যাঘাত হেনেছিল। সাধারণত নোটবইগুলির কোনো নামকরণ তিনি করে যাননি, অথচ এটার করেছিলেন : *Sul volo degli Uccelli*, বঙ্গানুবাদে যা—'বিহঙ্গদিগের উড্ডয়ন-প্রসঙ্গে।'

ব্যাপ্‌চালিত স্টীম-এঞ্জিন অথবা পেট্রোল-চালিত 'ইন্টার্নাল-কম্বাস্টশান এঞ্জিন' তাঁর আমলে অচিস্তনীয়। ফলে গতির জন্য একমাত্র বাহুবলের উপর নির্ভর করতে হল তাঁকে। অসংখ্য পাখির উড্ডয়ন-ভঙ্গিমার স্কেচ করে গেছেন ছাব্বিশ বছর ধরে—কীভাবে ওরা উপরে ওঠে, কী ভাবে নামে, কেমন করে ডানা-না-নাড়িয়ে কীভাবে ভেসে থাকে। এ স্কেচগুলি নিতান্ত বৈজ্ঞানিক তাড়নায়, কিন্তু যেহেতু শিরী তাঁর লেওনার্দোর স্কেচগুলি হয়ে গেছে অদ্ভুত শিল্পকর্ম! পাখির যা ওজা সেই মাপের একটা পাথরকে পিসা-টাওয়ারের মাথায় ছেড়ে দিলে তা সোজা নিচে পড়বে আসে; অথচ একটা কবুতরকে বাতাসে ছেড়ে দিয়ে দেখেছেন তা সোজা বাতাসে ভেসে যায়। কেন? কেন? কেন? জানতে হবে।

লেওনার্দো অকৃতদার, বাউন্সের রাজার করার ধার ধারেন না। শিম্বরই বাজার-হাট করে আনে। কিন্তু কীক্রে কীভাবে দেখা যেত ফ্লোরেন্সের পাখি-বাজারের সামনে। একের পর এক পায়রা কিনতেন, ওড়াচ্ছেন স্কেচ করছেন। সে বাজারে তাঁর নামই

হয়েছিল 'পায়রা-ওড়ানো কান্ডেন' !

গাণিতিক সমস্যাটার শেষ সমাধানে তিনি কেন উপনীত হতে পারেননি : কোথায় তাঁর ভুল হচ্ছিল তা বুঝে নিতে হলে আমাদের জেনে নিতে হবে : আকাশযান কেন উড়তে পারে। অর্থাৎ অস্ত্রের ফলাফলটি প্রথমে জেনে নিয়ে আমরা 'ব্যাঙ্ক্যালকুলেশনে' সমঝে নেব তাখিক-সমাধানের কোন্ পর্যায়ে লেওনার্দো ঠেকে গেছিলেন। অসাফল্যের জন্য তিনি কতটা দায়ী।



চিত্র- ৪

আকাশযানে বস্তুত তিনজাতের 'বল' কাজ করে। (চিত্র ৪)। মাধ্যাকর্ষণের অনিবার্য আকর্ষণে (W) এবং সেটা প্লেনের কেন্দ্রবিন্দুতে কার্যকর এবং সেটি নিচের দিকে যেতে চায়। প্রপেলারটা বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে বলে (F) আকাশযানটা সমুখের দিকে যেতে চায়। তৃতীয়ত, যেহেতু আকাশযানটা বাতাসের-প্রতিবন্ধকতাকে অধীকার করে এগিয়ে যেতে চাইছে তাই নিউটনের তিন নম্বর গতিদূত্র-মোতাবেক আকাশযানে একটি চাপও (P) কার্যকরী। এই তিনটি 'বল'-এর নীট ফল—আকাশযান নামবেও না, উঠবেও না—সোজা সমুখের দিকে এগিয়ে যাবে। কেন ?

প্রথম বলের (W) গতিমুখ খাড়া নিচের দিকে। দ্বিতীয়-বল (F) সমুখপানে। এ দুটি সমকোণে কাজ করছে। কেউ কারও তোয়াক্কা না রেখে। কিন্তু প্লেনের ডানা দুটি একটু বাঁকা করে বানানোতে তৃতীয় বল (P) একটু তেড়চা হয়ে কাজ করে।

'বলসামন্তরিক' আইনে (Parallelogram of forces) আমরা এই P-বলকে দু-ভাগে ভাগ করে বিচার করতে পারি। প্রথমভাগ P_1 খাড়া উপর দিকে ; দ্বিতীয় ভাগ প্লেনের গতিমুখের বিপরীত দিকে P_2 ।

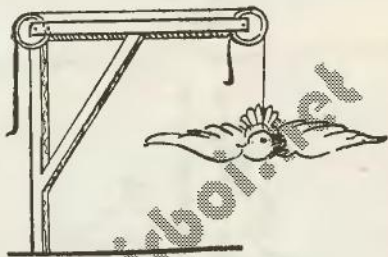
এখন ব্যবস্থাটা যদি এমন করা যায় যাতে $P_1 = W$ তাহলে, আকাশযানটা উপরেও উঠবে না, নিচেও নামবে না— P_1 ও W পরস্পর কাটাকাটি করে যাবে। অর্থাৎ শূন্যে

ভাসবে। কিন্তু তা তো স্থির হয়ে থাকবে না—সেটা ক্রমাগত সামনের দিকে এগিয়ে যাবে $F-P$ বলের ফল হিসাবে। মাধ্যাকর্ষণের প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করতে এই যে প্লেনের ডানা-জোড়াকে একটু বাঁকানো হল, সেই কায়দাটাকে ইংরাজিতে বলে 'ডাইহেড্রাল'।

আশ্চর্যের কথা, অপরিচীত আশ্চর্যের কথা, নভস্টরশ বিদ্যার এই যে মৌল-তত্ত্ব এটাকে লেওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ধরতে পেরেছিলেন। মনে রাখা দরকার, নিউটনের বাগানের সেই ঐতিহাসিক আপেল গাছটা তখনও জন্মায়নি। W কী, কেন, কেউ জানে না। এমনকী বিজ্ঞান তখনও জানে না একটি 'বল'-কে 'বলসামান্তরিক-পদ্ধতি'-তে দু-ভাগ করা সম্ভব! বিজ্ঞান যখন জানে না নিউটনের তিন নম্বর গতিসূত্র, তখন তিনি বাতাসের প্রতিবন্ধকতাকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর আমলে এ তিনটি অনুভাবনাই যুগান্তকারী। আমার তো মনে হয়েছে—মাপ করবেন যদি আপনারা একমত না হন—পঞ্চদশ-শতাব্দীর এই অনুভাবনার মূল্য 'মোনালিসা'র বর্তমান মূল্য একশ কোটি টাকাকেও ছাপিয়ে^(৩) যায়।

লেওনার্দোর সামনে তাহলে তিন জাতের সমস্যা। তিনটি 'বল'-এর পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে তাঁকে। এক নম্বর—মাধ্যাকর্ষণ জনিত W ; দু-নম্বর, বাতাসের প্রতিবন্ধকতা P ; এবং তৃতীয়ত সমুখ দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মূল প্রেরণা F ।

W -বলের হিসাব সহজ—যাত্রীসমেত আকাশযানের ওজন। তার গতিমুখও সুচিহ্নিত—খাড়া নিচের দিকে। মাধ্যাকর্ষণের মূল তথ্যটা না জানলে (যা আজও আমরা জানি না, জানি শুধু ঐক-কষার কায়দা) অভিজ্ঞতা থেকে তিনি জানেন প্রতিটি বস্তুই ভূতলের উপর লম্বভাবে পতিত হয়। W -সংক্রান্ত প্রশ্ন একটাই: ঐ বল আকাশযানের কোন্ বিন্দুতে কার্যকর? অর্থাৎ আকাশযানের ভারকেন্দ্রটি কোথায়? এ-থেকেই তিনি ইউক্লিডের ত্রিমাত্রিক জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে ত্রি-মাত্রিক পটভূমিতে বস্তুর ভারকেন্দ্র

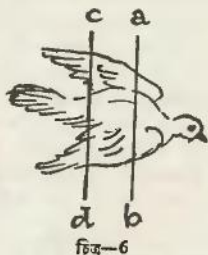


চিত্র-৫

নির্ধারণে সফট হ'লেন। মৌলিক লুডো-ছকা থেকে টেট্রাহেড্রন-পিরামিডের পথে তাঁর সে অভিযানের বিষয়ে পূর্বেই বলা হয়েছে। পূরের মাপ পাখি-ওঁর আদর্শবস্তু।

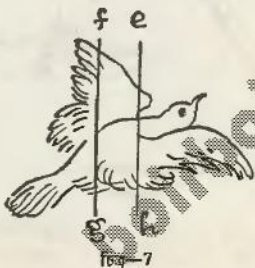
তঁার নোটবইতে আঁকা একটি স্কেচে (চিত্র ৫) দেখতে পাচ্ছি একটি মৃত পাখিকে বিভিন্ন বিন্দুতে ঝুলিয়ে তার ভারকেন্দ্রটি তিনি কীভাবে খরতে চাইছেন। শুধু তাই নয়, ওঁর মনে প্রশ্ন হল পাখি যখন উপরে ওঠে, অথবা নিচে নামে তখন কি কোনো জৈবিক কারণে তার দেহাভ্যন্তরস্থ ভারকেন্দ্রটি নড়া-চড়া করে? সে যুগে একথা ভাবতে পারাও বিস্ময়কর; কারণ বিজ্ঞান তখন জানত কোন বস্তুর ভারকেন্দ্র সুনির্দিষ্ট—যে অবস্থাতেই তাকে রাখো তার ঠাই নড়ন-চড়ন হবে না। লেওনার্দো বললেন, ঠিক কথা—সেটা অচেতন পদার্থে প্রযোজ্য; কিন্তু পাখি তো অচেতন পদার্থ নয়। অচেতন বস্তু দ্বিতীয় সত্তার সহায়তা ছাড়া স্বইচ্ছায় একতিল নড়তে পারে না; পাখি পারে। তেমনি, যেহেতু পাখি নিশ্বাস নেয়, তাই দেহস্থ বায়ুটাকে মুখে, শ্বাসনালীতে বা ফুসফুসে রেখে তার ভারকেন্দ্রকে কিছুটা সরাতে-নড়াতে পারে।

আজকের-দিনের পাঠকের কাছে তবুটা সহজবোধ্য—কারণ আমরা জানি, তিনি ফুসফুসে বাতাস সঞ্চয় করে না, বাতাস থেকে অক্সিজেন নেওয়া মাত্র তা সরাসরি



চিত্র-৬

রক্তকণিকায় পাচার করে; আমরা জানি, দৃষ্টি দিয়ে নয়, শব্দতরঙ্গের মাধ্যমে বাদুড় বা

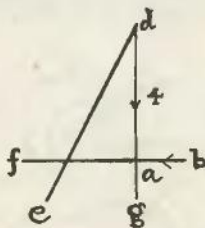


চিত্র-৭

তিম্মাদি জীব কান দিয়ে 'দেখতে' পায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, লেওনার্দোর এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাঁর মস্তিষ্কের রক্তকোষে জন্মগ্রহণ করেছিল ডারউইন-এর 'অরিজিন অব স্পেসিস'-এর প্রকাশের প্রায় শ-চারেক বছর পূর্বে! সেই পরিপ্রেক্ষিতে চিত্র-6 এবং চিত্র-7 বিচার করে এবার দেখুন। নোটবইয়ে উনি লিখেছেন, "পাখি যখন নিচের দিকে নামিতে থাকে (চিত্র 6), তখন তার দৈহিক ভারকেন্দ্র cd -রেখা ত্যাগ করিয়া ab -রেখার দিকে সরিয়া আসে। অপরপক্ষে পাখি যখন উপরে উঠে (চিত্র 7) তখন তাহার দৈহিক ভারকেন্দ্র ch -রেখা ছাড়িয়া fg -রেখার দিকে সরিয়া আসে।"^(৪৬)

দ্বিতীয় সমস্যা : P ; বাতাসের প্রতিবন্ধকতার স্বরূপ নির্ণয়। এবং তার সমাধান করবেন এমন একজন মূর্খ যিনি মাধ্যমিক-সিলেবাস-অন্তর্ভুক্ত নিউটনের তৃতীয় সূত্রটা পর্যন্ত জানেন না!

1505 সালে—অর্থাৎ আইজাক নিউটন ভূমিষ্ঠ হতে যখন 137 বছর এবং অরভিল রাইট-এর ডু-ভ্যাগের যখন 398 বছর বাকি—তিনি তাঁর নোটবইতে উদ্ভো-করে ইতালিয়ান ভাষায় যা লিখেছিলেন তা সোজা করে বঙ্গানুবাদ করলে পাঁড়ায়, "কোনও



চিত্র--৪

একটি বিহঙ্গ যদি dag পথরেখায় 4-একক বল-এর ফলশ্রুতিতে নিচের নামিয়া আসিতে থাকে এবং সেই সময় বাতাস যদি ঐ বিহঙ্গের প্রসারিত পক্ষদ্বারা তাহাকে ba -পথে 2-একক বল-এ ঠেলিতে থাকে তাহা হইলে ঐ উভয় বল-এর মিলিত ফলশ্রুতিতে বিহঙ্গ dc বক্রিম পথে নামিয়া আসিবে।"^(৪৭) (চিত্র 8)

বিহঙ্গের লেজ-এর কার্যকারিতা সম্বন্ধে লেওনার্দো যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সে-প্রসঙ্গে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডঃ হার্ট বলেছেন, "...এক্ষেত্রে লেওনার্দো যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রমাণ রেখেছেন তার চেয়ে দৃঢ় এবং আধুনিক চিন্তা কল্পনাতীত। ঐ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শেষ সিদ্ধান্তে তিনি আসতে পেরেছিলেন বা পারেননি তার যাথার্থ্য বিচার না করেই তাৎক্ষিক দিক থেকে এ-কথা বলি যায়। স্বীকার্য যে, আধুনিক আকাশযানের সঙ্গে লেওনার্দো পরিকল্পিত যন্ত্রাংশের তুলনা করা কঠিন; তবু এ-কথা মনে রাখতে হবে যে,

পাখির যেমন, এবং যে- কারণে আছে একটি লেজ, আধুনিক আকাশযানেরও তেমনি, এবং সে- কারণেই আছে 'টেইলপীস', 'রাডার' ও 'ফিন'। এই তিনটি যন্ত্রাংশ সম্মিলিতভাবে লেজের প্রয়োজন মেটায়।^(২০)

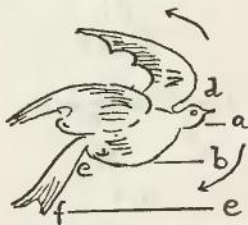
টেইলপীস, রাডার ও ফিন-এর ব্যবহার সম্মিলিতভাবে পাখির লেজের সঙ্গে তুলনীয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে এবার দেখুন লেওনার্দো কী লিখে গেছেন :

“বিহঙ্গ তাহার দ্রুতত্ব গতিকে সংবরণ করিতে পক্ষদ্বয় প্রসারিত করিয়া দেয় এবং লেজটি নিচের দিকে নামাইয়া দেয়। ডানাদুটি বিস্তার করিয়া বাতাসের প্রতিবন্ধকতাকে গতিহ্রাসের জন্য ব্যবহার করে। এজন্য নামিবার মুহূর্তে তাহার কোনও 'ধাক্কা' লাগে না।”^(২১)

পেনের পিছন দিকে জানলার ধারে বসে কখনও ল্যাভিং প্রক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন মনে হবে আকাশযান তার লেজের দিকের 'এলিভেটর' এবং পক্ষদ্বয়ের 'এইলেরন' দুটি উপর দিকে উঠিয়ে লেওনার্দোর নির্দেশ মেনে পাখির অনুকরণ করছে।

বিষয়টি তিনি অন্যত্র সচিত্র ব্যাখ্যা করেছেন।^(২২)

“বিহঙ্গ যখন মুখ উঁচু করিয়া বুক বাতাসের প্রতিবন্ধকতাকে গ্রহণ করে (লেওনার্দো বলেননি, আমরা জানি—জৈবিক প্রতিক্রিয়া-প্রেরণায় বা রিফ্লেক্স-অ্যাকশনে) তখন লেজটি

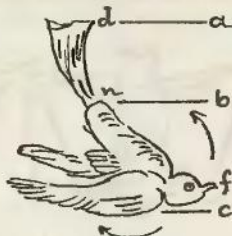


চিত্র-৯

নিচের দিকে নামাইয়া দেয় (চিত্র ৯)। বিহঙ্গ-দেহে abc -ভলে বাতাসের প্রতিবন্ধকতা কার্যকর। যদি 'c'-বিন্দু হয় ঘূর্ণনচন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দু (centre of rotation) তাহা হইলে পক্ষীদেহে দুইটি ভ্রামক (moment) কার্যকর হয়। bad বৃত্তপথ এবং abc দুইটি বিপরীতমুখী হওয়ায় পরস্পরকে নাকাল (neutralize) করিয়া পক্ষীকে উলটাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিবে।

“অপরপক্ষে বিহঙ্গের পৃষ্ঠদেশে যখন বাতাসের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় তখন সে (প্রতিক্রিয়া প্রেরণায়) লেজটি উপরে উঠায়। এক্ষেত্রে (চিত্র ১০) বাতাস dnc -ভলে

প্রতিহত। এবং 'n'-বিন্দু ঘূর্ণনছন্দ্রের কেন্দ্রবিন্দু। এ ক্ষেত্রেও বিপরীতমুখী শ্রামকদ্বয়



চিত্র-10

পক্ষীকে উল্টাইয়া যাওয়া হইতে রক্ষা করিবে।”

পক্ষসম্পালনের সাহায্যে পাখি কীভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যায়—এ বিষয়ে সেই পঞ্চদশ-শতাব্দীর চিত্রশিল্পী, থুডি বৈজ্ঞানিক, কী বলছেন দেখা যাক :



চিত্র-11

“বিহঙ্গ যখনanc (চিত্র 11) অবস্থানে থাকিবার সময় উপরে উঠিতে চাহে তখন সে পক্ষদ্বয়কে m এবং o-বিন্দুতে ঝাঁকাইয়া দেয়। অর্থাৎ তাহার পক্ষদ্বয়anc আকৃতির পরিবর্তে bmod অবস্থানে আসে। এইরূপে সে বাতাসকে নিচের দিকে ঝেঁরিয়া দেয় ; যাহার ফলে প্রতিশোধ লইতে বাতাস তাহাকে উপর দিকে ঠেলিয়া তোলে।”⁽²³⁾

এজনাই ভুল করে ওঁকে ‘শিল্পী’ বলে ফেলেছিলাম। কোনো বিজ্ঞানী ভুল করেও ঐ ‘প্রতিশোধ লইতে’ ভাষা ব্যবহার করবেন না। মেটিক্সা বেশ বোঝা যাচ্ছে, নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র না পড়লেও তিনি জানতেন ; তিনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐ বাধাই উড্ডয়ন-প্রয়াসীর পরোক্ষ আশীর্বাদ। কী পাখির, কী অজাত আকাশযানের। ঐ বাধাকে কব্জা করে মাধ্যাকর্ষণকে অতিক্রম করতে হবে।

তাই অন্যত্র বলছেন : “স্বরণে রাখিও তোমার মহা-বিহঙ্গ (অর্থাৎ অজাত আকাশযান) কোনও পক্ষীর অনুরূপে রূপায়িত হইবে না। কারণ বিহঙ্গের পক্ষদ্বয় পালকদ্বারা নির্মিত ; সেগুলি ছত্র-ওজন সম্পন্ন পক্ষীকেই বহন করিতে পারিবে এবং

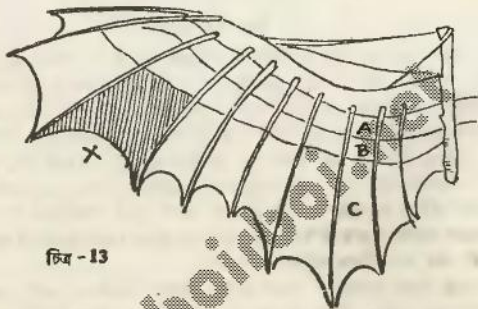
মহাবিহঙ্গের প্রয়োজনীয় বাতাসের প্রচণ্ড প্রতিবন্ধকতাকে সহ্য করিতে পারিবে না। স্মরণ রাখিও, তোমার আদর্শ : বাদুড়। তাহার পক্ষস্থল ভেদ করিয়া বাতাস গমনাগমন করিতে



চিত্র-12

পারে না। তাহা বায়ু-নিরোধক। ফলে সে মহা-বিহঙ্গকে ভাসমান রাখিতে সক্ষম হইবে (চিত্র 12)।^{১৭(২৫)}

এরপর বাদুড়ই হল গুঁর হ্যানজ্ঞান নিদিধ্যাসন। তিনি একাধিক বাদুড়ের ডানা জোড়া দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাখা নির্মাণ করেছিলেন। ভাবতে অবাক লাগে, সেই বীভৎস ডানার ছাওয়ায় দুর্গন্ধময় পরিবেশে বসে তিনি স্টুডিওতে সুকুমার রমণী, অথবা স্বর্গীয় দেবদুতদের আলেখ্য ঐকেছেন। ডক্টর জেকিল আর মিস্টার হাইড নয়—একদেহে অবনটাকুর আর আইনস্টাইন!

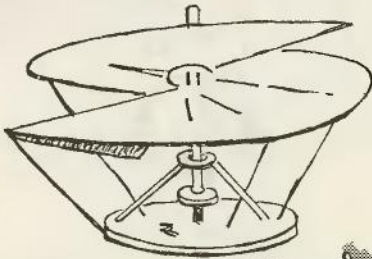


চিত্র - 13

চিত্র 13-এ তাঁর নির্মিত ও অঙ্কিত একটি বাদুড়-ডানার ছবি আঁকবার চেষ্টা করছি। প্রতিটি অংশে—A, B, C, X প্রভৃতি চিহ্নিত অংশের চাদর কী দিয়ে এবং কত মোটা করে বানাতে হবে তার নির্দেশ দেওয়া আছে। তবু দেখছি, লেওনার্দো তাঁর ‘মহা-বিহঙ্গের’ সাফল্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহচিহ্নিত; কারণ গ্রন্থের উপসংহারে তিনি বলেছেন,

“ঐহুপ পক্ষদ্বয় নিজের দুই বাহুমূলে সাঁটিয়া যদি পরীক্ষামূলকভাবে উড়িতে ইচ্ছা কর, তবে স্মরণ রাখিও—আমার পরামর্শ : পর্বতচূড়া হইতে হ্রদের দিকে উড়িবার চেষ্টা করিও, মাটির দিকে নয়। ইহাতে পতনজনিত আঘাত কম হইবে।”⁽²⁵⁾

লেওনার্দোর মহা-বিহঙ্গ আকাশে ওড়েনি, আমরা জানি। দুই-জাতের আকাশযানের চিন্তা করেছিলেন তিনি। প্রথম জাতের মডেলে চালক থাকবে খাড়া দাঁড়িয়ে—যন্ত্রটা হেলিকপ্টারের মতো খাড়া উপরে উঠবে—‘উইন্তকু’ ধরনের কিছু ডানা ঘুরিয়ে। এ-চিন্তাটি তাঁর প্রথম যুগের। পরবর্তী পর্যায়ে এ-চিন্তা তিনি বাতিল করেন। তবু এই সময়ে তিনি তাঁর স্কেচবুকে যে নকশাটি আঁকেছিলেন তাকে বলা যায় : হেলিকপ্টারের আদি-অনুভাবনা। লেওনার্দো ঐ নকশাটির পাশে লিখেছেন :



১৭ ৩ ২৩৩৮-১৭৭৬

চিত্র—14

“ক্ল-র আকারে নির্মিত ঐ যন্ত্রটিকে (চিত্র 14) যদি প্রাচণ্ডভাবে ঘুরাইতে পারা যায় এবং উপরিস্থিত ঐ ডানা দুটি যদি বাতাসকে দ্রুত মতো আটকাইতে পারে, তাহা হইলে বাতাসের বিপরীত প্রতিবন্ধকতা হেতু বিহঙ্গটি ক্রমশ উর্ধ্বে উঠিবে।”⁽²⁶⁾

দুর্ভাগ্য লেওনার্দোর ‘ক্ল-র আকারে নির্মিত ঐ যন্ত্রটিকে তিনি “প্রাচণ্ডভাবে ঘুরাইতে” পারেননি—বাহুবলে তা সজ্জা ছিল না, অথচ বাষ্পীয় তথা পেট্রোল চালিত যন্ত্র তখনও অনাবিস্কৃত। না হলে নিঃসন্দেহে লেওনার্দো হেলিকপ্টারের জনকরূপে চিহ্নিত হতেন।

এই প্রসঙ্গে আরও বলি—শুধু হেলিকপ্টার নয়, গ্লাইডার ও প্যারাসুট-এর মৌল-
তত্ত্বটিও তিনি করায়ত্ত করেছিলেন। তাঁর হু-চিহ্নিত পাণ্ডুলিপিতে একটি ছোট্ট স্কেচ
আছে। নিউটনের বাগানে যেমন একটি আপেল পড়েছিল, তেমনি তাঁর দৃষ্টির সম্মুখে
কোনো 'ফল'-এর দিনে ঝরে পড়েছিল একটি ওক-গাছের পাতা। নিউটন আপেলের
ছবি আঁকেননি, লেঅনার্দো পর পর পাঁচটি ভঙ্গিমায় পতনোন্মুখ পত্রখণ্ডটির স্কেচ
অতিদ্রুত গতিতে ঐকে ফেললেন। এ পর্যন্ত তিনি অবনটাকুর, নন্দলাল বা গোপাল
ঘোষ। কিন্তু তিনি তো শুধু শিল্পী নন, —তাই ঐ 'ছিন্নপত্রের' ঠিক নিচে কল্পনায় আঁকলেন



চিত্র-15

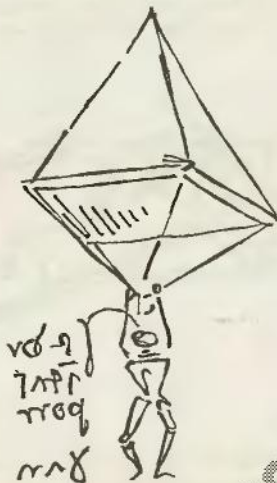
চারটি ইঙ্গিতধর্মী চিত্র—গ্লাইডার-এর প্রথম ভাবনা। (চিত্র ১৫) 'পাতাগুলি দিরদিরিয়ে'
ঝরে পড়াতেই তাঁর ক্ষান্তি নেই, উনি ভাবতে বসেন কীভাবে অন্তরাল থেকে ফলের
বাহ্যর-কে বাইরে আনা যায়।

ঐ চিত্রটির নিচে তিনি কী-যেন লিখেছিলেন। আজ তাঁর পাঠোদ্ধার করা অসম্ভব।
কোনো অনবধানতায়—বোধহয় দৃষ্টির জলে—ঐ অংশটা ধুয়ে গেছে। তাই ঐ চিত্রটি
পরবর্তী কালের কোনো বৈজ্ঞানিককে উদ্বুদ্ধ করেনি। নচেৎ গ্লাইডার আবিষ্কৃত হত অনেক
আগেই। ডক্টর হার্ট এই প্রসঙ্গে বলছেন, "যদি হোক, আমার মতে ঐ ছোট্ট স্কেচখানিই
ইতিহাসে গ্লাইডার অনুভাবনার আদি সূচনাবাহী। দুর্ভাগ্য আমাদের, এ নিয়ে লেঅনার্দো

আর গবেষণা করেননি।”

এই রকম অসংখ্য ক্ষেত্রে তিনি অসীম সম্ভাবনাময় তথ্যের ইঙ্গিত দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছিলেন। যেমন ধরা যাক : প্যারাসুট।

লেওনার্দো লিখেছেন, “কোনও বস্তু ব্যতীতে ততখানিই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, যতখানি বাতাস করে তাহার উপর। (চিত্র 16 অনুসারে) যদি কোনও মানুষ একটি



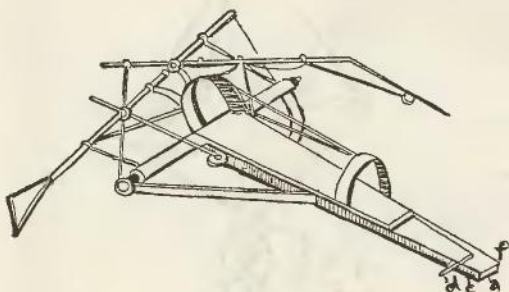
চিত্র-16

তীব্র আচ্ছাদন সমেত কোনও উর্ধ্বহান হইতে নীচে লক্ষ্য-প্রদান করে, তাহা হইলে সে নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করিতে সক্ষম হইবে।”

শুধু এখানেই তিনি থামেননি। একটি গড়-মানুষের ওজন বইবার উপযুক্ত ছাতার মাপ কত হবে তাও অল্প কয়েক বার করেছেন। তিনি কিন্তু ঐটুকু লিখেই খালাস। হাতে-কলমে পরীক্ষাটা করেননি। রাশিটুকু দিয়ে করাননি। হয়তো তার হেতু তাঁর মূল লক্ষ্য মাটি ছেড়ে উপরে ওঠা, উপর থেকে নিচে নামা নয়। অথবা হয়তো ইতিমধ্যে অন্য

কিছু নিয়ে মেতেছিলেন। কিন্তু তাঁর জমানার প্রায় একশ বছর পরে ভেগ্যারিও নামে একজন ভেনিসীয় দুঃসাহসী ঐ যন্ত্রটি নির্মাণ করে ঝাঁপ দেন এবং অক্ষতশরীরে তৃপ্তে অবতরণ করেন।

সে যাই হোক, বিহঙ্গ-বাসনার দ্বিতীয় পর্যায়ে উনি দণ্ডায়মান অবস্থায় উড্ডয়নের চিন্তাটা পরিহার করেন। এবার তাঁর লক্ষ্য ছিল শায়িত অবস্থায়—পক্ষীর ভঙ্গিমায় ওড়া যায় কিনা দেখা। গুনে দেখেছি, তিনি সর্বসম্মত চৌদ্দটি ডিজাইন করেছিলেন খাতা-কলমে। তার ভিতর কতগুলির এবং কোন্ কোন্‌টির বাস্তব মডেল উনি বানিয়েছিলেন তা জানা যায় না। তবে অনেকগুলির বানিয়েছিলেন। স্থানাভাবে একটিমাত্র নকশা (চিত্র 17) এখানে যুক্ত করা গেল। এ-ক্ষেত্রে চালককে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। দু-দিকে



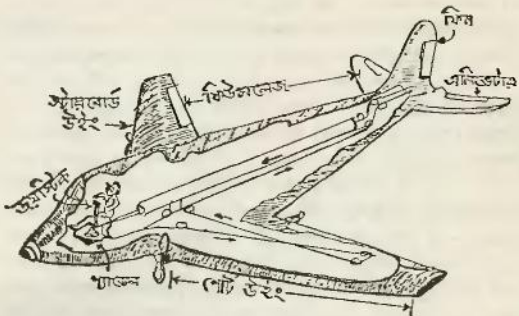
চিত্র—17

চিৎড়ি-মাছের দুটি দাঁড়ার মতো অংশে যুক্ত থাকবে বাদুড়ের ডানা। হাত খুঁট পায়ের সাহায্যে বিভিন্ন কলকল্লা নাড়িয়ে আকাশযান উপরে-নিচে, বাঁয়ে-বাঁকানো যাবে—এই আশাই করা হয়েছে।

এই পর্যায়ে একটি বাস্তব আকাশযানের বিভিন্ন যন্ত্রাংশের কার্যকারিতা যাচাই করে দেখে নেওয়া যেতে পারে (চিত্র 18)। চালক কীভাবে 'জয়স্টিক'-টিকে সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে হেলিয়ে, আকাশযানকে নিয়ন্ত্রণ করে; কীভাবে প্যাডেল-বার-এ চাপ দিয়ে এলিভেটর, র‍াডার ও ফিন-এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। খুব কিছু তফাৎ নজরে পড়ছে কি?

তবু লেঅনার্দোর 'মহা-বিহঙ্গ' নকশা ছেড়ে নভোচরী হল না।

কেন?



চিত্র—18

আগেই বলেছি, তিন জাতের 'বল'-এর সঙ্গে ওঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। মাধ্যাকর্ষণ— W ; বাতাসের প্রতিবন্ধকতা— P এবং যান্ত্রিক গতিবেগের উৎস— F । প্রথম দুটিকে তিনি কক্ষা করতে পেরেছিলেন। পেলেন না 'F'-এর নাগাল। পাওয়ার কথাও নয়। যে ন্যূনতম গতিবেগে আকাশযান আকাশে উঠে পড়তে পারবে, অর্থাৎ যে গতিবেগের প্রতিবন্ধকতার ঊর্ধ্বমুখী বলাংশ P , হবে W -র সমান সেই প্রচণ্ড গতিবেগ শুধুমাত্র বাতাসে লাভ করা অসম্ভব।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ দৌড়ে পালা দিতে চেয়েছিল চার-পেয়ে জীবদের সঙ্গে। পারেনি। শুধুমাত্র দৈহিক ক্ষমতায় তা ছিল অসম্ভব। দৌড়ে পেছন থেকে সে ধরতে পারেনি হরিণকে; দৌড়ে সামনে থেকে পালাতে পারেনি সেবর-টুথড সাইয়ের গ্রাস থেকে। তারপর একদিন সে অতিক্রম করল এই বাধা। দৈহিক ক্ষমতায় নয়। মস্তিষ্কের উদ্ভাবনী শক্তিতে। মানবেতিহাসের বিবর্তনে সে এক যুগান্তরে উদ্ভবের আধিষ্ঠিত হল : চাকা।

ঠিক তেমনিভাবে আকাশ পাড়ি দেবার প্রতিশ্রুতিতে—বিহঙ্গবাসনার ক্ষেত্রেও এই দ্বিপদী জীবের দৈহিক ক্ষমতা জয়মাল্য আনতে পারেনি। বিজ্ঞানকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য।

লেওনার্দোর যুগে যে-কথা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর।

মহাকবির পরিকল্পনায় রাবণাখণ্ড ইন্দ্রজিতের করায়ত্ত হয়েছিল বজ্র। কিন্তু জীবনের শেষ যুদ্ধে বেচারি মেঘনাদ অস্ত্রাঘাতে লুপ্তায়িত সেই বজ্র-আয়ুধের নাগাল পায়নি। লেওনার্দোর অবস্থাও অনুরূপ। তাত্ত্বিক সূত্রটা তাঁর প্রায় করায়ত্ত। কিন্তু নিকুন্তিলা গবেষণাগারে প্রয়োজনের সময় প্রয়োগকৌশলটার নাগাল তিনি পাননি। জরাজনু একক

যোদ্ধা শুধু বাহুবলের উপর নির্ভর করে ক্রমাগত কোষাকুণ্ঠি, পুষ্পপাত্র, ধাতবঘণ্টা প্রতিপক্ষের মস্তক লক্ষ করে নিষ্ক্ষেপ করেছিলেন। কিছুতেই খুঁজে পাননি সেই বস্তুটিকে। একটিই ভুল হয়েছিল তাঁর—কয়েক শতাব্দী পূর্বে জন্মগ্রহণ করা। লেঅনার্দোর নিকুভিলা-ল্যাবরেটোরির বাইরে অবস্থিত সেই অজাত ব্রহ্মাণ্ডটির নামঃ ইন্টার্নাল কনসাস্শান এন্ট্রিন।

উপসংহারঃ—‘অবাক-পৃথিবী’ সায়েন্স-ফিক্শানে আমার সৃষ্ট একটি চরিত্র একবার বলেছিল—দ্যা ভিশি ছিলেন “মাস্টার অব-অল-ট্রেডস্, জ্যাক-অব-নান।” সেটা কথাসাহিত্যিকের অত্যাশ্চর্য। লেও গ্রীকভাষায় জ্যাকও ছিলেন না। সে-অর্থে তাঁর সমকালীন ফ্লোরেন্সবাসী—পাওলি, তস্কানেল্লি বা মিরান্দেলা ছিলেন অনেক বড় জাতের ‘পণ্ডিত’। তাঁর এক সাম্প্রতিক জীবনীকার যে বলেছেন, “জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেকটি শাখায় তিনি ছিলেন যাদুকরের মতো বিস্ময়কর”—সে ধারণাটাও ভুল। মিলান-শহরের পুনর্বিন্যাসে যে ‘টাউন-প্ল্যানিং’ নকশা তিনি বানিয়েছিলেন তা অবাস্তব, খাল-কাটার একটি পরিকল্পনাও বাস্তবিত্তে পূর্ণ। ভুল তিনি করেছেন—অনেক ভুল, কিন্তু তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে আদ্ভুত জ্ঞানের স্বাক্ষর তিনি রেখেছেন। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তাঁর স্থাপত্য-ভাস্কর্য, শারীরবিজ্ঞান-চিত্র, চিত্রশিল্প-ছোটগল্প-সঙ্গীত ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা করে একটা গ্রন্থরচনার বাসনা আজ এক-দশক ধরে পোষণ করছি। তারই একটি সামান্য দিক এখানে ভুলে ধরলাম। জানি না, সে-গ্রন্থ কোনোদিন শেষ হবে কি না—অথবা জীবনের শেষদিনে অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিখানি দিয়ে যাব—কিন্তু কাকে ? আমার তো কোনো শিষ্য নেই।

সে যাই হোক, এ পর্যন্ত ঐ মহামানবের বিষয়ে যেটুকু বুঝেছি তার চুস্চকসার এই মণ্ডকায় ছাপার হরফে লিপিবদ্ধ করে যাই : সমকালের চেয়ে শুধু কয়েক দশক নয়, কয়েক শতাব্দী এগিয়ে তিনি চিন্তার জগতে এক অদ্ভুত নজির রেখে গেছেন। তাঁর বহুমুখী দূরন্ত কৌতূহল, গভীর অনুসন্ধিৎসা, নৈর্ব্যক্তিক গবেষক মন এবং অধ্যবসায় বিশ্ব ইতিহাসে অনন্য, একক। বহুমুখীনতার বিচারে তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিস্ময়।

টীকা ও উৎসনির্দেশ

1. ‘The Mechanical Inventions of Leonardo da Vinci’—
Dr. I. B. Hart, California University Press, 1963, P.7.
2. নর্মান কার্পেন্টার, এফ. আর. সি. এস. এ-মত স্বীকার করেন না। দ্রষ্টব্য :
‘Leonardo’s Left hand’, 1952, P. 813.
3. Leonardo’s Mss. I. a.
4. Do. Mss. A. IV. 163 b.
5. পুষ্পনগরী = Florence.
6. Leonardo’s Mss. E. fol 20v.
7. Do Mss. A. fol 2v.
8. Do. Mss. A. fol 30v.
9. Annual ‘Master Mind Lecture,’ British Academy, Vol IX, by C. J.

Holmes.

10. Chambers Biographical Dictionary, Vol I. P449.
11. Codex Atlan fol. 154r.
12. Do. A. fol. 21v.
13. Do. A. fol. 13/12.
14. Do. Codex At. fol. 372b.
15. Mss. A. fol. 45r.
16. Mss. A. fol. 57v.
17. Guinness Book of World Records, 13th Edn, P 192.
18. উড্ডয়ন গ্রন্থ : Mss fol. 16 (15) v.
19. ঐ : Mss. fol. 6 (5) r.
20. The Mechanical Inventions Of Leonardo da Vinci, Dr. I. Haru, P.215.
21. Mss. L. fol. 58.v.
22. উড্ডয়ন-গ্রন্থ : Mss. fol 9 (8) v.
23. Codex Atlan, fol. 161 r.a.
24. উড্ডয়ন-গ্রন্থ : Mss. fol. 16.
25. Mss. B. fol. 74r.
26. Mss. B. fol. 83v.
27. Codex Atlan, fol 381.



boirboi.net

গোপ্পদে প্রতিবিস্তিত পুষণ



জুলিয়াস সমাধিমন্দিরে মোজেস্-এর মূর্তিটা যেন চোখের উপর ভাসছে। জ্ঞান-তপস্বী সত্যদ্রষ্টা মোজেস্ বসে আছেন সিংহাসনে, কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন উঠে দাঁড়াবেন। দক্ষিণ হস্তে পাষাণ-ফলক, তাতে 'টেন কমান্ডমেন্টস্' উৎকীর্ণ করা। বাম হস্ত দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ। ঈগলদৃষ্টিদহনকারী জ্বলন্ত একজোড়া চোখ। দৃঢ়নিবদ্ধ 'বক্ষিমী' ওষ্ঠাধর। বলিরেখাঙ্কিত অশীতিপর জ্ঞানবৃদ্ধের পেশীবহুল সর্বাবয়বে জরা কিন্তু কোনও ছায়াপাত করেনি। উনি চারশ' বছর পূর্বে জন্মালে মিকেলাঞ্জেলো বোধ করি ঐকেই মডেল করে তাঁর মোজেস্-মূর্তি গড়তেন।

সুনীতিকুমারের দক্ষিণ হস্তেও জ্ঞানরাজ্যের ছাড়পত্র, মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্তে অজ্ঞান-অশিক্ষা-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ। সাতাশ বছর বয়সেও তিনি অজর, প্রাণচঞ্চল, তরুণ। অটুট স্বাস্থ্য, অনাবিল স্মৃতিশক্তি এবং অনবক্ষ্য মেধা। শুধু অজর নন, অমরও। রবিবার, বাইশে মে, 1977, বিকাল চারটা দশে তিনি প্রমাণ রেখে গেলেন—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, রাধাকৃষ্ণণ-এর এই উত্তরসূরীও মৃত্যুঞ্জয়ী।

'সমসাময়িকের দৃষ্টিতে সুনীতিকুমার' যদি আলোচ্য বিষয় হয় তবে আমি এর মধ্যে নেই। তিনি এ দুনিয়ায় এসেছিলেন গত শতাব্দীর দশ-বছর বাকি থাকতে, আমি এসেছি এ শতাব্দী যখন প্রথমপাদ পাড়ি দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, তাঁর কর্মময় জীবনের সাতাশটা বছরের মধ্যে মাত্র শেষ নয় বছর আমি তাঁর সান্নিধ্যে আমার সুযোগ পেয়েছি। তার পূর্বে তাঁর ফটো দেখেছি, প্রবন্ধ ঢেছি এবং দূর থেকে বার কয়েক দেখেছি মাত্র—মণের মধ্যমণি হিসাবে উনি, দর্শকে আসনে দূরতম প্রান্তে আমি। ততদিনে আমার স্থান-পন্থেরো বই ছাপাখানার মুখ দেখেছে; কিন্তু কোনদিন তার কোনও কপি সুনীতিকুমারকে শ্রদ্ধার্থ্য পাঠানোর কথা আমার মনেও আসেনি। কী হবে ভাষে ঘি ঢেলে? উনি প্রতি হুণ্ডায় দশ-বিশখানা স-প্রকাশিত বই উপহার পান, তার মধ্যে আমার বই ভিড় বাড়িয়ে কী করবে? তাঁর মধ্যে প্রথম আমার অভিজ্ঞতাটি আমার রীতিমতো নাটকীয়। গোপ্পদ ছিল তা পঞ্চকুণ্ডে আখ্যানময়, সত্ত্ববর্ণে ভাস্বর ভাস্করই নভোচারণপথে

সকৌতুকে ঐ গোম্পদকে উদ্ভাসিত করে তোলেন। সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করছি, না হলে কিছুতেই বোঝাতে পারব না লিলিপুটিয়ান কেমন করে ব্রব্‌ডিন্যাগিয়ানের মুখোমুখি হল :

সেটা 1968 সাল।

তারিখটা মনে নেই। বারটা আছে। রবিবার। সকালবেলা বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি, হঠাৎ টেলিফোনটা বাজল। বড় মেয়ে বুলবুল ছিল কাছেই। সে-ই সাড়া দিল। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, তোমার ফোন, সাম মিস্টার চ্যাটার্জি খুঁজছেন।

উঠে এসে ওর হাত থেকে রিসিভারটা নিলাম। আশ্চর্যঘোষণা করতেই ওপ্রান্তবাসী বলেন, থাক, এবারেও তাহলে রঙ নাথায় হয়নি।

প্রশ্ন করি, আপনি কে কথা বলছেন?

—আমি, মানে সুনীতি চাট্জে বলছি।

আমি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে অতীত জীবনটা একবার হাতড়ে নিই। সুনীতি চাট্জে নামের কোনও লোকের সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়েছে মনে পড়ল না।

হঠাৎ খেয়াল হল, দিনকতক আগে মেসার্স এস. এম. চ্যাটার্জি নামে একটি কন্ট্রাক্টার্স ফার্ম একটি সরকারী কাজ পেয়েছেন, আমিই তাঁদের টেন্ডার আকসেপ্ট করেছি। মনে হল, নিতান্ত কোনও জরুরী প্রয়োজনে উনি রোব্বারে বাড়িতে ফোন করছেন। এস. এম. চ্যাটার্জির পুরো নামটা আমার জানা ছিল না। বলি, বলুন? কী বলছেন?

—আপনার ‘অপরূপা অজ্ঞতা’ বইখানা এইমাত্র শেষ করলুম।

ঠিক্দের উদ্ভলোক যে সাহিত্য-রসিক তাও জানা ছিল না আমার। সেই সূত্র ধরে উনি যে আমাকে বাড়িতে ফোন করে খেজুরে-আলাপ জুড়েছেন এটাও ভাল লাগল না। বললাম, ও।

আমার নিরুৎসাহে ও-প্রান্তবাসী কী বুঝলেন, তা তিনিই জানেন। তবু বললেন, বেশ ভাল হয়েছে বইটা।

আমি গাভী বজায় রেখে বলি, শুধু সে-কথা জানাতেই ফোন করছেন?

তবু ও-প্রান্তবাসীকে নিরুৎসাহিত করা গেল না। বললেন, হ্যাঁ। আপনার পাবলিশারকে ফোন করে আপনার বাড়ির ফোন-নাথার পেলাম।

আমি ইংরাজি বর্ণমালার পঞ্চদশ বর্ণটি ওঁকে পুনরায় শুনিয়ে দিলাম।

উনি এবার বললেন, আপনার কি এখন অবসর আছে? আমার বাড়িতে একবার আসতে পারেন?

এই প্রথম আমার খটকা লাগল, কোথায় কী যেন ভুল হচ্ছে। মেসার্স এস. এম. চ্যাটার্জি কোম্পানীর প্রোপ্রাইটার এভাবে সরকারী এজিনিয়ারকে তাঁর বাড়ি যেতে বলবেন না। ইতস্তত করে বলি, ইয়ে মাপ করবেন... আমি ঠিক আপনাকে ‘প্রেস’ করতে পারছি না, মিস্টার চ্যাটার্জি। কোথায় আমাদের আলাপ হয়েছে বলুন তো?

—আহা হা! আলাপ হয়নি! আলাপ করবার জন্যই তো ডাকছি...

বিদ্যুৎচমকের মত একটা চিন্তা মাথায় খেলে গেল। কিন্তু সেটা নিতান্তই অসম্ভব!

তবু নিমজ্জমান মানুষ যেভাবে শেষ-কুটোটা আঁকড়ে ধরে সেই ভাবে বলে উঠি : বাই এনি চান্স...আপনি কি...মানে, কীভাবে বলব ? অর্থাৎ আপনি কি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার...

মাঝপথে আমাকে থামিয়ে দিয়ে উনি বলে ওঠেন, আচার্য-ফাচার্য নয়, তবে আমি যে সেই সুনীতিকুমারই বটে, তা তো গোড়া থেকেই বলছি।

আমি নেই !

হাত দুটি জোড় করলে উনি দেখতে পাবেন না, মাঝ থেকে রিসিভারটা পড়ে ভাঙবে। তবু কষ্টধরে ক্ষমা-চাওয়ার অভিব্যক্তি যতটা আনা যায় সেই চেষ্টা করে বলি, স্যার ! আমি যে স্বপ্নেও ভাবতে পারছি না...আপনি এভাবে আমার টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করে...মানে...কী বলব ? আমি, স্যার...

—আপনার হাতে এখন সময় আছে ? আমার বাড়িটা...

—জানি স্যার ! 'সূর্যম' ! আমি এখনই আসছি !

—শুনুন। আসবার সময় এক কপি 'অপরূপা অজন্তা' নিয়ে আসবেন।

তখন খেয়াল হয়নি, গাড়িতে যেতে মনে হল—দ্বিতীয় এক কপি বই উনি নিয়ে যেতে বললেন কেন ? যে-কপিটা উনি পড়েছেন সেটা কেমন ভাবে পেলেন ? আমি কমপ্লিমেন্টারি কপি পাঠাইনি। ওঁর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় নেই—উনি নিত্য এমন বহু পান, নিশ্চয় পড়ে উঠবার সময় পান না। ওঁকে কমপ্লিমেন্টারি কপি পাঠাবার কথা আমার মনেও আসেনি। বইটা মাসব্যক্তক প্রকাশিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ওটার পিছনে খঁচিতে হয়েছে। প্রকাশক মহাশয়ের কাছে শুনছি বইটা বাজারে কাটছে না, পোকায় কাটছে। বিদগ্ধ-পাঠকদের মধ্যে একমাত্র বনফুল একটি চিঠিতে আমাকে অভিনন্দিত করেছেন। তাঁর চিঠির একটি পংক্তি পড়ে পড়ে আমার মুখস্ত হয়ে গেছে—“এর জন্য আপনি অনেক খেটেছেন, অনেক পড়েছেন, কিন্তু এও বুঝতে পারছি এর মূল্য সাধারণ বাঙালী পাঠকসমাজ আপনাকে দেবে না। ক্ষীর হজম করার শক্তি যে তাদের নেই—রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দলবোঁধে 'ফুচকা' খেতে আজ তারা অভ্যস্ত হয়েছে।” ঐ একটি পংক্তিই সেদিন ছিল আমার তিন বছরের পরিশ্রমের পুরস্কার।

সদর দরজায় কল-বেল বাজাতেই ভিতরে মিষ্টি সুরেলা শব্দ-বাংকার শোনা গেল। অচিরে একটি গৃহভৃত্য দ্বার খুলে দিল, খুলে দিল ফ্যানটাও। বসতে বসতে আমাকে। বাড়িয়ে ধরল একটি বাঁধানো খাতা। তাতে নাম, পরিচয় লিখে দিলাম। ভিতরে চলে গেল।

ঘরে দু-একটি মূর্তি—ব্রোঞ্জ এবং পাথরের। দেওয়ালে রাখা কতকগুলি সাদা মার্বেল পাথরের ফলক, তাতে কী লেখা আছে খোদায় জানি না! বর্ণমালাই চিনতে পারলাম না, হিব্রু-তিব্ব হবে বোধ হয়। মনে হল, একটি পিপাসু অ্যালকোহল-মিশ্রিত চাইনীজ-ইংকের বোতলে অবগাহন স্নান সেয়ে ঐ মার্বেল ফলকের পথ বেয়ে রাত করে বাড়ি ফিরেছে। একটু পরেই ডাক এল। গৃহভৃত্যের পিছুপিছু উঠে এলাম তিনতলায়। মাঝারি মাপের ঘর। অর্ধেকটা জুড়ে প্রকাণ্ড একটা খাঁট। কিন্তু প্রকাণ্ড হলে কি হবে, মনে হল রাতের

প্রথম গ্রহণেও গৃহস্থানী টেকি অবতারণ হতে পারেন না, কারণ পালকের তিন-চতুর্থাংশ বৃকোদরভাণ্ড দখল করে আছে নানান জাতের গ্রন্থ। একটি বড় টেবিল—তাও পুস্তকে 'উপঢ়ীয়মান'। দুটি ঝাঁকের আলমারি—হাতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সংগৃহীত শিল্পসম্ভার। খুঁটিয়ে দেখবার সময় পেলাম না। নজর হল, গৃহস্থানী সামনের ইজিচেয়ারে অর্ধশয়ান হয়ে কি একখানা বই পড়ছিলেন। আমাকে দেখে বইখানা মুড়ে রাখলেন। খালি গা, পরনে ধুতি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি। আমি প্রণাম করতে এগিয়ে গেলাম। উনি ব্যাগ-বাম্পনে বাধা দিলেন। বললেন, কলির ব্রাহ্মণকে প্রণাম করতে নেই।

ওঁর প্রথম কথাটাতেই আমার সঙ্গে মতানৈক্য হল; কিন্তু প্রতিবাদ করবার সাহস হল না। ওঁর নির্দেশে বসে পড়লাম একখানা চেয়ারে।

—আমার বইখানা এনেছেন? অপূর্ণপা অজ্ঞতার দ্বিতীয় কপি?

আমি সে-কথার জবাব না দিয়ে বললাম, আমাকে, 'আপনি' বলবেন না স্যার! প্রণাম না নিলেন, নাই নিলেন, 'তুমি' বলুন!

—না, না! ওটা আমার হাতে নেই। 'আপনি-তুমি' রকমফের করতে হলে ঐ সঙ্গে ক্রিয়াপদগুলোকেও তো বদলাতে হয়। সে বড় বখেড়া। তাই আমার ছাত্রের ছাত্রকেও 'আপনি' বলি।

উপায় নেই। যশিন দেশে। বিশেষ, উনি যখন ব্যাকরণে কাঁচা। আমি বইখানা বাড়িয়ে ধরি।

প্রথম পাতটা উল্টে দেখে বললেন, কই আমাকে দিচ্ছেন তা তো লিখে দেননি?

আমি বিনা ব্যাকব্যয়ে পকেট থেকে কলম বার করে ওঁর নামটি প্রথম পৃষ্ঠায় লিখে আবার বইটি ওঁকে দিলাম। উনিও বিনা ব্যাকব্যয়ে উল্টে ঝাঁড়ালেন, কথির কাপড়টা সাঁটিতে সাঁটিতে ঘরের ও প্রান্তে গেলেন এবং ফিরে এলেন আর এক কপি 'অপূর্ণপা অজ্ঞতা' হাতে। সেটা আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এই নিন, আপনার বই।

মাথামুণ্ডে কিছুই বুঝতে পারছি না! উনি আরাম-কদারায় বসে বললেন, আমি বনফুলের সঙ্গে একমত হতে পারিনি। এ কথা যদিচ ঠিক যে, ইদানীং সাধারণ বাঙালীর ক্লীর হজম করবার ক্ষমতা ক্রমশঃ লুপ্ত হতে বসেছে, এবং দল বেঁধে 'মুচকা' খেতেই তারা অভ্যস্ত—তবু আমার বিশ্বাস, আপনাকে এ বই একদিন দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপতে হবে। তখন ঐ কপিটা কাজে লাগবে। খুলে দেখুন।

ভাষাবিদ এবং বৈয়াকরণিকের ঘনিষ্ঠ সারিধ্য সত্ত্বেও সেই মুহূর্তে আমার মনে পড়ল লুইস্ কারল ব্যবহৃত ব্যাকরণ-বহির্ভূত সেই শব্দটি—'কিউরিয়সার! অ্যান্ড কিউরিয়সার!' বইটা খুলে দেখি—মার্জিনে অসংখ্য মন্তব্য। বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করেছেন, পাণ্ডুয়েশন মার্ক বদলেছেন—গোটা বইটা প্রুফ-রীডিং করেছেন। কোথাও লিখেছেন 'রেখাচিত্র চাই', কোথাও 'অমুক গ্রন্থের অমুক পৃষ্ঠা দেখুন', কোথাও বা উৎসাহবর্ধক দু একটি ইন্টারজেকশন। দু-একস্থলে ওঁর সংশোধনের অর্থ বোধগম্য হল না। প্রশ্ন করলাম, লেখনারদের 'লাস্ট সাপার' কথাটা কাকেছেন কেন?

ওঁর চোখ দুটি হাসিতে চিহ্নিত করে উঠল। বললেন, যোহেতু লেখনার্দে দ্য ভিগি

‘লাস্ট সাপার’ নামে কোন ছবি আঁকেননি।

আমি অবাক হয়ে বলি, তার মানে ? ‘মোনালিজা’ ছাড়া ওঁর ‘লাস্ট সাপার’ই তো—
বাধা দিয়ে বললেন, দু-দশক তো পার হয়ে গেছে বেশটা স্বাধীন হবার পর।
লেঅনার্দো যে ছবিটা আঁকেছিলেন তার নাম তিনি ‘লাস্ট সাপার’ দেননি ; তাঁর ভাষায়
যদি বলতে চান, বলুন, ‘চেনা উল্টিমা’ (Cena Ultima)। আর যদি মনে করেন সে
ভাষায় বললে আপনার পাঠকের মগজে ঢুকবে না, তবে যে-ভাষায় বইটি লিখেছেন
সেই সাদা বাঙলায় বলুন ‘শেষ সায়মাশ’। ইংরাজের দেওয়া নাম এখনও চালাতে হবে
কেন ?

আমি ত্রুটি স্বীকার করে সবিনয়ে বলি, আর এখানে ? সিংহল অবদান জাতকের
এখানে জিজ্ঞাসার চিহ্ন কেন ?

বললেন, ঠিক মনে পড়ছে না। পড়ে শোনান তো জায়গাটা ?

আমি পড়ে যাই “দ্বীপটির নাম তাম্রদ্বীপ—ইতিপূর্বে জম্বুদ্বীপের কোন বণিক কখনও
আসেনি এ দ্বীপে। নারিকেল ছাওয়া সমুদ্র-মেখলা ঐ দ্বীপ—

আমাকে মাঝপথে বাধা দিয়ে বললেন, মনে পড়েছে। আপনার এই বর্ণনায় আমার
আপত্তি ঐ ‘নারিকেল-ছাওয়া’ শব্দটায়। আপনি জাতকের গল্প শোনান্ছেন, সিংহল দ্বীপে
পলিনেশিয়া থেকে নারিকেল গাছ আমদানি করা হয় খ্রীষ্টজন্মের পর। খ্রীষ্টপূর্ব সিংহলের
বনরাজি তমাল-তালে নীলা হতে পারে, নারিকেল ওখানে আউট-অব-বাউন্ডস্।

কথা বলতে বলতে দু-জনেই মেতে উঠি। আমি সদ্য অজান্তা চম্বে এসেছি। জাতীয়
গ্রন্থাগারে না-হ’ক মাস ছয়েক ঘোরাঘুরি করেছি—অথচ উনি দেখছি...তা তো হতেই
পারে। উনি আশী বছর ঘরে বিশ্বসংস্কৃতি নিয়ে মেতে আছেন ! মতের অমিল হলেই
বার করে স্নানছেন বই—গ্রিফিথ, ইয়াজদানি, লেভি হ্যারিংহাম, মুকুল দে। টেবিলের
উপর তুপাকার হয়ে উঠল ঈশানচন্দ্রের জাতক, ফৌসবালের জাতকার্থনামা, বুদ্ধের
নানান প্রামাণিক জীবনী। সবই ছিল ওঁর পাশের ঘরে। সে ঘরটা প্রকাণ্ড—জাতীয়
গ্রন্থাগারের ভূগর্ভস্থ কামরার মত ক্রমাগত কাঠের আলমারি। উনি একটি উঁচু মইয়ের
সাহায্যে বইগুলি পেড়ে নামাচ্ছিলেন। সম্রাট হুমায়ূনের শেষকটি মুহূর্তের কথা মনে পড়ায়
আমি তখন নিঃশ্বাস বৃদ্ধ করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম। কোন গ্রন্থটি কোন
আলমারির কোন তাকে রাখা আছে তা জানবার জন্য, কোনও ইংরেজ ব্যবহার করতে
দেখিনি। ইভেঞ্জ কার্ডগুলি বোধ করি ওঁর বিরলকেশ মাথার ভিতর থেকে-সেলএর খাঁজ
খাঁজে ধরে ধরে সাজানো।

সকাল আটটায় শুরু হয়েছে। তারপর কখন যে ঘণ্টাচারেক কেটে গেছে একেবারেই
টের পাইনি। এর ভিতর বার দুই-তিন টেলিফোন এসেছিল। তাতে সুর কাটেনি।
এসেছিল কিছু দর্শনার্থী ছাত্রও। তাতে আমার সুর কেটেছিল বটে ওঁর কাটেনি। অর্থাৎ
ছাত্রদলকে যখন বিদায় করলেন তখন উনি ব্রীতিমতো ‘অফ-মুডে’। অথচ তারা চলে
যাবার পরেই উনি অন্যায়সে ফিরে পৌঁছেন সেই সহ্যাদ্রি পর্বতমালায়, বাঘড়া নদীর তীরে
মধুকোমের মতো সাজানো গুহাগুলিতে—বিহার-চৈত্য-সংঘারামে। আমার সেই ‘মুডে’

ফিরে আসতে যথেষ্ট সময় লাগল। সে অভিজ্ঞতার কথাটাও শোনাই।

চার-পাঁচটি কলেজের ছাত্র এসেছিল। যতদূর মনে পড়ে তিনটি ছাত্র ও দুটি ছাত্রী। ওরা সবাই সে বছর বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা দিয়েছে। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে টের পেলাম—ওরা এসেছে আরও বৃহত্তর দলে। নিচে জন-পাঁচ-সাত অপেক্ষা করছে। ঐ পাঁচজনকেই মুখপাত্র করে তে-তলায় পাঠিয়েছে। ওদের যে লীডার-অফ-দ্য-ডেপুটেশান সে হাত-কচলে কচলে ওদের সমস্যার কথাটা জানালো। ওরা সবাই এম. এ.-র ফলাফল প্রত্যাশা করছে। ফল বের হতে আরও দিন-পনের বাকি। ইতিমধ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে কোথায় বুঝি কিছু চাকরি খালি আছে। প্রার্থীর ন্যূনতম শিক্ষার যোগ্যতা এম. এ.। আবেদন করার শেষ তারিখটা ওদের ফলাফল ঘোষিত হবার ঘোষিত তারিখের হপ্তা-খানেক আগে। তাই ওরা 'স্যার'-এর কাছে এসেছে। কারণ এবার এম. এ. পরীক্ষার যিনি হেড-এগ্জামিনার—অর্থাৎ যার কাছে খাতাগুলি কর্তৃত্বমানে রয়েছে, তিনিও ঐ 'স্যারেরই' ছাত্র। 'স্যার' যদি স্যারের surrogate 'স্যারকে' টেলিফোনে একটু 'রিকোয়েস্ট' করে জানতে চান, এদের মধ্যে কে-কে পাশ করেছে...

আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর সেই ছাত্রটি—অর্থাৎ যিনি সে বছর বাংলার হেড-এগ্জামিনার, তাঁর নামোল্লেখ করে বললেন, অমুক তো বিচক্ষণ এবং সংবেদনশীল; তোমরা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস কর না বাপু, সে নিশ্চয় বলে দেবে...

দ্বিতীয় একজন বলে বসল, না স্যার উনি আমাদের দেখলেই খচে যাবেন, আপনি যদি...

সুনীতিকুমার মাঝপথেই বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, রস, রস, ওটা কী বললে, "উনি আমাদের দেখলেই কী হয়ে যাবেন?"

ছেলেটি ব্রীতিমতো ঘাবড়ে যায়। আমতা আমতা করতে থাকে।

পাশ থেকে তার সহপাঠীরা এক বুদ্ধিমতী বলে ওঠে, রমেন বলছে যে, উনি আমাদের দেখলেই চটে যাবেন, তার চেয়ে...

তাকেও মাঝপথেই থামিয়ে দিয়ে আচার্য বলে ওঠেন, তুমি খাম মা লক্ষী। প্রশ্নটা আমি রমেনবাবুকেই করেছি। উনি কী হয়ে যাবেন? কী বললে তুমি...

রমেন ততক্ষণে সামলেছে। বসলে, আজ্ঞে চটে যাবার কথাই তো...

—না! তুমি কী একটা শব্দ উচ্চারণ করেছিলে যা 'ক' বাক্যের!

রমেন কিছুতেই মনে করতে পারল না, কথাটা কী?

তার বাকি চারজন সহপাঠীরও যতদূর স্মরণ হল ততদূর মনে হচ্ছে ও 'চটে যাবার' বা 'রেগে যাবার' কথাই বলেছে।

সুনীতিকুমার গভীর হয়ে গেলেন। বললেন, ঠিক আছে। তাহলে এস তোমরা। আমার দ্বারা কিছু হবে না!

দলের মুখপাত্র বললে, কেন স্যার?

—কারণ তোমাদের অন্তর্ভুক্তিগত সুনীতিকুমার 'খচে' গেছেন। যাও! বিদেয় হও এবার!

ওরা চলে যাবার পর আমার দিকে ফিরে বললেন, শুনলেন ? আমি ওদের জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম, এই প্রাকৃত শব্দটা কোথেকে এল ? তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থটা ওরা জানে কি না। ক্রিয়াপদ হিসাবে শব্দটার ব্যবহার অভিধানে নেই, প্রাকৃতজনের ভাষার ব্যবহারে আছে। তা ওদের সাহসই হল না, স্বীকার করতে যে, কথাটা মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে। 'খচে যাওয়া' শব্দটা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়, যদিচ ভদ্রসমাজে ব্যবহার না করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু মিথ্যাভাষণ যে তার চেয়ে অনেক বড় অপরাধ এটা ওরা জানে না। আজ-বাদে-কাল ওরাই এম. এ. পাস করে স্কুলে-কলেজে ছেলে ঠাণ্ডাতে শুরু করবে।

বেলা সাড়ে-বারোটো নাগাদ একজন এসে বললেন, অনেক বেলা হয়ে গেল যে...আপনার ঘ্রানের জল...

উনি আগন্তুককে বললেন, তোর কাঁচি ভাবছিলাম। ঐর জন্য একটু কফি—

ছাড়া যখন পেলাম বেলা তখন দুটো। আমার এই পণ্যশোষণ জীবনে দু-আড়াই হাজার রবিবারের সকালের মধ্যে ঐ দিনটির কথা আমি জীবনে ভুলব না। এ অভিজ্ঞতার কথা ইতিপূর্বেই আমার একটি উপন্যাসে ('আবার যদি ইচ্ছা কর') তির্যক-প্রতিফলিত হয়েছে—যে কথা সেখানে বলিনি তা হচ্ছে এই যে, কথাপ্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার তাঁর একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছিলেন। কথাটা উঠেছিল—ওঁর এই বয়সে একা-একা বিদেশ ভ্রমণের প্রসঙ্গে। বললেন, এমন কি বয়স হয়েছে আমার ? বুড়ো তো হয়ে যাইনি ?

তা বাটে ! সেই প্রসঙ্গেই 'শোনালেন বছর কয়েক আগে, উনিশশ' ষাটে, রাশিয়া ভ্রমণের একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা। মস্কোতে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন হচ্ছে—বিপ্লব-সংস্কৃতির উপর। ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে উনি গেছেন। ওঁর প্রবন্ধ ছিল 'ভারত ও চীন, প্রাচীনকালের আদান-প্রদান।' প্রবন্ধটি পরে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে সন্মিলিত হয়েছে। মস্কোতে দ্রষ্টব্য জিনিসের কি আর শেষ আছে ? স্বল্প সময়ে সে-সব দেখে নেবার অরকাশে উনি কর্মকর্তাদের কাছে কী একটা গ্রাম দেখতে চাইলেন। গ্রামের নামটা ভুলে গেছি, তাতে একাধিক 'শ' এবং 'স্ত' যুক্তাক্ষর ছিল।* ঐ গ্রামটির কথা আগেই শুনেছিলেন সুনীতিকুমার। গ্রামটি বিখ্যাত এক অদ্ভুত কারণে। সেই জনপদে প্রতি বর্গমাইলে প্রবীণতম ব্যক্তির সংখ্যা একটি বিপ্লব-রেকর্ড ! ছোট জনপদে কিন্তু ক্ষেত্রবর্ষ পাড়ি দিয়ে বহাল ভবিষ্যতে আছেন এমন মানুষ সেখানে অগুনতি। নেকাই দুর্ঘটনায় না মরলে সে গ্রামের রাম-শ্যাম-যদু হামেহাল আশী-নব্বই-একশ পাড়ি দিয়ে যায় ! সে যেন হিল্টনের কল্লনা-রাজ্য 'সাংগ্রি-লা'-র বাস্তব সংস্করণ।

সুনীতিকুমারের বাসনা হল—সে গ্রামটি স্বচক্ষে দেখবেন, সম্ভব হলে জেনে আসবেন—কোন মত্রে ওরা যমদূতদের এত দীর্ঘ দিন টেকিয়ে রাখতে পারছে। ওরা কী খায়, কতটুকু ব্যায়াম করে, কী ভাবে জীবনযাপন করে। ভারতীয় অতিথির মনোবাসনার

* প্রফ-নিরীক্ষক শ্রীমান সুব্রাস প্যাং গিনেস-বুক-অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস্‌ বইতে আমাকে জানিয়েছে সেটি Abkhasian Republic of Georgia-র সেখানে 2-১৪% বাসিন্দা নব্বই পাড়ি দেয়।

কথা জানতে পেরে কর্মকর্তারা একটা ব্যবস্থা করলেন। অচিরেই আঞ্চলিক রাজ্যের প্রতিভূ ঠেকে এনে দিলেন একটি নিমন্ত্রণ লিপি। সেই 'শু-সু' যুক্তাক্ষর-ভারাক্রান্ত জনপদের 'শেরিফ' ঠেকে গ্রাম দেখে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সম্মেলনে বক্তৃতার পাঠ চুকলে নির্দিষ্ট দিনে উনি গিয়ে হাজির হলেন সেই গ্রামে। ঘুরে ঘুরে দেখলেন। হেন বাড়ি নেই যেখানে দু-একটি অশীতিপর বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ঠেকে অভিনন্দন জানানলেন না—প্রতি পঞ্চম বাড়িতে একজন করে সেগুরি-ব্যাট। তাজ্জব কাণ্ড!

সুনীতিকুমার ঠুঁদের সঙ্গে কথা বললেন, ভাব জমালেন, কিন্তু প্রাচীন অ্যালকেমিস্টরা যাকে বলেছেন 'এলিক্সার-অফ-লাইফ'—সঞ্জীবনী-সুখ—তার সম্ভান পেলেন না। ওরা মাছ খায়, মাংস খায়, পানীর খায়, মদও খায়—সে তো আর পীচটা জাতের লোকও খায়। ওরা নাচে, গান গায়, হাসে, কাঁদেও। তাহলে?

সন্ধ্যার পর ভারতীয় অতিথিতিকে এক সায়মাশে আপ্যায়ন করলেন ঠুঁরা। শেরিফের বাড়িতেই। বাড়িটি দ্বিতল, কাঠের তৈরী। তারই একতলায় একটা প্রকাণ্ড হল—ঘরে পাতা হয়েছে টেবিল-চেয়ার। আহার পরিবেশনের পূর্বে পানীয় বিতরণ করা হল। সুনীতিকুমার লক্ষ্য করে দেখলেন নিমন্ত্রিতের সংখ্যা প্রায় জন-পঁচিশ। শেরিফ অর্থাৎ মোড়ল মশাই বললেন, আমরা একে একে নিজেদের নাম ও পরিচয় ঘোষণা করি। তাহলে অতিথি মশাই সকলের নাম জেনে যাবেন। আমার নাম আন্ড্রেই পাবলোভিচ। আমি এ গাঁয়ের মোড়ল।

সুনীতিকুমার তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আপনাদের যদি না আপত্তি থাকে, তাহলে নামের সঙ্গে বয়সটাও দয়া করে উল্লেখ করুন। ওঁটাতেই আমার সবচেয়ে কৌতূহল। আমি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতীয়, বয়স সত্তর।

মোড়ল-মশাই আবার উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, পাদপুরণার্থে—আমার বয়স বিরানব্বই!

একে একে বিশ-পঁচিশ জন—কী বলব? বৃদ্ধ-বৃদ্ধা? নাকি ঠুঁদের হিসাবে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া? উঠে দাঁড়ালেন। সত্তর বছর বয়সের ভারতীয় অতিথিটিকে অন্ধের হিসাবে দেখলেন তিনিই সভায় সর্বকনিষ্ঠ। শয়ের ওপারে জনা পাঁচেক। তার মধ্যে একজন সেগুরি করার পরেও বার দুই বাড়িভারি হাঁকিয়েছেন!

নানান প্রসঙ্গে আলোচনা হল। খানা ও পিনা চলেছে সম্মানে। অতিথিদের কারও ক্ষুধামান্দ্য, অজীর্ণ, ডায়াবেটিস বা রক্তচাপের আধিক্য আছে বলে মনে হচ্ছে না—মানে তাঁদের খানা-পিনার বহর দেখে! সন্ধ্যা থেকেই সুনীতিকুমার লক্ষ্য করছেন দ্বিতলে কী একটা গঙগোল হচ্ছে—কারা বোধহয় নাচ-গান ফেরা করছে। কাঠের মেঝে, ফলে দুমদাম ধুপধাপ লেগেই আছে। গৃহস্থমী সেই গঙগোলটা থামাবার কোন প্রচেষ্টা করছেন না। বোধহয় দ্বিতলে অন্য কোন ভাড়াহিয়ার আস। সাম্যবাদীদের দেশ, লোকটা বোধহয় শেরিফকেও তোয়াক্কা করে না। যদি হোক, আগন্তুকরা যখন ঐ দাপাদপিটা ধর্তব্যের মধ্যে আনছেন না তখন সুনীতিকুমারও সেটার কথা ভুলে থাকবার চেষ্টা করলেন।

আহারাদির পর খোঁশগল্প। যাকে বলে 'আফটার ডিনার টক' আর কি। নানান চুটকি

হাসির গল্প। শেষবেশ সুনীতিকুমার বললেন, আপনাদের গ্রামে এসে অত্যন্ত আনন্দ পেলাম; কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আসা সে উদ্দেশ্যটা আমার পূর্ণ হল না।

—উদ্দেশ্যটা কী ছিল?

—ভেবেছিলাম—জেনে যাব কী মস্ত্র আপনারা এমন দীর্ঘজীবী! ভারতবর্ষে ফিরে গিয়ে একটা যুগান্তর আনব ভেবেছিলাম।

হাসি-মশ্কারার মধ্যেই কথাটা শুরু হয়েছিল; কিন্তু ক্রমশ গুঁরা নানান বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে থাকেন। এই প্রশ্নটির জবাব খুঁজতে অনেক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক গুঁদের গ্রামে এসে রীতিমত গবেষণাও করেছেন—বুঝে নিতে চেয়েছেন, কোথায় গুঁদের সঙ্গে আর পাঁচটা গ্রামবাসীর প্রভেদ। দৈনিক গুঁরা কতটা পরিশ্রম করেন, কতক্ষণ ঘুমান, কত ‘ক্যালোরি’ খান—তার ভিতর কতটা শর্করা, কতটা রেহজাতীয়, প্রোটিন কিম্বা ভিটামিন। রাশিয়ান শারীরবিজ্ঞানীরা এখনও এবিষয়ে একমত হতে পারেননি। এক-এক জন এক-একটা হেতু প্রদর্শন করছেন। অথচ প্রায় সকলেই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন—আশপাশের আর পাঁচটা জনপদের জন্মহার-মৃত্যুহারের সঙ্গে গুঁদের এই দীর্ঘদিনের বিশাল ফারাকটা নিতান্ত কাকতালীয় ঘটনা বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

সুনীতিকুমার জানতে চান, কোন বৈজ্ঞানিক কী বলেছেন? শেরিফ তার জবাব দিলেন, কিন্তু শেরিফের অর্ধেক কথাই শোনা গেল না—দিতলের নৃত্য-গীত হঠাৎ একটা চরম পর্যায়ে উঠেছে সেই সময়।

যাই হোক, শেষে একজন অতি বৃদ্ধ বললেন, আমাদের পণ্ডিতেরা কে কী বলেছেন, তা তো শুনলাম—এবার আমরা শুনতে চাই ভারতীয় পণ্ডিতটি এবিষয়ে কী বলেন। কমরেড চ্যাটার্জির মতে মানুষের দীর্ঘজীবন-লাভের মূল সূত্রটি কী, তা আমরা জানতে ইচ্ছুক।

অনেকেই সায় দিলেন। প্রাচ্য-পণ্ডিতের মতামত তাঁরা শুনতে চান।

সুনীতিকুমার আর কী করেন? বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া স্বত্ত্বেও গুঁরা যখন ধরে পড়েছেন তখন তাঁর নিজস্ব মতামতটা এবার জানাতে হয়। সুনীতিকুমার ভেবেচিন্তে বললেন, আমার বিশ্বাস দীর্ঘজীবন লাভের মূল সূত্র হচ্ছে পরিমিত জ্ঞান। যে-মানুষ সারাজীবনে কোন কিছুতেই বাড়াবাড়ি করেনি, সময়ে খেয়েছে, সময়ে ঘুমিয়েছে, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান করেনি, উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেনি অথচ জীবনকে পরিমিত জ্ঞানের ভিতর দিয়ে ভোগ করেছে, সেই দীর্ঘদিন বাঁচে।

সাদা-চুলে-ভরা অথবা ইন্দ্রলুপ্ত-শোভিত বিশ-পাঁচশটা মাত্রা দুলে দুলে সায় দিল। পাবলোভিচ সভাস্থ সকলের হয়ে বললেন, এ-তথ্যটি যেন আমরা ভুলে না যাই। উচ্ছৃঙ্খলতাই অকালমৃত্যুর অগ্রদূত।

সভা ভাঙল। রাত তখন বারোটা। একে-একে সবাই বিদায় নিলেন। সুনীতিকুমারকে শুবরাত্রি জানিয়ে আন্দ্রেই পাবলোভিচ যখন তাঁকে গাড়িতে তুলে দিতে এলেন তখন আর কৌতূহলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না আচার্য সুনীতিকুমার। বললেন, আপনার বাড়ির দ্বিতলে কারা ভাড়া আছেন?

গৃহস্থামী বললেন, আজ্ঞে না, ভাড়াটে কেউ তো নেই—গোটা বাড়িটাতাই আমি থাকি।

—ও ! না, আমার মনে হল দোতলাতেও একটা নাচগানের আসর বসেছে। ভেবেছিলাম অন্য কারও অ্যাপার্টমেন্টে কোনও পার্টি হচ্ছে বুঝি।

বিরানবাই বছরের তরুণ গৃহস্থামী সলজ্জে বললেন, ও কিছু নয়...ইয়ে হয়েছে...দোতলার ঐ ঘরটায় থাকেন আমার বাবা। মা মারা যাবার পর থেকে কেমন যেন মনমরা হয়ে গেছেন। তাই ভুলে থাকার জন্য রোজই সন্ধ্যার পর একটু-আধটু মদ্যপান করে থাকেন। বাবার সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবীও আসেন—ঐ একটু নাচগান ফুটি-ফার্তা করে ভুলে থাকা আর কি। অনেকদিনের অভ্যাস—আপনার অসুবিধা হচ্ছে জেনেও বাধা দিইনি ! কিছু মনে করবেন না, কমরেড চ্যার্জি !

মনে করবেন না। সুনীতিকুমার লজ্জায় প্রতিবাদটা পর্যন্ত করতে পারেননি। ‘আমি সেই সুনীতিকুমারই বট’—শুনে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, ওঁরও তখন সেই হালৎ !



ওঁর বারে বারে মনে পড়ে যাচ্ছিল—উনি যখন বলছিলেন, ‘উচ্ছ্বলতাই অকালমৃত্যুর অগ্রদূত’, আর ঘরসুদ্ধ বৃদ্ধ-ভরুণ ঘাড় নেড়ে সায় দিচ্ছিলেন তখন সওয়াশ’ বছরের এক তরুণ-তুর্কী ভড়কা-তরলিত কসাক-নৃত্য-ছন্দে ঐ বাড়িরই দ্বিতলের মেঝেতে ক্রমাগত সে-কথার ঠকাঠক প্রতিবাদ করে যাচ্ছিলেন !

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার ! অজ্ঞাত অপরিচিত একটি লেখকের বই পড়ে যদি ভালো লাগে তিনি অমূল্য সময় নষ্ট করে তার প্রুফ-রীডিং করতে বসে যান ; তার পাবলিশারের সঙ্গে যোগাযোগ করে তার

টেলিফোন নাম্বার সংগ্রহ করেন। তাকে ঘরে ডেকে সমঝিয়ে দেন—দেশটি দুর্দশক আগে স্বাধীন হয়েছে !

দীর্ঘ কর্মময় জীবন। 26.11.1890 তারিখে রাসপূর্ণিমায় তাঁর আবির্ভাব। গুরু নানকের জন্মদিনে। সেদিন নাকি চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল, যেমন হয়েছিল শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের মুহূর্তে। নিতান্ত মধ্যবিস্তৃত ঘরের ছেলে। অসাধারণ মেধা। বি. এ.-তে প্রথম এবং এম. এ.-তেও উপর্যুপরি দুবার প্রথম শ্রেণীতে প্রথম। তারপর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বস্তিলাভ। উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত-যাত্রা। 1921-এ গোল্ডেন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট.।

পরের বছর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। স্বর্ণিকার স্যার আশুতোষ ওঁকে নিয়োগ করলেন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের ‘বয়রী’ অধ্যাপকরূপে। অধ্যাপক অধ্যয়ন করবেন না, এ কেমন কথা ? প্রফেসর তারাপোরওয়ালার কাছে পড়তে শুরু করলেন ‘আবেস্তা’। একই সঙ্গে

বঙ্গভাষার আদিম উৎস সম্বন্ধে অভিযাত্রাও রইল অব্যাহত। অন্যতরিলক্ষে সেই মননের ফলশ্রুতিরূপে দেখা দিল দুই খণ্ডে প্রকাশিত তেরশ' পৃষ্ঠার মহাগ্রন্থ : বঙ্গভাষার 'টেন কমন্ডমেন্টস্' The Origin and Development of Bengali Language—মনীষীমহলে যার সংক্ষিপ্ত অভিধা : ও. ডি. বি. এল.। তারপর নিরবচ্ছিন্ন ধারায় মুদ্রায়ন্ত্র থেকে জনপ্রপাতের মতো বারে পড়তে থাকে : বেঙ্গলি সেন্ফ-ট্ট, এ বেঙ্গলি ফোনেটিক রীভার, ইন্দো-এরিয়ান অ্যান্ড হিন্দি কিরাৎজনকৃতি, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি।

1927-এ রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হিসাবে পূর্ব-এশিয়ায় ভ্রমণ—জাভা, সুমাত্রা, বালি, শ্যাম, কাবোজ, ওঙ্কারখম। সে তথ্য শাস্ত হয়ে রইল 'দ্বীপময় ভারতে'—এ।

কিন্তু সুনীতিকুমারের কর্মচঞ্চল সুদীর্ঘ জীবনের বহুমুখী বিকাশের মূল্যায়নে আমি আজ কলম নিয়ে বসিনি। আমার লক্ষ্য : গোপ্পদে প্রতিবিস্তিত পুষ্প !

তাই বলি, সেই দুর্লভ সাক্ষাৎকারের পর যদিও আর কোনদিন সাহস করে তাঁর ভদ্রাসনে যাইনি, তবু এর পর থেকে আমার প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটি করে কপি তাঁকে পাঠাতাম। কোনও দিন প্রাপ্তিস্বীকার করেননি, বা টেলিফোন করেননি। ক্রমশঃ বুঝতে পারলাম, 'অপরূপা অজন্তর' লেখককে উনি স্বাভাবিকভাবেই তুলে গেছেন। কোনও পত্রপত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হয় না। দীর্ঘ দিনের ফারাকে আমার গ্রন্থগুলি পেলেও তিনি নিশ্চয়ই এতদিনে আমার নামটা স্ট্রেফ ভুলে গেছেন।

তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎটাও নিতান্ত নাটকীয়।

ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে গিয়েছিলাম 'আর্চিম বোম'র বিষয়ে খোঁজ-স্ববর নিতে। তখন আমি 'বিশ্বাসঘাতক' লিখছি। সেটা 1974 সাল। সন্ধ্যা নাগাদ রীডিং রুম থেকে বেরিয়ে বাস ধরব বলে চলেছি, হঠাৎ নজর হল সুনীতিকুমার তাঁর নির্দিষ্ট বাড়িটির বাগানে গোলাপগাছের চর্চা করছেন। ওঁর হাতে একটা খুরপি। পিছনে জলের ঝারি হাতে একজন বেয়ারা। আমার দিকে উনি চকিতে চোখ তুলে একবার তাকালেন। উনি নিশ্চয় আমাকে চিনতে পারেননি, আমি রিফ্লেক্স-আকশনে হাত দুটি জোড় করে ওঁকে নমস্কার করলাম। ওঁর হাত জোড়া—খুরপিটা উঁচু করলেন, অর্থাৎ প্রত্যভিবাদন সেরে গোলাপচারায় পুনরায় মনঃসংযোগ করলেন। আরও চার-পাঁচ কদম হেঁটেছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম উনি পিছন থেকে আমার নাম ধরে ডাকছেন। চমকে পিছন ফিরি। এগিয়ে আসি বেঁড়ার কাছে। উনি ফুলবাগিচায়, আমি পথের মাঝখানে : গোপ্পদ ও সুদীর্ঘ মাঝামাঝি যথারীতি অনড় প্রাচীর।

উনি সরাসরি প্রশ্ন করলেন, গজমুক্তা বইটা আপনার দেখা, তাই নয় ?

সবিনয়ে অপরাধ স্বীকার করি।

বললেন, তাতে আপনি বলেছেন, এলিফাস ম্যাগিমাশ (ভারতীয় হাতি) এবং লঙ্গডটা (আফ্রিকার হাতি) ক্রসব্রীডে বাচ্চা হয় না। তাই না ? এবারও স্বীকার করতে হল।

অতঃপর ওঁর প্রশ্ন—Camelus bactrianus এবং Camelus dromedarius-এর ক্রসব্রীডে কি বাচ্চা হয় ?

উত্তর দূর-অন্ত প্রশ্নটাই আমার মগজে ঢুকল না। আমার যে 'এক-বাঁও' মেলেনি

তা উনি বুঝতে পারলেন। তাই প্রশ্নটা আরও মোলায়েম করে বললেন, 'গজমুক্তা' পড়তে পড়তে এ প্রশ্নটা আমার মনে জেগেছিল। মঙ্গোলিয়ার দুই কুঁজ বিশিষ্ট উট এবং আরবীয় এক কুঁজওয়ালা উটের গিলনে কি বাচ্চা হয়? দুটোই তো Camelus গণের? তা হলে বাচ্চার কুঁজ কটা হবে?

আমি হাত দুটি কচলে বলি, স্যার সিবিল এঞ্জিনিয়ার, জীববিজ্ঞানের এসব প্রশ্ন—
—তাহলে হাতির কথা কেমন করে লিখলেন?

—বই পড়ে স্যার। হাতির উপর বই লিখব বলে শুধু হাতির উপরেই—

কথাটা আমার শেষ হল না। এবার উনিই ইংরেজি বর্ণমালার পঞ্চদশ বর্ণটি আমাকে শুনিয়ে দিলেন, ও! বুঝছি। হাতির খবরই আপনি জানান। উটের নয়। তৎক্ষণাৎ ফিরে গেলেন গোলাপচারার কাছে।

আমি আরও মিনিটখানেক নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকি। দেখে মনে হল না—এ গোলাপচারার সেবায় নিমগ্ন মালিটি 'উট-রোগে' ভুগছেন।

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার! অনুপপত্তি নিরাকরণ-মানসে তিনি অন্যায়সে প্রতিবন্ধিত হতে প্রস্তুত গোম্পদেও! জিজ্ঞাসু সুনীতিকুমারের নেই কোনও জ্ঞানের অভিমান। আর যে মুহূর্তে বুঝলেন, তাঁর সমস্যার সমাধান সেই ক্ষুদ্র জীবের দ্বারা সম্ভবপর নয়, তৎক্ষণাৎ তাকে ছেঁড়া-কাগজের ঝড়িতে ফেলে দিলেন।

তাঁর সঙ্গে আমার তৃতীয় সাক্ষাৎ তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে যাওয়ায়। আমার কন্য়ার বিবাহে তিনি নিমন্ত্রণ রাখতে এসেছিলেন।

পাঁচাত্তর সালের ফেব্রুয়ারী মাসের কথা। বড় মেয়ের বিয়েতে আচার্য সুনীতিকুমার এসেছিলেন আমার বাড়িতে পদধূলি দিতে। সেই গল্পই বলব এখন।

বর আসার কথা গোখুলি-লাগে, মানে সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ। প্রথম ব্যাচ নিমন্ত্রিত খেতে বসবে আশাজ সাতটায়। সেই মর্মেই আমরা তৈরী হচ্ছি। আমি সপ্ৰদান করব, উপোস করে আছি। এমনিতেই আমার লো-ব্রাডপ্রেসার। বয়স, আগেই বলেছি, পঞ্চাশোর্ধ্বে। হঠাৎ কে এসে বলল, নিচে একটি গাড়ি এসেছে। তাতে আচার্য সুনীতিকুমার এসেছেন। বেলা তখন পাঁচটা।

আমি থাকি তিনতলায়। তাড়াতাড়ি চটিটা পরে নিচে যাবার উপক্রম করি। আবার কে এসে খবর দিল নামতে হবে না—উনি নিজেই উপরে উঠে আসছেন। তাই এলেন উনি। হাতে মোটা লাঠি, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। কৌন ল্যাক্সি—এ না থেমে গটগট করে একেবারে উঠে এলেন ব্রিতলে। আমাকে দেখতে পেরেই বললেন, সন্ধ্যা সাতটায় একটা 'বক্তিরে' আছে। অথচ একবার 'টু' মেয়ে না খেলেও চলে না। কই, মেয়ে কোথায়?

ওঁর হাতের খানদুই বই, ফিতে দিয়ে বাঁধা। ওঁরই লেখা গ্রন্থ। আশীর্বাদ করবেন বই দিয়ে। আমি ওঁকে বসিয়ে ডিতরে বসে দিতে গেলাম। কিন্তু অদূর মহলে এসে বুঝতে পারি কাজটা অত সহজ নয়। বুলবুলের বাদবীর দল— স্বাভী, শান্তা, রাখীরা বসেছে গলে সাজাতে। কনের ছোট ভাই রাধা নাকি তুলির কাজে সুনাম অর্জন করেছে—যাকে

বলে 'বর্ণিকাভঙ্গ' আর কি। তুলি-চন্দন নিয়ে সে অপেক্ষা করছে। খোঁপা বাঁধা শেষ হলে তার কাজ শুরু হবে। আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, বুলবুল, একবার বাইরের ঘরে আসতে হবে। প্রণাম করতে।

হাঁ-হাঁ করে উঠল সবাই। এ কী অনাস্থি কথা! আধ-সাজা কনে কখনও ঘর ছেড়ে বের হয় নাকি? আমি আমতা আমতা করি, মানে সুনীতিকুমার এসেছেন, বেশীক্ষণ বসবেন না; তাহলে ওঁকেই এঘরে নিয়ে আসি?

তাতেও আপত্তি ওদের! সাজ শেষ না হলে সে কেমন করে বাইরের লোকের সামনে দাঁড়াবে? বুলবুলের বান্ধবীরা বললে, তা হয় না। বৌদি বললেন, বাহাত্তর তো তোমার হয়নি ঠাকুরপো, এর মধ্যেই ভীমরাতে ধরেছে!

অগত্যা আবার ফিরে এলাম বাইরের ঘরে।

ভাগ্য ভাল। এসে দেখি আমার দাদা, ভায়রাভাই ইত্যাদি সবাই সুনীতিকুমারকে ঘিরে জমিয়ে বসেছেন। উনিও দিবি জাঁকিয়ে গল্প ফেঁদেছেন। দাদা ওঁকে বললেন, রান্না এখনও সব হয়নি, যা হয়েছে সামান্য কিছু নিয়ে আসি?

—আসুন। অল্প অল্প করে চেখে দেখি!

দাদা আমাকে চোখের ইঙ্গিত করলেন।

ভোজের রান্নার হাদামা আমি নিজের স্বন্ধে রাখিনি। সাতাশ বছর 'ব্যাভো সাহেবের' কাছে ট্রেনিং পেয়েছি—বাজার করতে জানি না। তাই ও দায়িত্বটা দিয়েছিলাম একটি ক্যাটারিং এজেন্সিকে। দক্ষিণ কলকাতার সবচেয়ে নাম করা ক্যাটারার—'বিজলী গ্রীল'কে। তাঁরই রান্নাবান্নার ব্যবস্থা করেছেন ছাদে। সেখানেই প্যাভেল। লোকজন খাবেও সেখানে। সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গেলাম। বিজলী গ্রীল-এর ম্যানেজার ভদ্রলোক অতি অমায়িক। দুপুর থেকেই রান্নার তদারকি করছেন। তাঁকে বলা ছিল প্রথম ব্যাচ খেতে বসবে সন্ধ্যা সাতটায়। আমাকে উঠে আসতে দেখে ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, বলুন স্যার?

—দেখুন, আমার একজন অতি বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক এসে পড়েছেন। আপনার কী কী রান্না হয়েছে বলুন তো? একটা প্লেটে সাজিয়ে দিন আমি নিয়ে যাই।

উনি বললেন, পূঁপড় ভাজা ছাড়া সবই তৈরী হয়েছে। আপনি নিয়ে যান। আমি প্লেট সাজিয়ে নিয়ে যাবি।

আমি বলি, না না, এসব ছাঁচড়া-ঢ্যাচড়া ওসব কিছু নব্বার দরকার নেই। মেন আইটেম কয়েকটি—

—তবে স্যার খানকয় রাধাবল্লভী, মাংস আর ফিশ ওলী নিয়ে যাই?

—ফিশ-এর কী?

—আজ্ঞে 'ফিশ ওলী'!

সেটা কী বস্তু জানা ছিল না। মেনুটা পির হয়েছে আমার অজান্তে। 'ফিশ ওলী' নিশ্চয় কোন আধুনিক সুখাদ্য হবে। অজান্তে প্রকাশ হয়ে যাবার ভয়ে আমি হেসে বলি, ও! ফিশ ওলী। তাই বলুন!

একটু পরে একটি খালায় আহার্য সাজিয়ে ভদ্রলোক নিচে নেমে এলেন। মেজদি নিরামিষ হৈসেল থেকে পৃথক পাত্রে দুই-মিষ্টি নিয়ে এলেন।

সুনীতিকুমার বললেন, এত কে খাবে ?

তারপর যেমন হয়ে থাকে। এ পক্ষের পীড়াপীড়ি আর ও পক্ষের ব্যাপ্ত সম্পন্ন।

বিজলী গিল-এর সুট-পরা ম্যানেজার ভদ্রলোক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। কখন কী লাগবে, জলের গ্লাসটা খালি হল কিনা। ঐ মণ্ডকায় আমি আর একবার অন্দরমহলটা পাক মেয়ে এলাম। কনের 'কনে-চন্দন' পরানো শুরু হয়েছে। আহ্বারপূর্ব শিটিকে মিটতেই সজ্জাপর্ব সারা হয়ে যাবে আশা হচ্ছে। এদিকে বরের গাড়িও যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারে ; আবার ওদিকে যে কোন মুহূর্তে বোঁপে বৃষ্টি নামতে পারে। আকাশ আছে মুখ কালো করে সেই ফেব্রুয়ারীর পনের তারিখে।

হঠাৎ সুনীতিকুমার একটি ভোজ্যদ্রব্যের দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বললেন, ওটি কী ?

দাদা, মেজদা দুজনেই মুখে চাওয়া-চাওয়ি করেন। আমি সদ্যলব্ধ জ্ঞানটা বিতরণের এমন সুযোগ হেলায় হারাতে রাজী নই। বললুম, ওটা ইয়ে স্যার,...ফিশ ওলী।

—ফিশ-এর কী ?

—আজ্ঞে ফিশ ওলী !...মানে ও'লী ! ফিশ-এর 'ওলী' আর কী !

সুনীতিকুমারের চর্চণকার্য বন্ধ হল। সোজা হয়ে বসলেন তিনি। বললেন, 'ফিশ-এর ওলী' মানে কী ? কোন দেশী খাবার ?

আমার বিদ্যে ফুরিয়েছে। বিজলী গিলের ম্যানেজারের দিকে করুণনেত্র আমাকে তাকাতে হল। সে ভদ্রলোক বললেন, ভেটকি মাছের-ফিশ ওলী স্যার। ইয়ে...মানে, ফিশ ও'লী !

—বানান কী ?

ম্যানেজার ভদ্রলোক গলার টাইটা একটু আলাগা করে দিয়ে বললেন, 'ও' আর 'ল'য়ে দীর্ঘর্ষ'।

সুনীতিকুমার গম্ভীর হয়ে বললেন, সেটা তো সাঁত্রাগাছীর ওল 'স্ট্রীয়াম ইপ্'। আমি রোমান হরফে বানানটা জানতে চাইছি।

ম্যানেজার এবার নিজেই অজ্ঞতা স্বীকার করে বললেন, ঠিক জানি না। বোধহয়, OLEE। শুনেছি জার্মান,...না জার্মান নয় ; ফ্রেঞ্চ ডিশ।

সুনীতিকুমার হাত গুটিয়েছেন। বলেন, উঁহু। জার্মান ভাষায় ভাজকে বলে gebacken অথবা gebraten ; ফরাসী ভাষায় ভাজা মাছ হচ্ছে les poissons। 'ওলী' তো জার্মান-ফরাসী খাদ্য তালিকায় নেই। 'ওলী' শব্দটা কোথা থেকে এল ?

মাথায় উঠল খাওয়া। উনি আরও ভেঙে বললেন, স্প্যানিশ ভাষায় যতদূর মনে পড়ছে মাছ ভাজা হচ্ছে frito pescado। ইতালিয়ান ভাষায় fritte pesce। Olee কোথা থেকে এল ?

আমার মেজদা নিরুপায় হয়ে বললেন, আজ্ঞে আপাতত এল রান্নাঘর থেকে। শ্রেফ 'মাছ-ভাজা' বলেই ধরে নিন না। ব্যুৎপত্তিগত না হক, উৎপত্তিগত হৃদিসটা তো পেলেন।

সুনীতিকুমার ঔর সরল রসিকতায় খুশি হলেন। জবাবে বললেন, তাই বলুন ! মাছ ভাজা ! ওলী নয় ! তাহলে ওপিঠা খাওয়া যেতে পারে। ওলীর এ-পিঠ ও-পিঠ কিছুই চিনি না, কিন্তু ভাজামাছ উন্টে খেতে জানি।

একটু পরেই বুলবুলি এসে প্রণাম করল ঔকে। আশীর্বাদ করলেন উনি। মনে মনে। জোরে জোরে বললেও বুঝতুম না অবশ্য। হিব্রু-গ্রীক-লাতিন কী ভাষায় বলতেন কে জানে ?

উনি রওনা হওয়ার পর 'বিজলী গিল'-এর ম্যানেজার ভদ্রলোক এসে আমাকে প্রশ্ন করেন, উনি কে স্যার ?

বললুম, আমাদের জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার। ভাষাবিদ।

ম্যানেজার বললেন, আর ক'জন এমন ভাষাবিদ আপনার নিমন্ত্রিত আছেন স্যার ? বললুম, না, আর কেউ নেই। আপনি এরপর নির্ভয়ে 'ফিশ ওলী' চালাতে পারেন।

ভদ্রলোক রসিক। বললেন, আজে না, আর ভয়ের কি আছে ? এখন তো জানাই হয়ে গেছে—উৎপত্তিগত হৃদিস : রান্নাঘর ! আর ব্যুৎপত্তিগত : 'সাঁত্রাগাছীর ওল স্ত্রীমাম ঝপ !'

আচার্য সুনীতিকুমারের ভবিষ্যৎ-বাণীটি কিন্তু সফল হয়েছে। পরবর্তী সংস্করণে দোষ-ত্রুটিগুলি সংশোধন করতে পেরেছিলাম ঔরই আশীর্বাদে। পরিবর্তন এতটা করতে হল যে, 'অপরূপা অজন্তা' হয়ে গেল 'অজন্তা অপরূপা' ! ঐ 'অপরূপা অজন্তার' মাধ্যমেই আমি পেয়েছি আমার সাহিত্যজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার। সত্যে রাখা আছে আমার আলমারিতে—আজে না, কোন তাম্রফলক নয় ; আমারই লেখা বইয়ের প্রথম সংস্করণের একটি কপি, যার মার্জিনে অসংখ্য মন্তব্য। জাতীয় অধ্যাপক তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করে যে কপিতে অযাচিত গ্রুফ-রীডিং করেছেন।

আর—হ্যাঁ, কয়েকটি ছোট্ট কিন্তু খোশ-মেজাজী দিলতোড় ইন্টারজেকশান ! তাঁর আশীর্বাদ !

নিবৃত্তসাহ বোধ করলেই আমি সেই কপিটা উন্টে-পাল্টে দেখি।

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার ! ভাষাবিদ হওয়া সত্ত্বেও তিনি ভোজনরসিক। হৃদয়নতপন্থী হওয়া সত্ত্বেও নিজের স্বীকৃতি-মতে 'ভাজামাছ উন্টে খেতে' জানেন।

ক্রমে সাহস বাড়ল। পরিচয় ঘনীভূত হল। রেহছায়ায় আস্রিয় পেলাম। অর্ধশতাব্দীকাল সাংস্কৃতিক সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান সম্মানে আসমুদ্রহিমাচলের পণ্ডিতাগ্রগণ্যের দল বারে বারে ছুটে এসেছেন যে 'সুধমার্গি' রেখানে হংসমধ্যে বকের মতো আমিও হাজিরা দিয়েছি। তবে বড় দেরি হয়ে গেছে। এতদিন কেন এ সুযোগ নিহনি ? কেন সাহস পাইনি ? ঔর মহাপ্রয়াণের স্বপ্নের দুই আগে একদিন দূরন্ত কৌতূহল হল জানতে—জ্ঞানমার্গের চরম সীমান্তে উপনীত ঐ জ্ঞাননির্ভূতকন্ময় কি জেনেছেন সেই পরম সত্যকে ? যে ধনে ধনী হলে মণিকে মণি মনে হয় না ? প্রশ্নমাত্র আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন নোটের খাতটা। নির্দিষ্টায় লিখে নিলেন ছয়-ছয়টি ভাষায় অকপট

nâham veda / ouk oida
 আমি জানি না / Je ne sais pas
 a-mānānam / I don't know

Sunil Kumar Chatterjee
 সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
 সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

স্বীকারোক্তি।

এই হচ্ছেন সুনীতিকুমার।

সত্যাত্মী। ভড়ং নেই কোন। স্পষ্টভাবে শুধু বললেন, "আমি শুধু জানি যে, আমি জানি না।"

কিন্তু আমরা যে জানি না যে, আমরা জানি না। তাই তো বারে বারে ছুটে গিয়েছি তাঁর কাছে। সে কথা নয়, আমি শুধু ভাবছি—এ স্বাতন্ত্র্য যদি আর একবার তাঁর সামনে মেলে ধরার সুযোগ পাই, তাহলে আজ তিনি কী লিখে দিতেন? সত্যাত্মী দ্রষ্টা কি এবার, আজকের দিনে, বৈতরণীর ওপারে দাঁড়িয়ে একই ভঙ্গিতে আমার স্বাতন্ত্র্যকে কেড়ে নিয়ে লিখে দিতেন : বেদাহমেতম্।।

ইন্দো-ইসলামী স্বাধত্য

কাকে বলি ? সহজ উত্তর : ভারতবর্ষে সহস্রাব্দিকাল ধরে যে বৌদ্ধ-জৈন-ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের স্থাপত্য-শৈলী বিবর্তিত হচ্ছিল মুসলমানদের আগমনে তা অতি দ্রুত কয়েকটি বৈপ্লবিক পরিবর্তনে নবরূপ পরিগ্রহ করে। স্থানীয় স্থাপত্য ঐতিহ্যে নবাগতদের চিন্তাভাবনা সংযুক্ত হয়ে এই যে নব-রূপায়ণ, তাকেই বলি ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য। সে যেন অর্ধনারীশ্বর মূর্তি।

ইতিপূর্বে এদেশে ছিল স্তূপ-তোরণ-স্তম্ভ সমন্বিত দেবতাদের উপাসনাগৃহ, মন্দির, কিছু বিহার, প্রাসাদ বা দুর্গ। সাধারণ, এমনকি অর্থবানদের গৃহও এমন মালমশলায় নির্মিত হত যে, তার অস্তিত্ব আজ খুঁজে পাওয়া ভার। হিন্দু-ভারত ইহলোকে স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাবার কোনো চেষ্টাই করেনি। মরদেহ ভস্মীভূত হয়ে যাবার পর স্মৃতিসৌধ গড়ে তোলার কথা তাঁদের করন্যাতেই আসত না। মৌর্যসম্রাটদের আমল থেকে গুপ্তযুগে অতিক্রম করে পৃথ্বীরাজ চৌহান-তক্ কোনো হিন্দু রাজা নির্মাণ করাননি নিজের, প্রিয়জনের বা প্রিয়তমার জন্য কোনো পায়ণ স্মৃতিসৌধ। রাজপুত পুরললনার দল গড়েননি পিতার স্মৃতিতে কোনো ইতমৎ-উদ্দৌলা, অথবা বিগত স্বামীর স্মরণে কোনো হুমাযুন-কা-মক্‌বারা। মন্দির ভাঁরা গড়েছেন-অপূর্ব, অদ্ভুত, বিস্ময়কর স্থাপত্যকীর্তি—কিছু তার নামের সঙ্গে নিজ নামটুকু পর্যন্ত যোগ করেননি। আহিঙল, বাদামী, ভুবনেশ্বর, স্বাজুরাহোর অযুত মন্দিরের নাম শুনে বোঝা যাবে না কোন মন্দিরটি কোন নৃপতির অর্থানুকূলে নির্মিত। বৌদ্ধরা গড়েছেন চৈত্য-বিহার-সংঘারাম; শঙ্করাচার্য স্থাপন করেছেন মঠ—সবই নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায়, সমস্তই জগৎ হিতায়। এমনকি নূতন গ্রন্থ রচনা করে, দর্শনের নূতন সূত্র আবিষ্কার করে তা মুনি-ঋষিদের নামে চালাতে চেয়েছেন স্বনামে নয়।

এই মানসিক পরিমন্ডলে আবির্ভূত হল আগন্তুকদের ঐক্যতাত্ত্বিক চিন্তাধারা, যার বিকাশ দেখা দিল ত্রিষারায়। তব্বের পঞ্চ-‘ম’-কারের মতো এখানেও তিনটি ‘ম’-কার। প্রথমত মসজিদ, দ্বিতীয়ত মক্‌বারা, এবং তৃতীয়ত মোকাম। রাজসিক প্রয়োজনে নানান জাতির ইমারৎ, কিল্লা, মিনার, দরওয়াজা।

হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন উপাসনাগৃহ ছিল একান্তভাবে আত্মকেন্দ্রিক। তার গর্ভগৃহ অঙ্ককারাচ্ছন্ন, রহস্যঘন—প্রকৃত অধিকারীর জন্য ‘অন্তরাল’-এর অপরিসর আয়োজন।

আপামর ভক্তসাধারণ সমবেত হয় মূল মন্দির-সংলগ্ন জগমোহনে বা মণ্ডপে। ইসলামে ধর্মচারণ ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, গণ-মানসের। তাই মসজিদ পরিকল্পনার ছন্দটা অন্য জাতের। তা তিনদিক থেকে দেখার। যেহেতু নমাজ পড়তে হবে মক্কার দিকে মুখ ফিরে, তাই ভারতবর্ষে মসজিদ আবশ্যিকভাবে পূর্বমুখী। পশ্চিমদিকের প্রাচীরে তাই কুলুঙ্গির মতো একটি অঙ্গ : মিহরাব। তার পাশেই ইমামের আসন : মিহর। মিহরাবের গায়ে মক্কার দিক-নির্দেশক চিহ্ন : কিব্লা। পশ্চিমদিকস্থ মূল উপাসনাগৃহ বা 'ইবান'-এর সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, যার ফার্সী প্রতিশব্দ 'শেহান', এবং যা-থেকে আমাদের বাঙলায় 'শানের মেঝে' কথাটা এসেছে। প্রাঙ্গণের বাকি তিনদিকে অতিথিশালা—সুস্তশোভিত অলিন্দ বা 'লিয়ান'। শেহানের কেন্দ্রস্থলে অজুর জলাধার। উত্তরে এবং দক্ষিণে দ্বার থাকতে পারে, আবার নাও থাকতে পারে, থাকলে একটি হবে অপরটির দর্পণ-প্রতিবিম্ব বা 'জবাব'। মসজিদের আবশ্যিক অঙ্গ হিসাবে থাকে আজান দেওয়ার উপযুক্ত বিচ্ছিন্ন মিনার, যা মসজিদ-সংলগ্ন হলে বলি মিনারিকা বা মিনারেট।

ইসলামী স্থাপত্যের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য : মক্কারা বা সমাধিসৌধ। এক্ষেত্রে স্থপতিবিদের প্ল্যানিং-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি। মক্কারা কোন দিকে মুখ করবে, বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, অষ্টভুজ, কী আকারের হবে তা হির করবেন পরিকল্পনাকার। তাতে গম্বুজ, মিনারিকা, গুলদস্তা, ছতী থাকবে কি থাকবে না তার কোনো শাস্ত্রসম্মত বিধিনিষেধ নেই। নির্দেশ শুধু ঐটুকুই—মৃতদেহ থাকবে মাটির গভীরে, পশ্চিম দিকে পাশ ফিরে। তাকে বলি 'কবর'। গ্রিহের আনুভূমিকে, অথবা আরও উঁচুতে বানাতে হবে তার হুবহু অনুরণণ- 'সেনৌখ' (যা থেকে বাংলায় 'সিন্দুক' শব্দটা এসেছে)। তার বাঙলা প্রতিশব্দ নেই, ইংরাজী একটি শব্দ—'সেনোটাক'— প্রায় সমার্থক।

তৃতীয়ত, রাজসিক প্রয়োজনে ইসলামের আবির্ভাবের পর নির্মিত হল নূতন জাতের 'সেকুলার' ইমারৎ—প্রাসাদ, কিব্লা, দরওয়াজা (তোরণ), সরাই (পাছশালা), মায়খানা (আসবাগার), মিনার, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাশ, হামাম (স্নানাগার), খোয়াব-গাহ (শয়নকক্ষ), রঙমহল, পিলখানা, আস্তাবল প্রভৃতি।

ইস্লাম-ইসলামী স্থাপত্যে কালের ব্যক্তি হিসাবে ঐটুকু সংক্ষেপে বল্য যা় : কুতুবউদ্দীন আইবকের তথাকথিত 'দাসবংশ' প্রতিষ্ঠা থেকে তথাকথিত সৈয়দীবিদ্রোহ-তক্ প্রায় সাড়ে ছয়শ বৎসর এই শৈলীর জীবনকাল। তা-ও মৌচুমুটি দুই সমানভাগে ভাগ করা যায়—সুলতানী-জমানা এবং মুগল-এ-আজম।

ভৌগোলিক চৌহদ্দী এই বৃহত্তর ভারতবর্ষ। ইসলামী স্থাপত্যের মৌল-বিকাশ রাজধানীকে ঘিরে—দিল্লী-আগ্রা-সিকান্দা ও ফতেপুর সিক্রির সীমিত ভূখণ্ডে, যদিও বিভিন্ন আঞ্চলিক স্থাপত্য নিজস্ব গৌরবোন্মুক্ত হয়ে রূপায়িত হয়েছে—পঞ্জাব, বঙ্গদেশ, গুজরাট, জৌনপুর, মালোয়া, গুলবার্গ, বিজাপুর, বিদর, গোলকুন্ডা, বান্দেখ, কাশ্মীর ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রাক-মুসলীম ভারতবর্ষ স্থাপত্যে সাফল্যের তুদনীর্থে উপনীত হয়েছিল এ কথাও

যেমন সত্য তেমনি অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একাদশ শতাব্দীতে উপনীত হয়ে সে শৈলী স্থাবর অথবা অবক্ষয়ের ক্রমাবনতির পথে যাত্রা করেছিল। কী প্ল্যানিং, কী প্রয়োগকৌশল, কোনোদিকেই কোনো নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন নজরে পড়ে না। পুনরাবৃত্তির রোমহুনেই স্থপতিদল ছিলেন আত্মনিমগ্ন। ঐতিহাসিক টয়েনবীর দর্শনসূত্র



তাজমহল
আজা
1634



সেকেন্দা
-জেরন
সেকেন্দা
1602



টারমিনার
হায়দ্রাবাদ
1591



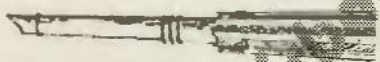
টুদমিনার
দিল্লী
1435



শাহজাহান
মসজিদ
আগ্রা
1650



কুতুব
মিনার
দিল্লী
১১৯১
খাজুরাও



গুহলী
মিনার
বাইজেন্ট
১১৯১
খাজুরাও

প্রতিষ্ঠা করতেই যেন এই অবক্ষয়ী পদ্ধতিগুলো এসে উপস্থিত হল আগলুকদল, তাদের নূতন চিন্তাধারা নিয়ে। ভারতীয় স্থপতির সামনে উপস্থিত করা হল নানান জাতের

সমস্যা—প্র্যানিং এবং প্রয়োগকৌশলের। ধূমায়িত বহি পুনরুজ্জীবিত হল। কুওওতুল ইসলাম মসজিদের মাথাসুরায় তারা প্রথম তৈরী করবার চেষ্টা করল আর্চ—যা তারা ইতিপূর্বে কখনও বানায়নি। তা; দেখতে হল হুবহু ‘খিলান’, যদিও তা আদৌ শাস্ত্রসম্মত ‘আর্চ’ নয়। ট্র্যাবিয়েট-পদ্ধতি থেকে আর্কুয়েট-পদ্ধতিতে উত্তরণে তাই আরও কিছুদিন সময় লাগল এবং প্রথম আর্চ তৈরী হল ‘বলবন’-এর মক্ভারায়। অনুরূপভাবে ‘গম্বুজ’ বানাতে শিখল তারা। তিল তিল করে এই দুই মহান চিন্তাধারা—ইন্দো এবং ইসলাম, বেদাগ মিলে গেল।

তবু বলব ‘ইন্দো-ইসলামী’ স্থাপত্যের প্রকৃত আবির্ভাব ঘটল আরও তিনশ বছর পরে। জানি, আপনারা চমকে উঠবেন, তা সত্ত্বেও আমি বলব গোটা সুলতানী যুগে, পাঠান যুগে, ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের জন্ম হয়নি। তা প্রথম হল জালালুদ্দীন আকবরের জমানায়। প্রথম তিনশ বছর দিল্লীশ্বরেরা ছিলেন একান্তভাবে পশ্চিমমুখী। ইরান-তুরান-আফগানিস্থানের অঙ্ক অনুসারী। কুৎব-মিনার থেকে হুমায়ুনস্টম্ভকে যদি ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন বলেন—যেহেতু সেগুলি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার অন্তর্ভুক্ত, তাহলে ব্রিস্টলে রাজা রামমোহনের সমাধিকেও ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের নিদর্শন বলে ধরতে হয়। আকবর-জমানা-তক্ ইন্দো এবং ইসলামের মিলন হয়নি, হয়েছে গৌজামিলন। কুওওতুল-ইসলামের মসজিদের স্তম্ভে শঙ্খ-ঘণ্টা-পদ্ম-চক্র, মায় চতুর্ভুজ দেবতার মূর্তি সত্ত্বেও তাতে হিন্দু-স্থাপত্যের তিলমাত্র পরিচয় নেই—এই গৌজামিলন ঘটেছে এ জন্য যে, কুৎব উদ্দীন আইবক সাতাশটি হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করে সেই স্তম্ভগুলি তাঁর মসজিদে ব্যবহার করেছিলেন।

মিলন হতে এত দেরী হল কেন?

কারণ ছিল।

জন্ম মুহূর্তের পর অতি অল্পসময়ে, দু-তিনশ বছরের ভিতরেই, ইসলাম বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য বিস্তার করে ফেলে—একে একে পদানত হল সহস্রাব্দীর ঐতিহ্যময় প্রতিবেশী রাজ্যগুলি—মেসোপটেমিয়া, পারস্য, সিরিয়া, মিশর, জুডিয়া, তুর্কিস্থান প্রভৃতি। সেই সব রাজ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের একটি মৌল পার্থক্য আছে। সহস্রাব্দীর ঐতিহ্যবাহী মিশর, পারস্য, তুরান প্রভৃতি ইসলামকে গ্রহণ করল স্বাভাবিকভাবে। তারা ধর্মান্তরিত হয়ে গেল। নূতন ধর্ম, নূতন আদর্শ, নূতন জীবনবিদ্যাকে সর্বাস্বকরণে গ্রহণ করল। ভারতবর্ষ তা করল না। আপন জারকরসে জীর্ণ করে ধ্বংস-ভাবে সে ইতিপূর্বে গ্রীক-শক-পহুব-মুচী সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল সেভাবেই ইসলামকে আত্মসাৎ করতে চাইল। গ্রীক-শক-মুচীরা এখানে অশ্ববাসীর মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করেছে—সাম্রাজ্য বিস্তার করে স্থায়ী আসন পাতেনি। এই সহস্র বছর সত্যটা ভারতবর্ষ বুঝল না। চার্বাকের নিরীশ্বরবাদিতা, বুদ্ধের বেদের অপৌরুষেয়তা বিষয়ে, ঈশ্বরের বিষয়ে নীরবতাকে সহ্য করে সে ভাবল ইসলামকেও ঐভাবে মেনে নেওয়া যাবে। তা গেল না। যাওয়ার কথাও নয়। অপূরণের বিশ্বাস অধিষ্ঠিত মেনে নিয়ে, মানিয়ে নিয়ে, মাঝপথে রফা করার উপাদান যে আগন্তুকদের মর্মানসিকতায় নেই, এটা চূড়ান্তভাবে বোঝা গেল ইসলাম-

আগমনের তিনশ বছর পর, আকবর-বাদশাহ-র “দীন-ইলাহী” ধর্মপ্রবর্তনের ব্যর্থতায়। তাই কাস্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, প্রাগজ্যোতিষপুর থেকে ঘরকা পদানত করেও ইসলাম ছয় শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে রয়ে গেল সংখ্যালঘুরূপে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল জিজিয়া কর জুগিয়েও আঁকড়ে রইল তার ধর্মবিশ্বাস। শাসনদণ্ড হস্তান্তরিত হয়ে যাবার পর সেই সংখ্যালঘু প্রান্তন শাসকদল নিরাপত্তার আশ্রয় খুঁজল ‘সেপারেট ইলেকটরেট’-এ, পরে ‘পাকিস্তান’-এ। রাজনীতির ক্ষেত্রে ‘ইন্দো’ আর ‘ইসলাম’ কোনদিনই হাতে হাত মেলাতে পারেনি।

কিন্তু রাজনীতিই তো জীবনের ঘোলা-আনা নয়! ধর্মের জিগির তুলে যখন মানুষজনকে খেঁপিয়ে তোলা হয়নি তখন তারা—ঐ হিন্দু ও মুসলমান নিরম গ্রামবাসীরা, শহরবাসীরা— পাশাপাশি বাস করেছে। পরস্পরের সুখে আনন্দ করেছে, দুখে কেঁদেছে। ক্ষেত্রে-খামারে-কলকারখানায় তারা ক্রমশ বুঝতে শিখেছে যে, ভারতবর্ষে সত্যি সত্যি পৃথক দুটো জাতই আছে, কিন্তু তাদের নাম ‘হিন্দু’ ও ‘মুসলমান’ নয়; তাদের নাম—‘অস্তিদল’ ও ‘নাস্তিদল’! একপক্ষে বিস্তৃশালী হিন্দু-মুসলমান জমিদার-জোতদার-মিলমালিক, অপরপক্ষে হিন্দু-মুসলমান ভূমিহীন কৃষক শ্রমিক! তাই জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে, শিল্পের ক্ষেত্রে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মিলন সার্থক হওয়ায় কোন ব্যাধা হয়নি। ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মিঞা-কি-মল্লহারে বিভোর হয়ে অশ্রুপাত করেন, জয়নাল আবেদিন দুর্গা প্রতিমার স্কেচ ঐকে বঁদ হয়ে যান। তাই নোবেল প্রাইজ পাওয়া মুসলমান ছাত্র বিদেশ থেকে ছুটে আসেন তাঁর হিন্দুগুরুর পদধূলি নিতে! নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প, লোক-গাথা, লোক-সঙ্গীতে, লালন ফকিরের গানের মতো ইন্দো-ইসলামী ভাবধারা মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

কিন্তু আজ আমাদের আসর সঙ্গীর্ণতর পরিধিতে : স্থাপত্য!

আফসোস! হরগীজ-আফসোস! কী বাতঁ! স্থাপত্যের আসরে সে মিলনের দিকে আমরা—আধুনিক স্থাপত্যের ছাত্রদল—নজর দিই না। এই মহান উপবীপের দুই প্রধান সুরিক কোথায় মিলতে পেরেছিল, কোথায় পারেনি, এবং কেন পারেনি তা নিয়ে আমরা গবেষণা করি না। ভারত স্বাধীন হয়েছে কয়েক দশক, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন মৌলিক গবেষণা যদি আদৌ হয়ে থাকে তবে তা আমার নজর এড়িয়েছে। আমরা অস্বীকার করি যে গ্রহটি নিয়ে নাড়াচাড়া করি তা না হিন্দুর, না মুসলমানের,—তা প্রকৃত স্বাধীনতা যুগের ব্রীষ্টানের : পার্সি ব্রাউন!

স্থাপত্য জীবন-বিমুখ শাস্ত্র নয়। সাম্প্রদায়িক ভেদনীতির উর্ধ্ব উত্তে হলে স্থাপত্যের পায়োপণটে লেখা ইতিহাসের শিক্ষা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। হিন্দুকে জানতে হবে মুসলমানী রীতিনীতি, শব্দ-ভাষা-বাচনভঙ্গি; মুসলমানকে শিখতে হবে হিন্দুর আচার-ব্যবহার, চিন্তাধারা। আর সেই শিক্ষার অন্যতম স্রষ্টা ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যে। কুৎস-মিনার থেকে সফরজঙ্ঘের সমাধিসৌধ, প্রতিটি স্থাপত্য-নিদর্শনে তদানীন্তন দিল্লীশ্বরের ব্যক্তিগত চরিত্রটুকুই নয়, চোখ বুলিয়ে দেখতে পাবেন ওতে মিশে আছে মিলিত হিন্দু-মুসলমানের হাসি-অশ্রু-বেদ-রক্ত। কান পাতলে শুনতে পাবেন সেই দেওয়ান-ই-আম-

এর সম্মুখস্থ নক্করখানা থেকে উচ্চকণ্ঠ ঘোষকের : 'হৌশিয়ার !' ইমান-ইনসাফের মালিক আল্লাতালার জিল্লুল্লার আবির্ভাব-ঘোষণা ! তখৎ-ই-সুলেমান-আসীন দীন-দুনিয়ার মালিক শাহ্-এন-শাহ্-এর দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারিত ফরমান ! জাম-ই-মসজিদের মিনার-চূড়ায় জোহা-সাম নামাজের দিগন্তানুসারী আজান-ধ্বনি ! শিশ্মহালের আর্কদ্-ব্রুতবে প্রতিধ্বনিত ইরানী-ইস্পাহানী অনিন্দ্য-নর্তকীর নূপুর-নিষ্কণ অথবা সন্দৌখ-জিয়াদায় হুশীশীয়ম্নের হিস্‌হিসানি !

'এ ভাষা বুঝি না' বললে চলবে না, কাজীসাহেব অথবা মুজতবা-আলী সাহেবের সৃষ্ট বাংলা ভাষায় বাঙালী-হিন্দুদের রপ্ত হতে হবে। এ সত্য প্রাণিধান করতে হবে !

নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায় !

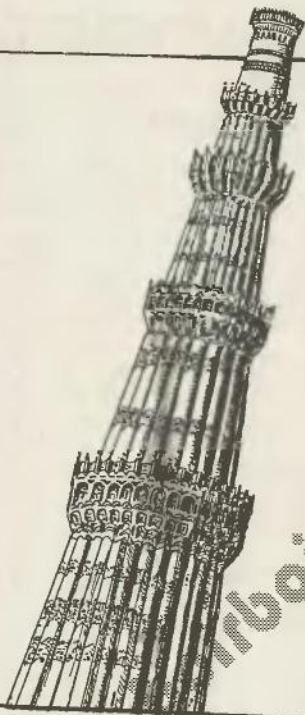
—এর মানেও বুঝতে হবে বাঙালী মুসলমানকে।

ভালবাসার তালি একহাতে বাজেনা।



boirboi.net

কুৎব কি হেলানো হিন্দু মানমন্দির



আমার প্রশ্ন তিনটি : হেলানো ? হিন্দু ? মানমন্দির ?

জানি, আপনাদের মনে প্রথমেই উদয় হয়েছে একটি চতুর্থ প্রশ্ন : এমন আজগুबी তিনটি প্রশ্ন আমার মনে উদয় হল কোন সুবাদে ? সেই কৈফিয়তটাই আগে দিই :

এ-জাতীয় ভাস্ত ধারণার মূলে আছেন কিছু হিন্দু-ভারত অভিমानी তথাকথিত পণ্ডিত, যাঁদের মূলমন্ত্র একটি প্রচলিত প্রবচনে বিদ্যুত—‘যা নাই ভারতে, তা নাই ভারতে।’ অর্থাৎ মহাভারতে যা দেবনাগরি হরফে লেখা হয়নি তা কোনদিন ছিল না, বর্তমানে নেই। ওঁদের মতে এয়ারক্রাফ্ট হচ্ছে পুষ্পকরথের বিবর্তিত রূপ, অ্যাটম-বম্ পাশুপত ব্রহ্মাস্ত্রের। হিন্দু-ঐতিহ্যের কট্টর ধ্বজাধারীদের মতে সাম্প্রতিক কালে খ্যাতিলাভ করেছেন শ্রী পি. এন. ওক। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির নামেই ওঁদের চিন্তাধারার পরিচয়। বঙ্গানুবাদে গ্রন্থগুলির নাম —(ক) দিল্লির লালকেলা হিন্দু-লালকোট, (খ) লঙ্কায়ের ইমামবাড়া হিন্দু রাজপ্রাসাদ, (গ) ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার কয়েকটি মৌল শাস্তি, (ঘ) তাজমহল বাস্তবে একটি হিন্দুমন্দির, (ঙ) কে বলে আকবর মহান ?

এক শ্রেণীর পাঠক যে এই চিন্তাধারায় আত্মগোপন অনুভব করেন এবং বইগুলি গোত্রাসে গেলেন তা অনস্বীকার্য, না হলে ঐ গ্রন্থগুলির ক্রমাগত এডিশন হত না। দুঃখ হয়, যখন দেখি ক্ষমতাবান পণ্ডিত লেখকও ঐ সব ভ্রান্ত তথ্যের শিকার হন। কয়েক বছর পূর্বে স্বনামখ্যাত বিজ্ঞান বিষয়ক প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রপুরস্কারে বিভূষিত শ্রী অরুণরতন ভট্টাচার্য আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। “কুতব মিনার কি একটি হেলানো হিন্দু মানমন্দির ?” অরুণরতন বাবু সিদ্ধান্তে এসেছেন : আজ্ঞে হ্যাঁ তাই !

তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি দাঁড় করিয়েছেন একটি অত্যন্ত তথ্যের উপর—কুতব আলম (ভার্টিকাল) নয়, দক্ষিণ দিকে ৫ ডিগ্রি হেলে আছে। ঐ হেলে যাওয়াটা নাকি ঘটিনাচক্রে বা বনিয়াদ (ফাউন্ডেশন) বসে যাবার কারণে হয়নি, স্থপতিবিদ সজ্ঞানে করেছেন, কারণ এটি একটি মানমন্দির। স্থপতির উদ্দেশ্য যাতে প্রতি বছর একুশে জুন মধ্যাহ্নকালে মিনারের কোনও ছায়া না পড়ে।

যদি নাই পড়ে তাতে কোন চতুর্ভুজ লাভ হবে ? সে কথায় পরে আসছি, আপাতত বুঝে নিই ঐ দিন ঐ সময়ে কেন ছায়া পড়বে না।

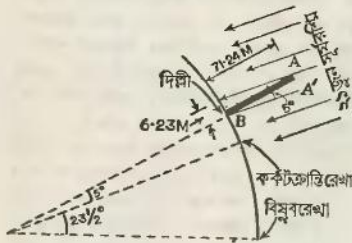
একুশে জুন মধ্যাহ্নকালে সূর্য আছে কর্কটক্রান্তি রেখার উপর। পৃথিবীতে কর্কটক্রান্তি রেখায় অবস্থিত যে কোন স্থানে মধ্যাহ্নকালে সূর্য থাকবে ঠিক মধ্যার উপর, অর্থাৎ ‘জেনিথে’। ফলে কর্কটক্রান্তি রেখায় অবস্থিত কোন মিনারের ছায়া ঠিক মধ্যাহ্নকালে পড়বে তার পাদদেশে। ছায়া দেখা যাবে না। কিন্তু দিল্লির অক্ষাংশ $28\frac{1}{2}$ ডিগ্রি উত্তর। অর্থাৎ কর্কটক্রান্তি রেখার $23\frac{1}{2}$ থেকে 5 ডিগ্রি উত্তরে। সুতরাং দিল্লিতে অবস্থিত কোনও মিনার যদি দক্ষিণ দিকে পাঁচ ডিগ্রি হেলে থাকে তাহলে তার ছায়া ঐ দিন ঐ সময়ে দেখা যাবে না। এ পর্যন্ত অরুণরতন বাবুর সঙ্গে আমরা একমত। যাঁদের মনে এখনও একটু সন্দেহ আছে তাঁরা সংলগ্ন স্থিতি দেখে তত্ত্বটা বুঝে নিন। B বিন্দু দিল্লি নগরী। মিনার যদি আলমরেখার (BA) সঙ্গে পাঁচ ডিগ্রি কোণ রচনা করে BA অবস্থানে থাকে

তাহলে মিনারটি ঐ সময়ে সূর্যরশ্মির সমান্তরাল হয়ে যাবে, ছায়া পড়বে না।

এখন আলোচনা বিধারায় বইবে।

এক : যে প্রশ্নটা মূলতুর্বা আছে, অর্থাৎ তাতে কোন চতুর্ভুজ লাভ হবে ?

দুই : এ তথ্য লেখক কোথায় পেলেন ?



প্রথম প্রশ্নটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। জ্যোতির্বিদ্যার কোন প্রয়োজনে—যদি এটি আদৌ মানমন্দির হিসাবে নির্দিষ্ট হয়—অতবড় মিনারকে সজ্ঞানে হেলানো হল ? প্রয়োজন যদি থাকে তাহলে দিল্লি, কাশী, উজ্জয়িনী বা জয়পুরের যন্ত্রমন্ত্রের এমন হেলানো-মিনার বানানো হয়নি কেন ? বরং মিনার যদি আলম্ব হত তখন মেপে

দেখা যেত ঐ সময় ছায়ার দৈর্ঘ্য 6.35 মিটার। যেহেতু মিনারের উচ্চতা 71.24 মিটার তাই ত্রিকোণমিতির একটি সহজ অঙ্ক কষে বলে দেওয়া যেত যে, দিল্লির ভৌগোলিক অবস্থান ককটিক্রান্তি রেখার 5 ডিগ্রি উত্তরে অর্থাৎ দিল্লির অক্ষাংশ $28\frac{1}{2}^\circ$ উঃ।

দ্বিতীয় প্রশ্নটা আরও বিলাস্তিকর। এ তথ্য উনি কোথায় পেলেন ? তিনি নিজেই থিওডোলাইট ঘাড়ে করে দিল্লি গিয়ে সেটা মেপে দেখেছেন ? নাকি পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোন রিপোর্ট পড়ে জেনেছেন ? সেসব কথা তিনি বলেননি। শুধু আপত্তিকার মতো তথ্যটা ঘোষণা করেছেন।

আমি সহজলভ্য গ্রন্থে কোনও জবাব পাইনি। অথচ অনেক পণ্ডিতই মৌখিক জানালেন—কুৎব যে হেলে আছে এটা তাঁরা শুনেছেন, তবে কতটা তা বলতে পারেন না। অগত্যা ডাইরেক্টর জেনারেল, আর্কিওলজিকে চিঠি লিখি। তিনি আমাদের জানালেন যে, বনিয়াদ বসে যাওয়ায় কুৎব বর্তমানে 0 ডিগ্রি-46 মিনিট 48 সেকেন্ড হেলে আছে। দক্ষিণদিকে কিনা তাও বলেননি।

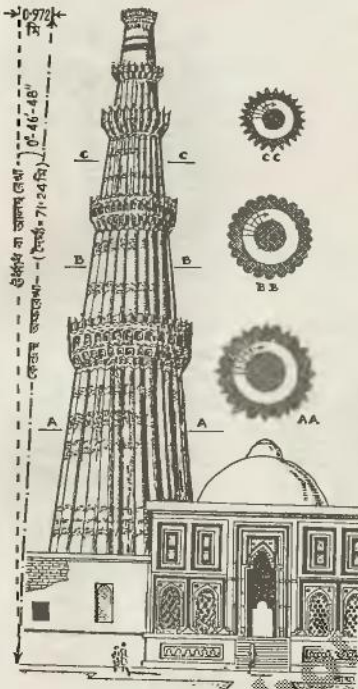
অনুপরতনবাব উপসংহারে বলেছেন, “কুতুব-মিনার কারা নির্মাণ করেছেন, সে কথা সঠিক বলতে পারি না। কিন্তু বিতর্কমূলক সে আলোচনার বাহিরে গিয়েও এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, মিনারটিকে মানমন্দির হিসাবে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।”

অবশ্য “নিঃসংশয়ে” এই স্থিরসিদ্ধান্ত ঘোষণা করার পূর্বে লেখক আরও দুটি অকাটা যুক্তির অবতারণা করেছেন। যথা :

১। “এর ভিত্তিমূল সাতাশটি স্বর্গরশ্মির একটি বহুভুজ। বহিরঙ্গটিতেও সাতাশটি অর্ধবৃত্তাকার কৌণিক বিভাগ আছে। হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে সাতাশ সংখ্যাটি

কুৎব কি হেলানো হিন্দু মনমন্দির

বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে, চান্দ্রতিথি সংক্রান্ত বিভাগে যে সাতাশটি নক্ষত্র আছে, সেটি হিন্দু-উদ্ভাবন বলেই স্বীকৃতি পেয়েছে।”



কুৎব মিনার ও আলাই দরগাহ

এ-ক্ষেত্রে থিও-

ডোলইট যন্ত্রের প্রয়োজন নেই, ছয় থেকে বারো গুণতে পারলেই বুঝবেন—তথ্যটি ভ্রান্ত। ভিত্তিমূলে আছে বারোটি কোঠা, বারোটি অর্ধবৃত্ত একুনে চব্বিশটি ভাগ। হিন্দু উদ্ভাবন বলে চব্বিশকে সাতাশ বলে ধরা হয়েছে, যেমন পৌনে এক ডিগ্রিকে পাঁচ ডিগ্রি।

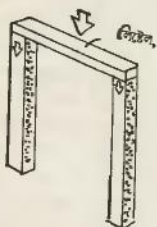
২। “মিনারে সাতটি তল, সপ্তাহের সাতদিনের সূচক।”

এবারও গুণে দেখছি: পাঁচটি তল, আদিতে ছিল চারটি।

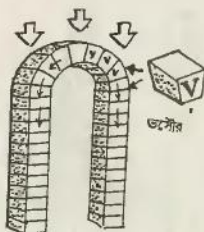
উপসংহার : হিন্দু-ভারত অভিমাত্রীরা তাঁদের উদ্ভাবনী বুদ্ধিতে যত কুয়ুতির আমদানীই করুন না কেন কুৎব মিনার না হেলানো, না হিন্দু-উদ্ভাবন, না মনমন্দির।

মুজতবা আলী সাহেব কুৎব প্রসঙ্গে বলেছেন, “কুৎবের পর পাঠান মোগল বিস্তার মিনারেট গড়েছে; কিন্তু সেগুলো কুৎবের ধারে-কাছে

আসতে পারে না। তাজের মিনারিকা ভুবনবিখ্যাত, কিন্তু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শিল্পী সেখানে নতমস্তকে হার মেনে নিয়ে সেটাকে সাদামাটার চরমে পৌঁছে দিয়ে খাড়া



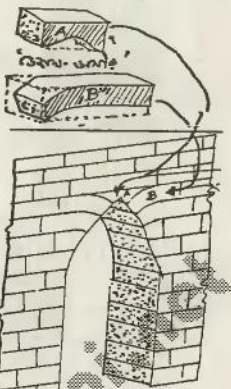
হিন্দু পদ্ধতির লিষ্টেল বা 'কড়ি'



প্রকৃত থিলান বা আর্চ ।



প্রাক মুসলিম-যুগের কক্কেলিও পদ্ধতি ।



কুৎবমিনারের সন্ধুখে

আর্চ বানাতে অশক্ত

হিন্দু স্থপতির 'ডেমাল-থিলান'

করেছেন। পাছে লোকে তাঁর মিনারিকার সঙ্গে কুৎবের তুলনা করে লজ্জা দেয়, তাই তিনি সেটাকে গড়েছেন এমন ন্যাড়া করে যে, দর্শকের মন যেন অজান্তেও কুৎবকে স্মরণ না করে। নাহলে যে-তাজের সর্বাস্থে গৃহনার ছড়াছড়ি তার চারখানা মিনারিকা হস্তে 'নোয়াটুকু'-র চিহ্ন নেই কেন? ওদিকে দেখুন হুমায়ুনের সমাধিনির্মাতা ছিলেন আরও ঘড়েল—তিনি তাঁর ইমারতটি গড়েছেন মিনারিকা সম্পূর্ণ বর্জন করে।”

ইংরেজীতে যাকে 'ক্ৰিটিকাল অ্যাপ্রিসিয়েশন' বলে, বিশ্লেষণ-মূলক মূল্যায়ন সেটা আর আমাকে কষ্ট করে করতে হচ্ছে না। অগ্রজ সাহিত্যিক এ 'ডীল'-এ তাঁর তুরূপের টেকাটি পেড়ে 'লীড' দিয়েছেন। ফলে, ও হাত পাশিয়ে আমি বরং সাদামাটা ভাষায় কুৎবের বহিরঙ্গের পরিচয়টুকু দিই :

কুৎব শুরু করেন কুৎবউদ্দীন আইবক। প্রথম তলা (29-5 মিটার) পর্যন্ত পৌছবার পূর্বেই কুৎব-উদ্দীনের এস্তেকাল হয়। বাকি তিনটি তলা গেঁথে তোলেন তাঁর জামাই ইলতুৎমিস। সর্বসমেত উচ্চতা 71-24 মিটার বা প্রায় 241 ফুট। সোপান সংখ্যা 379। কুৎবের একতলা, দোতলা, তিনতলার 'সেকশনাল প্ল্যান' কেমন হবে তা ছবিতে দেখাবার চেষ্টা করেছি। অর্থাৎ মনে মনে জমির সমান্তরালে কুৎব-কে খোড় কাটার মতো কেটেছি। যীরা মনে মনেও কুৎবকে করাত দিয়ে কাটতে সাহস পাবেন না, তাঁরা না হয় মনে করুন গাঁথনি ঐ AA অথবা BB রেখা পর্যন্ত ওঠার পর, বিরিঞ্চিবাবার আশীর্বাদে সুন্দর শরীরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হাজির হয়ে, ভাড়ার উপর চড়ে নির্মীয়মাণ কুৎবের স্থানদানী বদনখানি নিচু দিকে মুখ করে দেখছেন।

আলী সাহেবের আর একটি বক্তব্যের সঙ্গে কিন্তু আমি একমত নই।

উনি বলেছেন, "কুৎব-মিনার পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মিনার।... এর পূর্ববর্তী নিদর্শন এদেশেও নেই, ইরান-তুরানেও নেই। বহু স্থপতির বহু এক্সপেরিমেন্টের পুরো ফায়দা উঠিয়ে তাজ নির্মিত হল—কিন্তু মিনারের ক্ষেত্রে কুৎব প্রথম এবং শেষ এক্সপেরিমেন্ট।”

কুৎব উচ্চতায় অনন্য একথা একশবার। কিন্তু এ পরীক্ষা বহির্ভারতে যে আদৌ হয় নি, তা বলা ঠিক নয়। বরং বলব, কুৎব একটি স্থাপত্যের বিবর্তন-ধারার অস্বাভাবিক স্টেশন।

আফগানিস্থানে সম্প্রতি (আলী সাহেবের মৃত্যুর পরে না হলেও ঐ অবস্থার রচনার পরবর্তীকালে) নেমরোজ প্রাসাদের শাহ-পোষে খননকালে একটি মিনারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটি নবম শতাব্দীর। তার প্ল্যান কুৎবের সঙ্গে গড়া। পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞ শ্রী আর সেনগুপ্তের মতে এই মিনারটি এর পূর্বসূরী-নির্মিত সামানিৎ বংশের বুখারারা শাসক ইসমাইলের (892-907) নির্মিত একটি মিনারের অনুসরণে গড়া। সেটিও নাকি প্রথম নয়, তারও পূর্বে নির্মিত হয়েছিল আফগানিস্থানের প্রাচীনতম মসজিদে একটি মিনার। স্থানীয় লোকেরা যাকে বলে 'নাও-গাখুদ' (শিয়া গম্বুজ)। কে-জানে এ ঐতিহ্যের উৎসমুখে দুই-নদী অববাহিকার 'জিগগুরা'—এ যেতে হবে কি না। সেক্ষেত্রে কুৎব-এর আদিমতম উৎস বোধকরি—ওড় টেক্সটের বর্ণিত বহিবেলের আকাশচুম্বী মিনার।

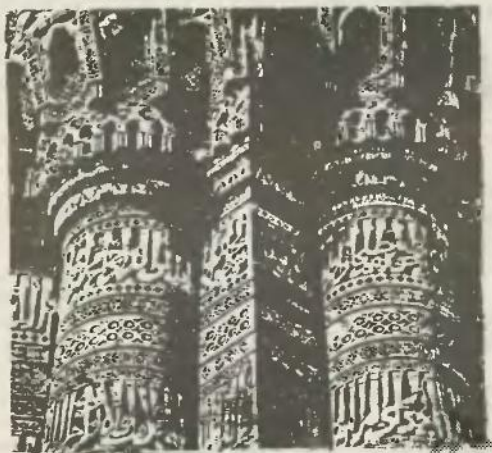
কুৎব-এর চেয়ে বয়ঃজ্যেষ্ঠ আরও অনেকগুলি মিনারের কথা মনে পড়ছে।

যথা : 'জাম'-এ নির্মিত গীয়াস-উদ্দীন ঘোরির (1157-1202) মিনার ; গজনিতে

নির্মিত দুটি মিনার, গজনির মাহমুদ (42-7 মিটার উঁচু) এবং তাঁর পুত্র মা-সুদের নির্মিত। এ দুটির সঙ্গে কুৎবের যথেষ্ট সাদৃশ্য।

গজনি-মিনার থেকে কুৎব অতিক্রম করে মুসলমান স্থপতি কী ভাবে তাজমহলের মিনারে উপনীত হয়েছিলেন তার একটি বিবর্তনচুম্বক এখানে চিত্রের মাধ্যমে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছি।

কুৎব-এর গায়ে যে বাণী উৎকীর্ণ করা আছে, তার কিছুটা কুরান শরীফের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ থেকে সঙ্কলিত—তাতে আব্রাহাম ও জ্যাকবের নামোল্লেখ করা হয়েছে, এমনকি জননী মেরীর 'ইমমাকুলেট কনসেপশনে'র কথাও।



যাঁরা বলেন, এগুলি মুসলমান সম্রাট পৃথ্বীরাজ-নির্মিত মিনারের গায়ে খোদাই করিয়েছিলেন, তাঁদের আর একটু নজর উঁচু করতে বলব। কুরানের বাণীর উপরেই বোলা বারান্দার 'স্ট্যালেকটাইট', বা মধুমক্ষিকার কোষের মতো বিলানের মাধ্যমে ক্যাপিটলিডার বারান্দার ভারবহনের আয়োজন। এই স্ট্যালেকটাইট-নির্মাণ কৌশল হিন্দুভারত জ্ঞানত না; এবং এগুলি ভারবাহী অঙ্গ। অর্থাৎ তৈরি মিনারে এগুলি পরবর্তী সংযোজন হতে পারে না। মিনারের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে এই স্ট্যালেকটাইটই অকাটা যুক্তি; এর পরিকল্পনাকার মুসলমান।

যাযাবর তাঁর 'দৃষ্টিপাত'-এ লিখেছেন, "দিব্লির প্রথম মসজিদে স্থাপত্যের যে নির্দশন রইল সেটা হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সম্মেলন নয়, গৌজামিলন। কুৎব মিনার সংলগ্ন

মস্জিদে আজও তার প্রমাণ আছে।”

মুজতবা-আলী সাহেব কিন্তু একেবারে ভিন্ন সুরে একথা বলেছেন, “মিনারকে কোমরবন্ধের মতো ঘিরে রয়েছে সারি সারি লতা-পাতা, ফুলের মালা, চক্রের নকশা। এগুলি জাতে হিন্দু এবং এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে এক সারি অন্তর আরবী লেখার সার—সেগুলি জাতে মুসলমান। কিন্তু উভয় খোদাই-এর কাজই যে হিন্দু শিল্পী করেছেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কণামাত্র অবকাশ নেই। গোটা মিনারটা পরিকল্পনা করেছে মুসলমান, যাবতীয় কারুশিল্প করেছে হিন্দু—ভারতবর্ষে মুসলমানদের সর্বপ্রথম সৃষ্টিকার্যে হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে যে অদ্বিত সাফল্য দেখিয়েছিলেন সে মিলন পরবর্তী যুগে কখনও ভঙ্গ হয়নি, কভুবা মুসলমানের প্রাধান্য বেশি, কোনো ইমারতে হিন্দুর প্রাধান্য বেশি। আটশত বৎসর একসঙ্গে একে হিন্দু-মুসলমান চিন্তার ক্ষেত্রে, রাজনীতির জগতে সম্পূর্ণ এক হয়ে যেতে পারেনি, কিন্তু কলার প্রাঙ্গণে (ছাপতা, সঙ্গীত ও নৃত্য) প্রথম দিনেই তাদের যে মিলন হয়েছিল, আজও তা অটুট আছে।”

কুৎব প্রাঙ্গণে ষষ্ঠসত্বরের সামনে দাঁড়িয়ে তাই মনে হয়—বিজয়ী-বিজিতের যে দ্বন্দ্ব তা আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া। বিস্মৃত ইতিহাসের দেহনীতে ঐ ভাঙা পাথরগুলোয় কান পেতে শুনতে পাই—হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা; দিল্লির ধুলোয়-ধুলোয় মিশে আছে অতীতকালের সে হাসি-অশ্রুর ঐকতান।

—সহসা সহযাত্রীর পোর্টেবল ট্রানজিস্টারে বেজে ওঠে ‘খারে-লাপ্পা’। সুর কেটে যায়। ইচ্ছা হয় গালিবের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে ওদের ডেকে বলি :

“দের নহী হরম্ নহী দর নহী আস্তা নহী

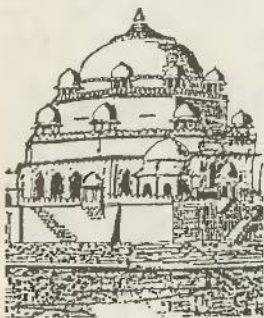
বৈঠে হ্যায় রাহ-গুজর পো হম, গের

হমঁ উঠায়ে কিউ ?” *

না, থাক। আট-শতাব্দীর এপারে দাঁড়িয়ে “কার হল জয়, কার পরাজয়, কাহার বৃদ্ধি কার হল ক্ষয়, কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়” সে সব কথা আর মনে রাখব না। হিন্দুর মানমন্দির নয়, গৌজামিলনও নয়, শ্রদ্ধাবিনশ্রুতিতে আলী-সাহেবের যুক্তিটাই বরং মেনে নিই।

-
- * মন্দির নয়, মস্জিদ নয়, আস্তানা নয়,
ধরনা দিইনি দরজায়, আসর পেতেছি
পথের ধূলায়, সেখান থেকেও উঠিয়ে
দেবে আমাকে ?

আলিওয়াল খাঁ : একজন 'রাজ'-মিস্ত্রির নাম



সামনেই খাইবার গিরিবর্ষের উপলব্ধুর
বিসর্পিল বিপদসঙ্কুল পথ। এপথে দলে
ভারী হয়ে যাতায়াত করাই বাঞ্ছনীয়। তাই
সরইখানার ওপ্রান্তে ঐ যে শ্রৌড় লোকটা
বসে আগুন পোহাচ্ছে তার সঙ্গে যেচে
আলাপ করল ইব্রাহিম, আপনিও কি
হিন্দুস্থানে চলেছেন নাকি ?

লোকটা উঠে দাঁড়ায়। মাজা কুঁকিয়ে
সালাম করে বলে, জী হাঁ, মেহেরবান। এ
সড়ক বহুৎ খতরনাখ হুজুর ; আপনি যদি
এৎরাজ না হন, তাহলে কাল সকালে আমরা
একসঙ্গেই যাত্রা করব।

সেটাই ইব্রাহিমের মনোগত বাসনা। মুখে
স্বীকার করল না যদিও। বরং জিজ্ঞাসা করল, হিন্দুস্থানে রিস্তাদার য্যাহ্ জান-পহ্চান
কেউ আছে ? নাহলে সুলতানী ফৌজে নোকরি মেলা মুশকিল-কি-বাৎ।

লোকটা হেসে বললে, না হুজুর, ব্যস-কি বাপ-দাদা আমাকে সমসের ঘোরাতে
শেখায়নি, আমার হাতিয়ার ছেনি-হাতুড়ি।

ওহ, রাজমিস্ত্রি ! ইব্রাহিম একথা প নেমে আসে, 'আপ'-সে 'তুম'-এ। জানতে চায়,
তোমার সঙ্গে ওটি কে ? বেটা ?

লোকটা তার পার্শ্ববর্তী সতের বছরের জোয়ান ছাওয়ালের পাজরে বেমরা একটা
খৌচা মেরে বলে, সেলাম কর ! বে-অকুফ !

ছেলেটা উবু হয়ে বসে আগুন পোহাছিল ! আফগানিস্থানের হাড়কাখনো জাটা।
বাপজানের দিকে একনজর হিরণ-দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে দেখে। অজানা অজানা ইনসানটাকে
খামকা সেলাম করতে হবে কেন সেটা ঠাহর হয় না। অবশ্যই হয় না তা বলে। দায়সারা
একটা সেলাম ঠেকে গৌজ হয়ে বসে থাকে।

ইব্রাহিম ওর কচি দেওদার চারার মতো সতেজ মুখবুৎ দেহটা একনজর দেখে নিয়ে
জানতে চায়, তুমিও বুঝি রাজমিস্ত্রি ?

বাপই জবাব দেয় তার হয়ে, জী হাঁ, মেহেরবান্দ। এই বয়সেই ওর দারুণ এলেম।

—তাই নাকি ! কী নাম তোমার ?—ছেলেটাকেই প্রশ্ন করে ইব্রাহিম।

—আলিওয়াল খান।

—মক্কারা বানাতে জানো ?—ইব্রাহিমের অইতু কী প্রশ্ন।

কী-জানি কেন হঠাৎ অপমানিত বোধ করল ছেলেটা। প্রতিপ্রশ্ন করে, কেন ? বানাবেন ? এই খাইবার-এ ?

ইব্রাহিম রাগ করল না। হেসে বলল, হ্যাঁ। তবে এখন নয়, বেশ কয়েক বছর পরে। আমার নাম ইব্রাহিম শুরী, আমি সেরাখেল কুর্বিলার আফগান—এ আমার ছেলে মিঞা হাসান শুরী। মনে থাকবে ? আমিও ঐ আজীব দেশ হিন্দুস্তানে চলেছি তগদিরের খেল দেখতে, যেমন তোমার বাপজান চলেছে তোমাকে নিয়ে। যদি কোনোদিন শুনতে পাও আমি জায়গীরদার বা তার চেয়ে বড় কিছু হয়েছি তখন আমার সঙ্গে মূল্যকাৎ করবে, কেমন ? দেখব, তুমি কেমন মক্কারা বানাতে পারো।

আলিওয়াল এবারে যে সেলামটা করল সেটা অকৃত্রিম। বললে, যাদ্ থাকবে খোদাবন্দ।

ভারপর বহু জল বহে গেছে সিদ্ধ দিয়ে : এবং যমুনা দিয়ে। আলিওয়ালের আব্বাজান ঐতিহাসিক দিল্লি নগরীতে উপনীত হয়ে কোনো ইমারৎ আদৌ বানিয়েছিল কিনা ইতিহাস সে-কথা লিখে রাখতে ভুলেছে—সেটা ইতিহাসের বাতও নয়। ঐ আলিওয়ালদের কাওকারখানা মনে রাখা। কিন্তু ইব্রাহিম জায়গীরদার হয়েছিল। তার কবরের উপর অবশ্য মক্কারা বানানো হয়নি। তার সেদিনকার সেই নাবালক পুত্র মিঞা হাসানও উত্তরাধিকার সূত্রে জায়গীরদার হয়েছে—বিহারে ; সাহাবাদ পরগণায়, সাসারামে। এখন মিঞা হাসান নিজেই প্রৌঢ়। তার তিন বেগম, কনিষ্ঠাটি অবশ্য ক্রীতদাসী। তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে দুটি পুত্র : সুলেমান ও নিজাম। এবং বড়বেগমের পুত্র এ কাহিনীর নায়ক : ফরিদ। জন্ম : 1472 খ্রীষ্টাব্দে।^(১)

ফরিদের জীবনের সঙ্গে বেশ কিছুটা মিল আছে বাবুর-বাদশাহ-র। দুজনেই নিতান্ত বাড়িকুলের বেশে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়েছিলেন 'ইনসানিয়াৎ' নাটকের প্রথম দৃশ্য এবং শুধুমাত্র নিজ হিম্মতের পিঠে সওয়ার হয়ে পঞ্চমাস্তরের শেষ দৃশ্য দেখাছিলেন নায়ক ভামাম হিন্দুস্তানের তত্ত্ব-ই সুলেমানে আসীন। বাবুরের জেব-এ তবু একাধিকবার আঁচল আঁধুলি ছিল—তঁার খানদানী বংশ পরিচয়, পিতৃকুলে তৈমুর ও মাতৃকুলে সেরিকিস—ফরিদের তাও ছিল না ; বিলকুল নাসা ফকির। বরং বলব, ফরিদের সঙ্গে সুলেমানের সাদৃশ্য পরবর্তী যুগের মহারাষ্ট্র কুলতিলক শিবাজীর। দুজনেই বাল্য-কৈশোরে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন মায়ের কাছে—যে মা তাঁদের বাপের কাছে উদ্বেগিতা, অবহেলিতা, নির্যাতিতা।

ফরিদের মায়ের অপরাধটা অবশ্য গুরুতর। তার যৌবন চলে গেছে। সাসারামের জায়গীরদার তার প্রধান বেগম, সরিফদার পরিবর্তে যৌবনবতী দ্বাসীপত্নী কানিজার আঁচলধরা। বুঢ়াস্য জওয়ানী-এর পক্ষে কানিজার নিত্য বিশ দিন খিটিমিটি। জায়গীরদারের দৌলতখানার একান্তে এক অদ্ভুত কৃত্রিমতায় দিন গুজরান করে ফরিদ-জননী সরিফা : আর পাঁচ-বাঁদী পরিব্রতা কানিজার বিলাস ব্যসনের আদি-অন্ত নেই। শেষমেশ মনের ভেদে

ফরিদ একদিন গৃহত্যাগ করল। হাসান পুত্রকে বললে, সেই যাচ্ছই যখন, তখন তোমার আত্মজানকে সঙ্গে নিয়ে যাওনা কেন ?

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি ব্যাপের মুখের উপর ফেলে উনিশ বছরের ফরিদ বললে, যাব। মাথা গুঁজবার মতো একটা গরিবখানার এত্তেজাম করতে পারলেই এ দোজখ থেকে আত্মজানকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

শুনে হাসান ব্যঙ্গভরে যে ফার্সী ব্যাংকটা বাড়লো তার বিশুদ্ধ বঙ্গানুবাদ : 'খাকলো পরাণ সয়ে/ভাদ্দরমাসে ভাত দেব তোর ঝিঙের খোল দিয়ে।'

ফরিদ নিরঙ্কর ছিল না জালালউদ্দীন আকবরের মতো। আরবী জানতো, ফার্সীতে তো সে আলিম। গুলিস্তা, বুস্তা এবং সিকান্দার-নামাহ তার আদ্যন্ত কণ্ঠস্থ। তবু প্রথম কিছুদিন তাকে রীতিমতো মাথা খুঁড়ে মরতে হয়েছে রোজগারের ধান্দায়। কায়িক শ্রম করেছে, এমনকি মাঝে কিছুদিন দস্যুবৃত্তিও। শেষ পর্যন্ত বিহারের সুলতান বাহার খাঁ লোহানীর কিল্লায় নোকরি জুটল। বাহার খাঁ তার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর জন্য ওকে 'আতালিখ' নিযুক্ত করলেন। এই গৃহশিক্ষকতার কালেই ফরিদকে আবার একটি 'নাহর' আক্রমণ করে এবং ফরিদ তলোয়ারের এক কোণে ব্যাঘ্রপ্রবর্তিকে বধ করেন। বিহার অধিপতি লোহানী তাঁর পুত্রের গৃহশিক্ষককে ঐ খেতাবটি দেন : শের খান।

কিন্তু বেশি দিন এ চাকরি শের খাঁর কিসমতে বরদাস্ত হল না। কে কান ভাঙুচি দিল এ নিয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন—হাসানও হতে পারে। সে যাই হোক, নোকরিতে ইস্তফা দিয়ে শের খাঁ আবার পথে নামল। এই সময় সে কিছুদিন বাবুর-বাদশার ফৌজের নোকরি করে।

এর পরেই আশ্মান খুঁড়ে কিস্মতী-হুরী নেমে এল শেরের হাতে ধরা দিতে। কাশীর কাছে চুনার কিল্লার অধিপতি তাজ খাঁকে তারই যুবকপুত্র হত্যা করে বসল। সদ্যবিধবা লাদ মালিকা তার এক বিশ্বস্ত অনুচরকে পাঠিয়ে দিল শের খাঁর কাছে—সপত্নীপুত্রের হাত থেকে তাকে রক্ষা করবার আর্জি সমেত। শের সসৈন্যে চুনারে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার করলেন লাদ মালিকাকে। কৃতজ্ঞ মেয়েটি উদ্ধারকারীর হাতে কিল্লাসমেত ভুলে দিলেন কিল্লাদারনীকে !

নিকা সেরে শের ফিরে এল সাসারামে। এতদিনে মায়ের জন্য সে একটা স্বামী গোঁজার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। সাসারামের সেই জেগে জায়গীরদারের চোখে চোখে সমান মেকদারে বাথচিং করার হকদার হয়েছে চুনার কিল্লার বিজলাদার।

পুত্রকে দেখে তাজব বনে গেল সাসারামের জায়গীরদার মির্জা হাসান। বললে, ক্যা-বাং ? এ্যাদিন পরে কী মনে করে ?

ফরিদ চরিত্রিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। প্রদত্ত কক্ষের প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড তার বাল্যস্মৃতি বিজরিত। আত্মজান রীতিমতো হুড়তা বনে গেছেন এই ক-বছরে। মেজাজ কিন্তু ঠিক সেই রকম বে-সরিফর ফরিদ বললে, আত্মজানকে নিয়ে যেতে এসেছি ; তাঁকে ডেকে দিন।

ছিলে-খোলা ধনুকের মতো লাক্ষ্য দিয়ে উঠ পড়ে হাসান। বললে, আত্মা ! তোর

আম্মা ? তাকে এ্যাদিনে নিয়ে যেতে এসেছি ? আয় !

এগিয়ে এসে খপু করে চেপে ধরল জোয়ান ছেলের হাত। হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে গেল অন্দরে—হারেমের দিকে। সিঁড়ির নিচে সেই অতি পরিচিত মায়ের অঙ্গকুঠুরিতে নয় কিন্তু—হারেম-প্রাঙ্গণের একান্তে এনে একটা শিউলী গাছের দিকে আঙুল তুলে বললে, ঐ তোর আম্মাজান। যা, নিয়ে যা এবার !

এতক্ষণে নজর হল—শিউলী গাছটার নিচে একটা চৌকো পাথর। তার উপর একরাশ শিউলী ফুল ঝরে পড়ে আছে।

দাঁত দিয়ে নিচেকার চৌকটা কামড়ে বজ্রহাতের মতো দাঁড়িয়ে রইল ফরিদ। এতক্ষণে অন্তঃপুরিকার দল ভিড় করে এসেছে রঙ্গ দেখতে। দাঁড়িয়েছে ওদের বাপবেটাকে ঘিরে। তাদের অনেককেই ফরিদ চেনে না—সে গৃহত্যাগ করার পরে এরা হারেমের নয়া-আমদানী। তা সে সব দিকে ফরিদের নজরই পড়ল না...সে শুধু অবাক হয়ে ভাবছিল : কী আশ্চর্য ! জায়গীরদারের বড়ি-বেগমের কবরের উপর একটা আচ্ছাদনও দেওয়া হয়নি। রোদে জলে সমানে পুড়ছে, ভিজছে !

—কই ? উঠিয়ে নিয়ে যা—ব্যঙ্গ করলে বাপ।

ছেলে মুখ তুলে তাকালো। বাপের চোখে চোখ রেখে একই কথা বললে আবার : যাব। ওঁর মাথা গুঁজবার মতো একটা মক্কারা বানিয়ে এ দোজখ থেকে ওঁকে উঠিয়ে নিয়ে যাব।

এরপর রাজনীতির ঘূর্ণবর্তে শের খাঁ আকষ্ট নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। তিল তিল করে সে সঞ্চার করতে থাকে ক্ষমতা ও ধনসম্পদ। মায়ের জন্য মক্কারা বানানোর কথা যে তার স্মরণ ছিল না তা নয়—কিন্তু মওকা মেলেনি। সেটা হয়ে গেল নিতান্ত ঘটনাচক্রে। একজন সংবাদবহ চুনার কিল্লায় শের খাঁকে শুনিয়ে গেল এক বিচিত্রকিসসা—সাসারামের জায়গীরদারের দরবারের একটি ঘটনা :

একদিন মিঞা হাসানের দরবারে এক বৃদ্ধ আফগান এসে হাজির। এক মাথা সফেদ চুল, এক মুখ সফেদ দাড়ি। জায়গীরদারের মীর-মুনশী তাকে হুজুরে সাক্ষাৎ করে বললে, ইনিই সাসারামের জায়গীরদার ; তোমার আর্জি হুজুরে পেশ কর, জয় নেই।

লোকটি আত্মমিত হয়ে এক খানদানী সালাম ব্যাডল। বিরহে বিপলিত হয়ে বললে : আদাব অর্জ, মেহেরবান ! আমার একটি প্রশ্ন আছে খোদাবন্দ !

হাসান গৌফে চাড়া দিয়ে বললে, বেশক ! পোশ কর তোমার আর্জি ?

—সে আজ প্রায় দু-কুড়ি বছর আগেকার কথা। আপনি, হুজুর, আপনার আকাজান—তাঁর হাজার সাল বেহেস্ত-ব্যাপ মস্তুর হোক—ইব্রাহিম মিঞার হাত ধরে আফগান-রাজ্য থেকে হিন্দুস্থানে আসছিলেন। ষাইবার 'সুরঞ্জে' যেদিন আপনারা রাহি, তার পহুলারোজের সরিহানায় শামি ওস্তা-এর বাৎ আপনার যাদ হয়, গরীবপূরবর ?

হাসান তাক্সব। বৃদ্ধের প্রশ্নাদিমন্তক একবার দেখে নিয়ে বললে, কেন বল তো হে ?

—সেদিন আপনার সরিফ আক্বাজান—তঁার লাখো-বরিস বেহেত্বাস্ মঞ্জুর হোক—এই বান্দাকে ফরমায়েশ করেছিলেন, বলেছিলেন—তিনি যদি কোনোদিন হিন্দুস্থানে জায়গীরদার হতে পারেন, তাহলে আমি যেন তঁার দরবারে এত্তালা দিই ! তিনি আমাকে তঁার মক্কারা বানাবার হুকুম দিয়েছিলেন। আপনার টেংরি-গর্দা, এ বান্দার নাম আলিওয়াল খান।

হাসান দীর্ঘসময় নিম্নলিখিত নেত্রের কণ্ঠকুহরে একটি পাখির পালক প্রবিষ্ট করাতে ব্যাপৃত রইল। আলিওয়াল ধৈর্য হারালো না—দু-কুড়ি বছরের তুলনায় হাসানের নীরবতা দীর্ঘস্থায়ী নয়, সে অপেক্ষা করল। অবশেষে সোজা হয়ে বসে হাসান বললে, আমার আক্বাজান কোথায় দেহ রেখেছেন তা আমি জানি না। আর তা-ছাড়া আমার অত পয়সাও নেই যে, সখ করে তঁার জন্য মক্কারা বানাবো। তুমি এখন আসতে পার।

এবার সেই লোকটাই দীর্ঘসময় একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল হাসানের দিকে; বেচারী বোধ করি অনেক আশা নিয়ে দিল্লি থেকে এতটা পথ হাঁটতে হাঁটতে এসেছে। তাই হঠাৎ একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে বসল : মাফ করবেন, আপনি পাঠান তো ?

সরল প্রশ্ন। হয়তো সরল নয়। কিন্তু সেজন্য সাসারামের জায়গীরদারের দরবারে তার যে শাস্তির বিধান হয়েছিল সেটাও লঘুপাপে গুরুদণ্ড।

এই কিসুসাই সবিস্তারে হাসান পুত্রকে সংবাদবহ শোনালো চুনার দুর্গে। কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল শের। বললে উস্তাদ আলিওয়াল খান ? সেই যে রাজমিস্ত্রি দিল্লীর নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায়—

হ্যাঁ, সেই লোকই বটে। তখনই পাইক ছুটল লোকটাকে ধরে আনতে। চুনার থেকে সাসারাম অধারেখির কাছে একদিনের পথ। পাইককে বলা হয়েছিল মিস্ত্রিকে ধরে আনতে, সে বেঁধে নিয়ে এল বৃদ্ধ রাজমিস্ত্রিকে। শেরখাঁর আক্বাজানকে কমবজুটা জিজ্ঞাসা করেছে তিনি পাঠান কি না ! এবার জেনে নিক তার জবাব।

এল মানুষটা। বয়সের ভারে নুয়ে পড়েছে। শের খাঁকে কুর্নিশ করে বললে, জুজুর তলব করেছেন ?

কিন্লাদার আসন ভাগ করে এগিয়ে এল। বৃদ্ধের বলিরেখাকিত হজ্জের টি ধরে বললে, তুমিই উস্তাদ আলিওয়াল খান ? হজরৎ নিজামউদ্দীন আউলিয়ার দরগায়—

লোকটা আবার আভূমি নত হয়ে আদাব করল। বললে, জুজুর তাহলে আমার হাতের কাজ দেখেছেন ?

—না উস্তাদ, দেখিনি। দিল্লিতে আমি এ জিন্দেগীতে কখনও ফিহিনি। যাবার ইচ্ছে আছে। গেলে তোমার হাতের কাজ নিশ্চয়ই দেখব। কিন্তু তোমার নাম আমি শুনেছি। শোনো আলিওয়াল, পাঠানের জবানে কখনো মিথ্যে কথা হয়না। আমার বড়ি-আক্বা তোমাকে যে ফরমায়েশ করেছিলেন সেই কাজটা মূলতুবি আছে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই যে, তিনি যে নিজেকে কোন জঙ্গ-ময়দানে কুরবানি করেছেন তা আমরা কেউ জানি না। তা হোক, কিন্তু আমার আক্বাজান কোথায় শুয়ে আছেন তা আমি জানি। তুমি আমার মায়ের জন্য একটা মক্কারা কানিয়ে দেবে ? ঐ সাসারামেই ? তৎকাল জন্য পারোয়া

নেই।

তৃতীয় বার কুর্নিশ করে আলিওয়াল বললে, বে-ফিকর রহিয়ে জনাব !

আলিওয়াল শুরু করল শের খাঁর মায়ের মক্কারা। শের তখন ছুটেছে গৌড় জয় করতে। তালিয়াগড়ির (আধুনিক সাহেবগঞ্জ) প্রচলিত পথে নয়; শের জানে—সে পথে শত্রুপক্ষ ওর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত; বরং এক ঘুর পথে। সেই অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত হয়ে গেল গৌড়াধিপতি মাহমুদ শাহর বাহিনী। বহু উপটোকন দিয়ে মাহমুদ শেরের বশ্যতা স্বীকার করে নিল।

গৌড়-বিজয় ফতে করে বহু ধন-দৌলত হাতির পিঠে চাপিয়ে শের খাঁ ফিরে এল সাসারামে। এসে সংবাদ পেল, ইতোমধ্যে আলিওয়াল শেষ করেছে তার মায়ের মক্কারা। ঐ সঙ্গে পেল আর একটি দুঃসংবাদ—সাসারামের জায়গীরদার, মিঞা হাসান, নাকি এ কয়মাস ক্রমাগত তড়পাচ্ছে—'দেখব সে চুহাকা-বাচ্চা কত বড় শের খাঁ ! আমার কিল্লার ভিতর থেকে আমার বিবির কাফিন সে উঠিয়ে নিয়ে যাবে ! জান খাকতে নয়।'

দুঃসংবাদে বে-দিল হল না শের। বললে—হাসান-হুসেনের সে লড়াই কাজিয়ার কথা পরে হবে। আপাতত চল আলিওয়াল—দেখি, ভূমি কেমন মক্কারা বানিয়েছ।

দেখে মুগ্ধ হল শের খাঁ। লেদী-সৈয়দী শৈলীতে বানানো অষ্টভুজাকৃতি ইমারৎ। অপূর্ব ওস্তাদের হাতের এলেমদারী কাজ। বললে, একটা কথা আলিওয়াল, ছজ্জাটা একটু বেশি বড় হয়ে গেছে না ?

সাদা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বৃদ্ধ স্থপতি বললে, জী হাঁ হুজুর ! বে-ইঁসিয়ারী কাজ নয়, ওটা ইচ্ছে করেই বড় করেছি। বেগম-সাহেবা আজ ক'বছর সাসারামের রোদে পুড়েছেন। কোন ছাউনি ছিল না তো ! তাই রোশনাই আর ওঁর বরদাস্ত হবে না।

—ঠিক কথা, আলি ! ও-কথা আমার যাদ ছিল না। কিন্তু সন্দেখ ভূমি একটা বানিয়েছ কেন ? পাশাপাশি দুটো হওয়ার কথা যে।

তৎক্ষণাৎ সমঝে নিল ওস্তাদ। বললে, সরিফ বাৎ খোদাবন্দ ! ও-কথাটা আবার আমার যাদ ছিল না। খ্যয়ের, ব্যস্ত হবেন না, এখনই শুধরে দিচ্ছি।

শের খাঁ এদিকে খলিফা। ব্যপের কাছে সে আদৌ গেল না দরবার করতে, বরং ঘরে পড়ল সাসারামের জাম-ই-মসজিদের বড়া ইমাম সাবকে। অশীতিপুর বৃদ্ধ বড়া-ইমাম পাকড়াও করে নিয়ে এলেন মিঞা হাসানকে। অনিচ্ছাসম্মত হাসানকে আসতে হল—ক্ষুদ্র সাসারাম শহরের চৌহদ্দীতে সে নবাব, কিন্তু শরিফাতা শাসনে বড়া-ইমাম সাবকের প্রজা। এল, তবে শ্রেফ এক কড়ারে—বিবিজামের কাফিন সে স্থানান্তরিত হতে দেবে না কিছুতেই।

বড়া-ইমাম হাসান-মিঞাকে সঙ্গে নিয়ে মক্কারাটা ঘুরে ঘুরে দেখালেন। শের খাঁ নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে রইল দ্বার প্রান্তে। সব দেখে শেষ করে হাসান-মিঞা বড়া ইমাম-সাবকে একটা জবাব প্রশ্ন পেশ করল, একটা কথা মালুম হল না। সন্দেখ দুটো কেন ?

বড়া-ইমাম ঠা ঠা করে ঝলমঝলি চুমড়ালো, তসবি ঘোরালো, চোখ পিট-পিট করল, কিন্তু ছবাব দিল না।

হাসান বিরক্ত হয়ে বলে, কী হল ? জবাব দিলেন না কেন ? সন্দেহ দুটো কেন ? ও চুহা-কা-বাচ্চাটার একটাই তো মা ?

বড়া-ইমাম এতক্ষণে জবাব দিল, এটা নেহাৎ বে-অকুফের মতো কথা বলেছি মিঞা হাসান ! কী জবাব দেব ? উপযুক্ত পুত্র কখনো শুধু মায়ের মকবারা বানায় ? বাপকে বাদ দিয়ে ? তুমি দেখে নিও হাসান, তোমার এই ছাওয়াল একদিন আমাম হিন্দুহানের তক্ত-তৌসে বসবে । তখন দেশ-বিদেশ থেকে মানুষজন ভিড় করে দেখতে আসবে শাহু-য়েন-শাহু শের শাহু শূরের আক্বাজানের মকবারা ।

'হাসান'-এর আর 'সান' নেই, বিলকুল-'হাঁ' !

পুত্রের দিকে ফিরে বললে, আই বে-অকুফ ! বড়া-ইমাম-সাব যা বলছেন তা হ'ক কথা ? ঐ বাঁ-দিকের সন্দেহটা তোর বাপের ?

শের বললে, বড়া ইমাম সাব আমাম জিন্দেগীতে বে-হক বাৎ কখনও বলেছেন ? তবে বাঁ-দিকেরটা নয়, ওটা মায়ের, ডান দিকেরটা আমার আক্বাজানের ।

হাসান একগাল হেসে বললে, তাহলে হাসান-হুসেনের কাজিয়া খতম ! তুইই ফতে করেছিস । আর বান্দর ! বাপ-বেটায় ধরাধরি করে তোর মায়ের কাফিনটা বহে নিয়ে আসি ।

শের তার বাপের হাঁটু দুটো ধুয়ে বললে, গোস্তাকি যদি করে থাকি, তওবা মকুব করে দাও ! আক্বাজান ! কীধ দিতে হবে না, তুমি শুধু হুকুম দাও । আক্বাজানের কাফিন একাই বহে নিয়ে আসার হিম্মৎ রাখে তোমার এই অযোগ্য বান্দা ।

হাসান ওর পিঠে একটা বিরানি-সিক্কা থালড় মেরে বললে, তা তুই পারিস্ । চুহা কা-বাচ্চা হলে কি হয়, তুই নিজে যে শের !

শের যাঁ যে কালবৈশাখী মেঘের মতো ইশান-কোণে দিন দিন স্ফীত হচ্ছে এটা মালুম হতে দেবী হল না হিন্দুহানের তদানীন্তন মালিক বাবুর-তনয় হুমায়ুনের । নটে গাছটি মুড়িয়ে দেওয়া চাই । হুমায়ুন দিল্লি থেকে বাদশাহী ফৌজ নিয়ে এসে অবরোধ করল চুনার কিল্লা । কিন্তু শের যাঁ অতি খলিফা—এ আশঙ্কা তার ছিলই । তাই ঐ দু'এদের পূর্বেই স্থানান্তরিত করেছে, অনেক দিনের রসদ মজুত রেখেছে ; আর কিল্লা-শরকার দায়-দায়িত্ব একজন সিপাহ-সালারকে সমঝিয়ে দিয়ে নিজে থেকেই দুর্গের বাহিরে । ঐতিহাসিকেরা বলছেন, এখানেই হুমায়ুনের দাবার চাল এড়ান গিয়েছিল শের—ঘোড়ার আড়াই পায়ের ভিঙি-মারা চালে । চুনার কিল্লা অবরোধ করে খে-কয়মাস হুমায়ুন শক্তিক্ষয় করলেন, সেই কয় মাস দুর্গের বাহিরে অবস্থিত শের যাঁ ক্রমাগত শক্তিবৃদ্ধি করে গেল ।

সেই বছরই সাহাবাদ পরগণায় অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ হয় । বিচক্ষণ প্রশাসক শের যাঁ সেই বৃদ্ধ স্থপতিবিদকে ডেকে বললেন, ছাওয়াল, এবার আমার নিজের জন্য একটা মকবারা বানাও । শুধু ইমারৎ নয়, গৌরব করবে হবে প্রকাণ্ড এক ভালাও—তার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে ঐ মকবারা, বীশের মতো । দেখলে মনে হবে নিচু প্রতিবিশ্বের দিকে

তাকিয়ে নিশুপ বসে আছে : নার্গিস্ !

—নার্গিস্, হুজুর !

—হ্যাঁ, নার্গিস্। তুমি দেখেছ সে ফুল ?

মাথা চুলকে আলিওয়াল বললে, হয়তো দেখেছি খোদাবন্দ, ওয়ার্না কেউ পছন্দানিয়ে দেয়নি।

শের বললেন, বিশ্বজয়ী ম্যাসিডোনিয়ার শাহ্-এন শাহ্ সেকেন্দার শাহ্-র নাম শুনেছ ?

আলিওয়াল এবারে স্পষ্টই মাথা নাড়ে। নামটা তার অজানা।

—তাদের দেশে একটি সুন্দর উপকথা আছে—নার্গিস্ ফুল নিজের মহক্বতে বাওরা ! দরিয়া-কিনারে ফোটে সেই ফুল—নার্গিসাস্, দুনিয়াকে সে চেনে না, তার মহক্ব শুধু নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি। পারবে ?

আলিওয়াল তাজব বনল জঙ্গী জওয়ানের এ জাতীয় কাব্যোচ্ছ্বাসে। শুধু বলল, পারব হুজুরালী।

ফিরে যাবার জন্য পা বাড়াতেই শের তাকে ফিরে ডাকলেন। বললেন, শোন আলিওয়াল, ভিতরের কথাটা খুলে বলি। কাব্য নয়, নিতান্ত কেজো-ভূমিকা—ঐ মহক্বারার পরিকল্পনায়। প্রকান্ত তালাও যদি বানাও তাহলে এক সঙ্গে দু-পাঁচ হাজার মেহনতি মানুষ কাজ করতে পারবে, খেঁষাঘেঁষি হবে না। দিঘির চারপাশ ঘিরে বানাও অস্থায়ী ছাপরা। ওখানেই এসে আশ্রয় নেবে পাঁচ গাঁয়ের নিরন্ন মানুষ—জরু, গরু, কালবাচ্চা নিয়ে। কাটিয়ে দেবে গোটা বছরটা—সেই পরের বছর পর্যন্ত, যতদিন না খোদা-তালা এদের দুঃখে আশ্মান-ভেঙে কঁাদবেন ! দুর্ভিক্ষ-পীড়িত ইনসানিয়াতের জন্য আমি রাজ-শস্যভাণ্ডার খুলে দেব—লেকিন, ইসিয়ার। ভুখা-মানুষ যেন ভিখ্ না মাঙে ! পসিনার বিনিময়ে মেহনতি মানুষকে ক্ষুধার অন্ন দেব আমি ? বুঝলে ?

আলিওয়াল আভূমি নত হয়ে কুর্নিশ করেছিল শুধু।

এর পরেই বঙ্গার যুদ্ধ। মুগল-পাঠানের দ্বৈরথ-সমর। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত হার হল হুমায়ুনের। বাবুর বাদশাহর এই জ্যেষ্ঠ পুত্রের দুর্ভাগ্যের মূলে কী ছিল, এ নিয়ে ঐতিহাসিক নানান মুনির নানান মত। আমার তো মনে হয়েছে—আমোদপ্রিয়তা নয়, অহিফেনসেবা নয়, এমনকি সোপানশীর্ষ থেকে অতর্কিত পদস্বলনও নয়—হুমায়ুনের দুর্ভাগ্যের মূলে আছে তাঁর পিতৃসত্যের প্রতি একনিষ্ঠতা। অস্তিম-শয়ানে শায়িত বাবুর-বাদশাহ একদিন তাঁর উপযুক্ত পুত্রের হাত ধরে বলেছিলেন—'বড় বড় সাম্রাজ্যের পতনের মূলে আছে সত্যবিরোধ। তাই এই আখরি আদেশ দিয়ে যাই, তোমার ভাইদের শত অপরাধ ক্ষমা কর।' হুমায়ুন সেই পিতৃসত্য অন্ধরে-অন্ধরে পলিন করে গেছেন। তিন ভাইকে করে দিয়েছিলেন তিন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। আর তারা বারে বারে সুযোগ পেলেই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছে। হুমায়ুন তাদের বারে বারে পর্যুদন্ত করেছেন, বন্দী করেছেন এবং অস্তিম্বে মুক্তি দিয়ে আবার অন্য অঞ্চলের-শাসনকর্তা করেছেন। তিন ভাই দূরে সরে গিয়েই, প্রাদেশিক শাসনকর্তার লাভ করেই, দূর থেকে হেঁকেছে : ও কুমীর তোর

জলকে নেমেছি।

এই শেষ সংগ্রামেও হুমায়ুন তিন ভাইয়ের কাছে দূত পাঠালেন সৈন্য চেয়ে। তারা তিনজন নির্বিকার। মুন্সেরের কাছাকাছি এই যুদ্ধে পাঠানের কাছে চূড়ান্ত হার হল মুগলের। হুমায়ুনের অধিকাংশ সৈন্য সলিল সমাধি লাভ করল গঙ্গায়। এক অখ্যাত ভিত্তিওয়ালার অনুগ্রহে তার ভিত্তি আঁকড়ে হুমায়ুন গঙ্গা পার হয়ে পালালেন। এই প্রসঙ্গে প্রামাণিক ইতিহাসের একটি অনুচ্ছেদ অনুবাদ করে শোনাই, তাতে শের শাহর চরিত্রে কিছুটা আলোকপাত হবে^{৩৩} :

“ঐতিহাসিক ঐক্যনের অনুমান হুমায়ুনের আট হাজার সৈন্য হত হয়, অর্ধেক প্রত্যক্ষ যুদ্ধে, অর্ধেক গঙ্গা গর্ভে। হুমায়ুনের হারেমের প্রতি শের খাঁর ব্যবহার শেষোক্তের চরিত্রে এক অপূর্ব মহিমা আরোপ করে। যুদ্ধে হার হয়েছে জেনে হুমায়ুনের মহিষী* অন্যান্য মহিলাদের নিয়ে পর্দার বাহিরে এলেন; সংবাদ শ্রবণে শের খাঁ সসম্মানে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবরোধ করে মহিলাবৃন্দকে সশ্রদ্ধ অভিবাদন করেন। নবীবকে ডেকে আদেশ করলেন ঘোষণা করতে—কোনো আফগান যেন মুগল মহিলাবৃন্দের প্রতি কোনো রকম অসম্মানজনক আচরণ না করে। করলে, তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। শের খাঁর এমনই দাপট ছিল যে, বিজিতের মহিলাবৃন্দ বিজয়ী সৈন্যদলের লুণ্ঠের সম্পদ ইওয়ার প্রচলিত প্রথা সত্ত্বেও কোনো আফগান সাহস করেনি বন্দিনীদের গাত্রস্পর্শ করতে। সন্ধ্যার পূর্বেই বিস্তৃত খিদ্মৎগারের দল ঐ হতভাগ্য মহিলাবৃন্দকে শের খাঁর হারমে পৌছে দেয়। এবং আহর পানীয়ের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে।”

এই প্রসঙ্গে আরও স্মর্তব্য : এই ঘটনার বত্রিশ বছর পরে আকবর বাদশাহ একটি বাদশাহী ফরমান জারী করেন : পরাজিত শত্রুদলের স্ত্রীকন্যাদের উপর কোনো মুগল সৈন্য কোনো রকম অত্যাচার করলে তার কঠিন শাস্তি হবে।^{৩৪} খবরটা ইতিহাসের ছাত্রদের কাজে লাগতে পারে—শের ও আকবরের চরিত্রের তুলনামূলক সমালোচনার সময়। স্থাপত্যের ছাত্রদেরও কাজে লাগতে পারে—শের ও আকবরের স্থাপত্যে একটা আশ্চর্য পৌরুষের ব্যঞ্জনা আছে, সেই ইমারৎগুলি যেন সোচ্চারে ঘোষণা করতে চায়, তাদের জনক ঐ জাতের কাপুরুষতার—পরাজিত সৈন্যদলের স্ত্রীকন্যাদের উপর ন্যূনতম অত্যাচার—সামিল হতে পারে না।

যুদ্ধান্তে বিজয়ী শের ফিরে এলেন সাসারামে। দেখলেন, সাদ্যস্বামী নিজের সমাধিসৌধ। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বললেন, আলিওয়াল, তুমি ঝামাল করেছ! যে মক্কারা বানিয়েছ তা হিন্দুস্থানে অভূতপূর্ব। বল কী ইনশাআল্লাহ?

আলিওয়াল তিনবার কুর্নিশ করে বললে, খোদার কাছে খুশ হয়েছেন, এই তো আমার

* আবুল ফজলের মতে (আকবর নামা-১৩৩) এই মহিষী হচ্ছেন হাজী বেগম, যিনি ‘হুমায়ুন ট্যু’ বানিয়েছেন দিল্লিতে। অর্থাৎ উক্ত কানুনগোর মতে তিনি বগা বেগম। স্মর্তব্য, হুমায়ুন তখনও আকবর-জননীকে বিবাহ করেননি।

ইনাম।

—শোনো আলিওয়াল ! আমি দিল্লী চলেছি ; হয়তো তামাম হিন্দুস্থানের তন্ত-ই-সুলেমানে বসব ; দিল্লিতে অনেক-অনেক, অনেক ইমারৎ বানানোর বাসনা আছে আমার। হয়তো অসমাপ্ত আলি-মিনার গেঁথে শেষ করব ! কুৎসের চেয়েও যা বৃহত্তর ! তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?

আলিওয়ালের কোটরগত স্বপ্নালু চোখ দুটি শেষ বারের মতো চক্‌চক্ করে উঠল। যেন পোপ প্রশ্ন করছেন মিকেলান্জেলোকে—অসমাপ্ত সেন্ট পীটার্স শেষ করার দায়িত্ব নেবে তুমি ? *

তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, আমার জন্মনা খতম হয়েছে গরীবপরবর ! আমি বৃদ্ধ। এই সাসারামেই জিন্দেগীর ব্যাকি কটা দিন গুজরান করতে চাই।

শের বললেন, বেশ, তবে তাই হোক। তাহলে এই সাসারামেই বানাও আর একটা মক্‌বারা—তোমার পসন্দ-মোতাবেক।

আলিওয়াল একটু অবাক হল। ইতস্তত করে বলল, শাহ্-য়েন-শাহ্ ! পিতা-মাতার মক্‌বারা বানিয়েছেন, জওয়ানী না খোয়াতেই নিজেরটা বানিয়ে রাখলেন দুর্ভিক্ষ ঠেকাতে ; কিন্তু এবার কার মক্‌বারা বানাতে চাইছেন ? শাহ্‌জাদারা তো নিতান্ত নাবালক।

শাহ্-য়েন-শাহ্ ! এ সম্বোধন এখনো কেউ করেনি বঙ্গারযুদ্ধ-বিজয়ী শের খাঁকে। আলিওয়াল শিল্পী-শিল্পীরা না সমকালের চেয়ে দু-কদম এগিয়ে থাকে ? সকৌতুকে শের খাঁ হেসে বললেন, সে যে কে, তা এখনই তোমাকে বলতে পারছি না উস্তাদ ! মক্‌বারা তৈরী খতম হক, তারপর বলব।

ফুর হল আলিওয়াল। ইতস্তত করে বললে, গোস্বাকি মাফ করবেন জাঁহাপনা। আপনার আব্বাজানের মক্‌বারা বানিয়েছি ;—দুঢ়মূল, উন্নতশির, জায়গীরদারের চরিত্র সে ইমারতে প্রতিফলিত ; আপনার মক্‌বারা আপনারই মতো হুগলোয়ার বাইরে আত্মনিমগ্ন, আপনিই বলেছেন, সে 'নার্গিস'। लेकिन এবার—

হক বাৎ ! শের খাঁর মালুম হল শিল্পীর সমস্যাটা। মক্‌বারা তঁর স্থাপত্যের ভিতর দিয়ে উৎসর্গীত-প্রাণের স্বাক্ষর রাখতে চায়। কার সমাধিসৌধ বানাতে হবে না জানলে ওর ধ্যানের দৃষ্টিতে কেমন করে ধরা দেবে সে ইমারৎ ? শিল্পীর স্বপ্ন জলভরা বর্ষার লঘুপক্ষ মেঘের মতো ভেসে ভেসে যাবে, শরৎকালীন কিউমিউলাসের মতো স্তরে-স্তরে, স্তবকে-স্তবকে দৃঢ়তা লাভ করবে না। শের বললেন, কাছে এস আলিওয়াল—তোমার

* প্রসঙ্গত : ইতিহাসের একটা কৌতুক কিন্তু প্রায় সমকালীন। মিকেলান্জেলোকে পোপ সেন্ট পীটার্স সমাপ্ত করতে বলেন 1538 খ্রীষ্টাব্দে। শের শাহ্ জয়্যাত হন 1548।

কানে কানে বলব !

সভয়ে এগিয়ে এল বৃদ্ধ শিল্পী। শের অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, ইঁশিয়ার 'তার কথা কেউ জানে না, মায় বেগম-সাহেবা পর্যন্ত নন ! তার নামটা তোমাকে এখনই বলতে পারছি না, তবে এইটুকু জেনে রাখ : সে আমার দিল্কা কলিজা ! যার জন্য বলতে পারি

অগর্ অন্ তুর্ক-ই সিরাজী বদন্ত আর্দ দিল্-ই-মারা।

ব-খাল-ই হিন্দোওশ্ বখ্‌সম্ সমরকন্দ্-ওয়া-বুখারারা ॥*

বজ্রাহত হয়ে গেল বৃদ্ধ শিল্পী। শের খাঁর জীবনে যে এমন একটি অনুদৃষ্টিতে অধ্যায় আছে—তিনি যে এমন একজন সুন্দরী সাকীর মহকতে দিওয়ানা তা তো কাক-পক্ষীতেও কখনও অনুমান করেনি।

ইতিহাস এগিয়ে চলেছে।

সাহাবাদ জেলার নগণ্য জায়গীরদার শের খাঁ এবারে চলেছেন দিল্লির পথে। এলাহাবাদ, জৌনপুর, আগ্রা, দিল্লি। অবশেষে তামাম হিন্দুহানের তত্ত্ব-তাউস ! অপ্রতিরোধ্য শের খাঁর শেষ সাফল্য। হুমায়ুন তখন গাঙ্গের উপত্যকা পার হয়ে, সিদ্ধ পার হয়ে, খাইবার পাস দিয়ে কাবুলের পথে পালাচ্ছেন। তাঁর হারেম পড়ে আছে শের খাঁর হেপাজতে।

মাত্র পাঁচ বছর দিল্লীধ্বংস ছিলেন ঐ আশ্চর্য সুলতান—শের শাহ শূর। তুলনায় আকবর ছিলেন ঊনপঞ্চাশ বছর, শাহজাহাঁ একত্রিশ বছর, আলমগীর ঊনপঞ্চাশ বছর। অর্থাৎ এই পাঁচ বছরে শের শাহ যে স্থাপত্যকীর্তি ও পুরাকীর্তি রেখে গেছেন তা শুধু বিশ্বায়ক নয়, তা ঐন্দ্রজালিক। পুরানা-কিল্লার অসংখ্য ইমারৎ, বিশেষ করে তার অভ্যন্তরস্থ কিল্লা-ই-খুন্হা মসজিদ। পঞ্জাবে বিলাম নদীর তীরে রোহতাশ দুর্গ। আর সবার উপরে, না, অসমাপ্ত আলাই-মিনার শেষ করেননি, তবে তার চেয়েও বড় কীর্তি গড়ে গেছেন। কুৎব-মিনারের চেয়েও বড় মিনার বানাবার স্পর্ধায় ঐ একই চতুরে বৃহত্তর আলাই মিনার বানাবার স্বপ্ন দেখেছিলেন সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী। শুরু করেছিলেন কাজ, কুৎব-এর দ্বিগুণ ব্যাসের বনিয়াদ ও ভিত্তি। একতলার চেয়ে বেশি গাঁথা যায়নি। রাবণের অসমাপ্ত সিঁড়ির মতো হাড়-পাঁজরা বার করে সে পড়ে আছে কয়েক শতাব্দী ধরে। সেই সাহস পায়নি তাতে নতুন করে পাথর বসাতে। প্রথম যৌবনের দার্দ্র্যে সেটাকেই গাঁথে তুলবার কথা বলেছিলেন শের শাহ : কিন্তু তত্ত্বতাউসে আসীন হয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিটাই গেল বদলে। তাই গড়ে তুললেন অপর একটি স্থাপত্য কীর্তি, যা কুৎব কেন, আলাই মিনারের স্বপ্নকেও পিছনে ফেলে গেছে : সোনারগাঁও থেকে লাহোর পর্যন্ত বিস্তৃত বাদশাহী সড়ক, গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোড। প্রতি পাঁচ-দশ কিলোমিটার অন্তর তৈরী করালেন

* তুর্কী-দেশের সুন্দরী সে, আমার সাকী সিরাজী

যাহার লাগি বাওরা হল হাজার হাজী রাজী

যার কপোলের ক্রমর-কালো কিল্ল-এর তরে বান্দা

সমরকন্দ্ ও বুখারারাও বিকিয়ে দিতে বুঝ রাজী ॥ (হাফিজ)

আশ্রয়ের জন্য সরাইখানা, পানীয়ের জন্য কূপ-তালাও-বাওলী, উপাসনার জন্য মসজিদ। মাঝে মাঝে নিঃসঙ্গ মিনার—'অবজারভেশন টাওয়ার।' আর দ্রুতগামী অশ্বারোহীর মারফতে ঘোড়ার 'ডাক'। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থানে আস্তাবল, অশ্বের আশ্রয়, বদলী-ডাকবাহী, ডাকঘর। সব কিছুর শুরু ও শেষ মাত্র পাঁচ বছরে।

শের শাহর স্থাপত্য কীর্তি ত্রিধারায়। ভৌগোলিক বিচারে। প্রথমত, সাসারামে গুটিতিনেক মক্কারা, যার প্রধানতম হচ্ছে নিজের সমাধিসৌধ। দ্বিতীয়ত, রাজধানী দিল্লিতে পুরানা-কিল্লা সংলগ্ন অনেকগুলি ইমারৎ। তৃতীয়ত, বঙ্গাল থেকে পঞ্জাব-তক্ বাদশাহী-সড়কের ধারে ধারে গণনাতিত স্থাপত্যকীর্তি—যেখানে স্থাপত্যকে ছাপিয়ে উঠেছে প্রয়োজনের তাগিদ।

সাসারাম পর্য্যয়ে যাবতীয় কীর্তির মূল নিয়ামক আলিওয়াল খান। তাদের মূল ছন্দ একটি সমবাহুর অষ্টভুজ। এই প্ল্যানিং একটি দীর্ঘ ঘরানার বিবর্তন-ধারায় পুষ্ট—জেরুসালেমের 'ডোম-অব-দ্য-রক' আছে তার উৎসমূলে; লোদী ও দৈয়দ জমানায় সেই ঘরানার নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে।

তব্বের পৃষ্ঠা-'ম'-কারের মতো ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের মূলে আছে তিনটি 'ম' : মসজিদ, মক্কারা ও মকান। প্রথমটি পারত্রিক, শেষেরটি ঐহিক, মাঝেরটি ঐ দুইয়ের সংক্ৰমণধর্মী। মসজিদের পরিকল্পনা শরিয়তী বিধি-বিধানে সুনির্দিষ্ট। সেটি হবে আয়তক্ষেত্র, পূর্বমুখী, তার পশ্চিমের প্রাচীরে 'ইবান', তাতে 'মিহরাব', মিহরাবে 'কিবলা'র চিহ্ন—মক্কার দিক নির্দেশ করে। তিন দিকে 'লিয়ান', শেহানের মাঝখানে অজুর জন্মধার, আজানের জন্য মিনার অথবা মিন্যরিকা।

মক্কারার পরিকল্পনায় স্থপত্যিকে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ভূমি নকশায় তা হতে পারে বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র, ষড়ভুজ বা অষ্টভুজ। লিয়ান, গুলদস্তা, ছত্ৰী, গম্বুজ তাতে কী থাকবে, কী থাকবে না তার কোনো বাঁধাধরা নির্দেশ নেই। বর্মীয় নির্দেশ শুধু এইটুকু :

মৃতদেহ থাকবে ভূগর্ভে একটি কক্ষ, কবরের তলায়। ঠিক তার উপরে, সচরাচর প্লিন্থ সমভলে, নির্মিত হবে আর একটি কক্ষ—'কুদ্রাহ'। তার কেন্দ্রহলে—ভূগর্ভস্থ কবরের ঠিক উপরে—নির্মিত হবে একটি অনুরূপ শূন্যগর্ভ কবর-প্রতিম। ইসলামী স্থাপত্যে তার নাম 'সন্দোখ' বা 'জারিহ'। ইংরাজিতে 'সেনোটাস' বলতে পারি। বাঙালীয় তার পরিভাষা আমার জানা নেই। তবে ঐ 'সন্দোখ' থেকে বাঙলায় স্থার একটা সিন্দুক উপর হয়েছে : সিন্দুক বা সিদ্ধুক। কবরে মৃতদেহ চিৎ হয়ে শোবে না—শোখ পাশ ফিরে। মাথা থাকবে হয় উত্তরদিকে, অথবা দক্ষিণে। উত্তরদিকে মাথা বরাবর দেহ থাকবে ডহিনে পাশ ফিরে, দক্ষিণ দিকে শিয়র করলে বাঁয়ে পাশ ফিরে—যাতে অনিবার্যভাবে সে পশ্চিমদিকে মুখ করে থাকতে পারে অনন্তকাল। ঐ কক্ষে ছাতি পশ্চিম দেওয়ালে গড়ে তোলা হয় একটি কুলঙ্গির মতো অলঙ্করণ, 'মিহরাব' যার গায়ে মক্কার দিক-নির্দেশক 'কিবলা'র চিহ্ন। ক্ষেত্রবিশেষে— বড় জাতের মক্কারার মূল সৌধের পশ্চিমে— একটি পৃথক মসজিদও গড়ে তোলা হয়, যেমন আছে সেরমহলে।

মাসারাম পর্যায়ের তিনটি মক্কারাই অষ্টভুজাকৃতি। এটি জেরুসালেমের 'কুবেৎ-এস সাক্কারাহ'-র (ইংরাজিতে 'ডোম-অব-দ্য রক' নামে বিখ্যাত) অনুসরণে। স্থাপত্যের অন্যতম মৌলিক সমস্যা হচ্ছে চতুষ্কোণ কক্ষের উপর গোলাকৃতি গম্বুজ বানানো। তারই একটি সহজ সমাধান করেছিলেন ওমায়্যিদ বংশের খলিফা আবদুল মালিক (685-703) জেরুসালেম মসজিদে (চিত্র 1)।—সমবাহুর অষ্টভুজে যার বহিরাবরণ বিধৃত। আটটি কোণার বিপরীতে আটটি 'পায়ার' (B. চিহ্নিত)। ভিতর দিকে চারটি 'পায়ার' (C) এবং তাদের ফাঁকে-ফাঁকে তিনটি করে স্তম্ভ (D-চিহ্নিত) একটি গোলাকার রূপ নিয়েছে। তাদের উপরেই উঠেছে প্রাচীর, উপরিস্থিত গম্বুজটি ধরে রাখতে।

আটকোণা দেওয়ালে গোলাকৃতি গম্বুজ ধারণের এই সহজ সমাধানটা কিন্তু ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে অনুকৃত হয়নি। দাস বংশের দ্বিতীয় সম্রাট ইলতুমিস্ তাঁর নিজের সমাধিতে (কুৎব-চত্বর, দিল্লি) ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য প্রথম গম্বুজটি যখন বানাতে চাইলেন, তখন তিনি অষ্টভুজাকৃতি বহিরাবরণ অনুমোদন করলেন না—সমাধিসৌধ হল চতুষ্কোণ। প্রাক-ইসলাম ভারতীয় স্থাপত্যে গম্বুজ ছিল না—স্থানীয় স্থপতি যেভাবে তার সমাধান করতে চাইল স্থাপত্যের ভাষায় তার নাম স্কুইঞ্চ (squinch)। চারটি কোণায় চারটি কড়ি (আর্কিট্রেভ বা বীম) পাতা হল, যাতে আভ্যন্তরীণ কোণটা হল 135° ; ঐ বীমকে তিনভাগ করে দু-পাশে আবার দুটি বীম পাতা হল যাতে আভ্যন্তরীণ কোণগুলি হল $157\frac{1}{2}^\circ$ । এতক্ষেণে চারকোণা ঘরটি ষোলো কোণায় রূপান্তরিত হয়েছে। তারই উপর গেঁথে তোলা হল গোলাকৃতি গম্বুজ। কোণায় কোণায় নয়নাভিরাম স্ট্যালাকটাইট গড়ে মনমুগ্ধকর রূপারোপ করা হল। ভাষায় যা ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি তা চিত্র 2-এ ঐকো বোঝাবার চেষ্টা করেছি। এটি সম্রাট শের শাহ্ নির্মিত পুরানা কিল্লার 'বুন্হ' মসজিদ থেকে। এই স্কুইঞ্চ পদ্ধতি কিন্তু ইসলাম আবিস্কার করেনি, অনুকরণ করেছে মাত্র—বাইজেন্টাইন স্থাপত্য থেকে। তারাও মূল আবিস্কারক নন। সম্ভবতঃ এর আদিম আবিস্কারক সাসানিয়ানরা। তাদের তৈরী স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে নির্মিত একটি গম্বুজ তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দ থেকে টিকে আছে, যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত আদিমতম ভারতীয় স্কুইঞ্চটি তারসাম্য রক্ষা করতে পারেনি।

অষ্টভুজাকৃতি ইমারৎ ভারতবর্ষে প্রথম নির্মিত হল—খুব সম্ভবতঃ খিজুরীজ শাহ তুঘলকের প্রধানমন্ত্রী খান-ই-জাহান তিলাঙ্গানীর মক্কারায়। স্মৃতিস্তম্ভিত মুসলমান—নাম, মকবুল খান; সাকিন, দাক্ষিণাত্যের তেলেঙ্গানা। তাঁর মক্কারা কোন স্থপতিবিদ ডিজাইন করেছিলেন, ইতিহাস তা লিখে রাখতে ভুলেছে—কিন্তু এইটাই বোধ করি 'ডোম-অব-দ্য রকের' প্রথম ভারতীয় রূপান্তর। স্থাপত্য-ইতিহাসে এ এক চিহ্নিত সম্পদ।

এখানে কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার কারিগরীটুকুই শুধু গ্রহণ করা হয়েছে; আপাতদৃষ্টিতে মোকাম সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী। জেরুসালেম মসজিদে বাহির দিকে ছিল রুদ্ধ প্রাচীর, তিলাঙ্গানীর মক্কারায় বাহিরে রইল অলিন্দ; ভিতরে অষ্টভুজাকৃতি মূল কক্ষ। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এ

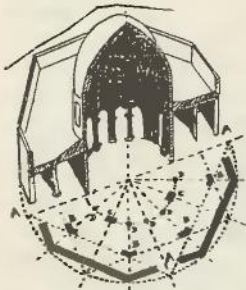
ইমারৎ এখন ভগ্নদশায়। তা-হোক, তিলাদানীর মক্বারাতে যে নতুন চিত্তাধারা জন্মগ্রহণ করল—চতুষ্কোণ সমাধিকক্ষের অষ্টভুজাকৃতি রূপগ্রহণ, তা স্থাপত্যের একটি বিশেষ ধারায় বিবর্তিত হতে শরু করল। বিবর্তনের ধারাটি সংক্ষেপে নিম্নোক্ত রূপ :

নাম	চিত্র	অবস্থান	যুগ	সময় (আঃ)
ডোম অব দ্য রক	চিত্র 1	জেরুসালেম	ওমায়িয়দ	670
খান-ই জাহান তিলাদানী	—	দিব্লি	তুগলুক	1370
মুবারক শাহ্ সৈয়দ	চিত্র 3	ঐ	সৈয়দ	1434
মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দ	—	ঐ	ঐ	1444
সিকান্দার লোদী	চিত্র 4	ঐ	লোদী	1517
হাসান শূর	—	সাসারাম	শূর	1530
শের শাহ্ শূর	—	ঐ	ঐ	1534
ঈশা খাঁ	চিত্র 5	দিব্লি	ঐ	1547
আধম খাঁ	চিত্র 6	ঐ	আকবর	1561

ওমরের জেরুজালেম ইমারতের ভারতীয় রূপান্তরকরণে খান-ই জাহান মক্বারায় যে পরিবর্তন করা হয়েছিল—অর্থাৎ কক্ষ ও অলিন্দের স্থান পরিবর্তন এবং একটি ছজ্জার প্রবর্তন, সেটি পরবর্তী প্রত্যেকটি উদাহরণে অনুসৃত। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ভিতরে অটিকোণা মূল সমাধিকক্ষ বা 'গম্বুজা', আর তার বাহির দিয়ে অষ্টভুজাকৃতি অলিন্দের অটিকোণায় আটটি প্রায়স্তম্ভ (pier) এবং তাদের মাঝখানে তিনটি করে খিলান।

মুবারক শাহ্ সৈয়দের পরিকল্পনাকার ছাদের আটপ্রান্তে আটটি ছত্রী গাঁথে তুলেছেন, কুর্সি (ভিত বা plinth) যথেষ্ট উঁচু। তবু বিস্তারের আপেক্ষিকে উচ্চতা যথেষ্ট না হওয়ায় গোটা ইমারৎ নয়ন্যভিরাম হয়নি। গম্বুজটির কোনো ভিত্তিমূল বা 'গম্বুজ-কুর্সি' না থাকায় তা যেন অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। (চিত্র 3) ভূমি-নকশায় (প্লানে) জ্যামিতিক বিন্যাসছন্দটা ভালোই লাগে। 'মডেল' তৈরী করে যদি গম্বুজাবলোঙ্কনে দেখা যায় তাহলেও মন্দ লাগে না ; কিন্তু বাস্তবে ভূতলে দণ্ডায়মান দর্শকের দৃষ্টিতে মনে হয় ছত্রীগুলি গম্বুজের ঘাড়ে চড়েছে। ইমারত গম্বুজের অনেকটা অংশ ঢেকে রেখেছিল প্রাকৃত ভাষায় বাকে বলে 'ঘাড়ে-গর্দানে' সেই ত্রুটি যেন হয়েছে ইমারতের। এই অবকাশে তাজমহলের কোনো ফটো চট করে দেখে নিন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কি বলতে চাইছি—'গম্বুজ-কুর্সি' পরিমাণ মতো বৃদ্ধি করায় তাজমহলে এই দোষ আদৌ নেই।

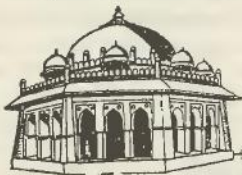
প্রায় দশ বছর পরে মুহম্মদ শাহ্ সৈয়দের সমাধি রচনার সময় স্থপতিবিদ এই ত্রুটিগুলির বিষয়ে নিশ্চয়ই অবহিত হতে পেরেছিলেন। তাই তিনি গম্বুজকে বসালেন পিচের ড্রামের মতো (barrel-shaped) গোলাকার একটি গম্বুজ-কুর্সির উপর। ফলে ভূতলে দণ্ডায়মান দর্শক এরূপ গম্বুজটির স্বরূপ অনুধাবনে সক্ষম হল। গোটা ইমারতে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার সামঞ্জস্য বিধান করে ঐ 'ঘাড়ে-গর্দানে' দোষটা দূরীভূত করা হল।



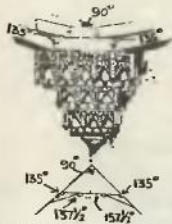
চিত্র-১ ডোম অব দ্য রক
জেরুজালেম ৭ম শতাব্দী



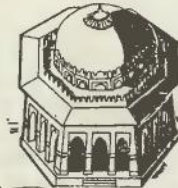
চিত্র-৩ মুবারক শাহ-মকবর (সৈয়দ জামান)



চিত্র-৫ ইন্সানি মকবর (শুহী জামান)



চিত্র-২ পুরানা-কিলা মসজিদে 'হুউজ'
'ভেজাল-ভসৌর'



চিত্র-৪ সিকান্দার মকবর (লোদী-জামান)



চিত্র-৬ আমম মকবর (আকবরী জামান)

বৈচিত্র্য আনতে দুই স্থায়ী মধ্যবর্তী তিনটি খিলানের মাঝেরটিকে উচ্চতায় কিছু বড় করা হল। নিম্নোক্ত বলা যায়, প্রাচীন যুগের স্থাপত্য-চিন্তায় উন্নতিবিধান করা গেল।

তবু দেখছি, আরও পঞ্চাশ বছর পরে সিকান্দার লেদীর মক্কারা (চিত্র 4) বানানোর সময় স্থপতিবিদ আশ্চর্য নন। তিনি ছত্ৰীগুলিকে বর্জন করলেন। ইমারতের ভিতটাকেও ক্রমে আনলেন। গম্বুজকে এবারও বসানো হল গম্বুজ কুর্সির উপর। শূন্য ভাই নয়, সেই গোলাকৃতি গম্বুজ-কুর্সির ধার ঘেঁষে ঘোলা-কোণাশিষ্ট একটি অলঙ্কৃত প্রাচীর গাঁথে তোলা হল। যেন মসজিদের সমুখে 'মাখসুরা'। অথবা বলা যায়, সীতা ত্বপের চারিদিক ঘিরে অঙের মাঝামাঝি যেমন প্রদক্ষিণ পথের অলঙ্করণ। আরও লক্ষ করে দেখুন, এককাল গম্বুজের উপর যে ছত্ৰীটি ছিল সেটি অপসারিত। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে হিন্দুমন্দিরের পদ্মকলস।

এই ধারারই বাহক আলিওয়াল খান, খাঁর স্থাপত্যকীর্তি ঐ সিকান্দার লেদী মক্কারার দু-দশকের মধ্যেই নির্মিত। সে প্রসঙ্গে এখনই আসব। (ধারাবাহিকতার সূত্রটা ধরে বরং বলি আলিওয়ালের উত্তরসাধকদের কথা। শের শাহ-র পুত্র সালিম-শাহ শূরের আমলে নির্মিত ঈশা খাঁর মক্কারায় আবার পূর্ববর্তীযুগের বিভিন্ন কায়দার বিচিত্র 'পারমুটেশন' করা হল (চিত্র 5)। গম্বুজটাকে বসানো হল উঁচু কুর্সির উপর। কিন্তু স্থপতিবিদের মনে হল—সিকান্দার লেদীর ঐ ছত্ৰী-বর্জনটা ঠিক হয়নি। তিনি তাই মুবারক শাহ সৈয়দের হারিয়ে যাওয়া ছত্ৰীগুলিকে স্বস্থানে ফিরিয়ে আনলেন। অর্থাৎ ঈশা খাঁর স্থপতির মতে মুবারক শাহ-এর মক্কারাতে যে অলঙ্করণ, ছত্ৰীর ঘননিবন্ধ পুষ্পগুচ্ছ, সেটা বোলতাই হয়নি ফুলদানীটা স্বর্বাংকর হওয়ায়। তাই তিনি দুটির মিলিত রীতির এক 'সিনথেসিস' বানাতে চাইলেন।

পরবর্তী উদাহরণ আধম খাঁর মক্কারা, ঐ দিল্লিতেই (চিত্র 6)। ইতোমধ্যে কিন্তু ভারত ইতিহাসে যুগান্তর ঘটে গেছে। পাঠান যুগ অতিক্রমণে আমরা পৌঁছেছি মুঘল-ই-আজমে। শেরশাহ, ইসলাম শাহ, হুমায়ুন পার করে আকবরী জমানায়। আধম খাঁ ছিলেন আকবরের দুধ-ভাই, ধাত্রী জীজী আদার পুত্র, আকবরের সেনাপতি। নূতন যুগের মুঘল স্থপতি পূর্বযুগের সব কয়টি কীর্তি ঝুঁটিয়ে দেখে শোনালেন নতুন কথা। যেন বললেন, না ছত্ৰী চলবে না। ওরা বড় ভিড় করে। তার চেয়ে গম্বুজ সই-সই ঐ প্রাচীরের আটপ্রান্তে বানাও আটটি গুলদস্তা। 'গুলদস্তা' কাকে বলে জানো না? ছোট আকারের মিনারিকা, সরু, লম্বা, বর্ষার মতো, যার অনেকটাই ইমারতের গা সই-সই। আর তার উপরে আধফোটা পদ্মকুঁড়ি। কবর ঘিরে যেমন মোমবাতি সাজানো হয়, সেই কায়দায় গুলদস্তাগুলি সাজিয়ে দাও। তাছাড়া গম্বুজ-কুর্সির সই-সই পাঁচিলটাকে ঝাড়াইয়ে আরও বড় কর, তাতে বসাও এক-একদিকে তিন-তিনটে করে কৃত্রিম খিলান, কুন্ডু আর কি। তাতেই ছত্ৰীর অভাবজনিত শূন্যতা পূরণ হবে। গম্বুজ-কুর্সিটাকে আরও অনেক উঁচু করতে হবে (তা তো বটেই)। সেটা সিকান্দার লেদীর মক্কারায় ফতটা উঁচু করা হল, তার চেয়েও উঁচু করতে হবে—যা হয়েছিল, আরও দু-পুরুষ পরে, তাজমহলে। তাছাড়া ঐ যে চারিদিক ঘিরে প্রতিদিন ছত্ৰীটি বানাচ্ছিলে, ওটা বাতিল কর। তার বদলে

গম্বুজকে বেঁটন করে একটা বর্জার দাঁও। খিলানের মাথায় মাথায় একটা চওড়া ফেট্রি বাঁধো দেখি—এবার দেখ, কেমন খোলতাই হয়েছে।

এখানেই কিন্তু শেষ নয়। এই অষ্টভুজাকৃতি মক্কারা, যার প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছিলেন আলিওয়াল, তা রাজধানীর বাহিরেও ভারত ভূখণ্ডে দূর দেশে ও দূরকালে প্রসারিত হয়েছিল। তার প্রভাব অনুধাবন করতে আপনাকে সাসারাম-দিল্লি-আগ্রা দৌড়তে হবে না। ট্রেনের বদলে ট্রামে চেপেও তা দেখে আসতে পারেন। বি-বা-দী বাগে। এই শহর কলকাতার প্রতিষ্ঠাতা জোব চার্নকের সমাধিতে।

অষ্টভুজাকৃতি ইমারতের এই ধারাবাহিকতার ইতিহাসে আলিওয়াল খান একটি সোপানমাত্র। হয়তো একটি বড় জাতের সোপান : ল্যান্ডিং। কিন্তু তাঁর একটি কীর্তি 'ল্যান্ডিং' নয়, 'ল্যান্ডমার্ক'। শের শাহর সমাধি।

সাসারাম পুর্যায় সর্বপ্রথম নির্মিত মক্কারায় আলিওয়াল যেন নিজেকে তখনো খুঁজে পাননি। তবু তাঁর স্বকীয়তার অভাব নেই কোনো। আলিওয়াল ছজ্জাকে সম্প্রসারিত করেন, ছত্রীগুলিকে বসিয়েছেন ছজ্জা থেকে অনেকটা উঁচুতে, একটা আটকোণা পাঁচিল গেঁথে তুলে। ইমারৎ বিস্তার ও উচ্চতার সুখম ছন্দের অনুপাতে সুদৃশ্য। ছজ্জা ও প্রাচীরের মধ্যে ভূমি-নকশায় যে প্রশস্ত স্থানটা রাখা হয়েছে সেখানে চার-আটে-বত্রিশটা ছোট-ছোট গম্বুজ বানিয়ে একটা নয়নাভিরাম



শের শাহের সমাধি

দ্রষ্টব্য আনা হয়েছে। খিলানগুলিকে পুরাতন গাঁবার জন্য নিম্নে একটা বাড়তি অলঙ্করণ পাওয়া গেছে, যা উর্ধ্যদের ঐ গম্বুজ অলঙ্করণকে ব্যালেন্স করছে।

মাত্র চার বছর পড়ে আলিওয়াল সাসারামে যা বানালেন তা 'লতিফ', তা 'সরিফ', তা 'কামাল', তা 'আজীব-ও-যড়ি' ! শের শাহ্ শূরের সমাধি (চিত্র 7)। পার্সি ব্রাউন বললেন, "It is a class by itself, for it is one of the grandest and most imaginative architectural conceptions in the whole of India."^৭ শুধু তাই নয়, দেখছি তাঁর কালজয়ী গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে কুৎব-মিনার, বুলন্দ-দরওয়াজা, বিজাপুরের গোলগম্বুজ এমনকি স্বয়ং তাজমহলকে উপেক্ষা করে তিনি ঠাই দিয়েছেন আলিওয়ালের স্বপ্নকে—হৃদয়ের জ্বলে প্রতিফলিত শের শাহ্ শূরের মক্কারা পার্সি ব্রাউনের অমর গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে উপস্থিত।

ইমারতটি একটি বর্গক্ষেত্র আকারের দীর্ঘিকার কেন্দ্রস্থলে দ্বীপের মতো নির্মিত। পরবর্তীকালের অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ব্যতিরেকে এ পরিকল্পনা অন্য কোনো উল্লেখযোগ্য ভারতীয় স্থাপত্যকীর্তিতে দেখিনি। পুষ্করিণী অতি বিশাল, এক এক দিকে 427 মিটার—পাড় বরাবর ঘুরে এলে প্রায় পৌনে দু-কিলোমিটার হাঁটা হয়ে যায়। কেন্দ্রস্থ ইমারতের বিস্তার 76 মিটার, উচ্চতা 46 মিটার। ইমারতে পাঁচটি তল—সর্বনিম্নে দিঘির বুক থেকে দ্বীপের মতো জেগে উঠেছে এক বর্গক্ষেত্র-আকারের ভিত্তি-মূল বা মোকাম-কুর্সি। তাকে ঘিরে একটি চতুষ্কোণ সুউচ্চ প্রাচীর, যার চার কোণায় চারটি অষ্টভুজাকৃতি ছত্রী। তৃতীয় তল হচ্ছে—মূলসৌধের অষ্টভুজ অলিন্দ, যার প্রতিটি দিকে দুই খাম্বিয়ার মাঝখানে লেদী শৈলীতে নির্মিত তিন-তিনটি খিলান। উপরে অগ্রশস্ত ছজ্জা। তার উপর কুঞ্জর (banilement) শোভিত ছাদ-পাঁচিল (parapet)। এবং আটটি ছত্রী। এর পরের তলায় আবার একটি খাড়া পাঁচিল ইমারতকে বেঁটন করেছে—যাতে হাসান-মক্কারার ছাপ, এবং তার উপর পুনরায় আটটি ছত্রী। লক্ষণীয়, মুবারক শাহ্, সৈয়দের সমাধিতে মনে হয় ছত্রীগুলি মূল গম্বুজের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। এখানে সে দোষ হয়নি। যদিও শের শাহ্‌র ক্ষেত্রে ছত্রীর সংখ্যা বিগুণিত। তার হেতু : যোলটি ছত্রী মূল গম্বুজকে বেঁটন করেছে দুটি বিভিন্ন আনুভূমিক তলে এবং গম্বুজের আকার এত বড় যে, ছত্রীরা ভিড় করে তার মহিমা ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

গম্বুজটি প্রকাণ্ড। নির্মাণ সময়ে ছিল তামাম হিন্দুস্থানে বৃহত্তম—বাসে ও উচ্চতায়। ব্যাস 20 মিটার, উচ্চতা 27.5 মিটার। সেকেন্দার শাহ্‌র মক্কারা থেকে হুমায়ুনস্ টুঘ, তাজমহল পার হয়ে সফদরজঙ মক্কারা পর্যন্ত প্রতিটি গম্বুজের সঙ্গে এর পার্থক্য এই যে, এটি 'ডবল-ডোম' নয়। এখানে আলিওয়াল এক 'মৌলিকতার স্বাক্ষর রেখেছেন। একটি নির্দিষ্ট সীমারেখার চেয়ে বড় গম্বুজের ক্ষেত্রে দু-ধর্মীয় রচনায়ের প্রথা প্রায় সর্বজন স্বীকৃত। স্থপতি মনে করেন, না হলে ভিতর থেকে দর্শকের দৃষ্টিতে রসাতাস ঘটে। সমাধিক্ষেত্র ভিতরে দণ্ডায়মান দর্শকের সঙ্গে হয় গম্বুজ অন্ধকারে মিশে গেছে। আলিওয়াল সব জেনে-বুঝে তবুও 'সিঙ্গেল-ডোম' বানালেন। ঐ অনুভূতির হাত থেকে দর্শককে মুক্তি দিতে গম্বুজের ভিতরে জালো আসার এক বিচিত্র ব্যবস্থা করলেন। যা অভূতপূর্ব। প্রয়োগবিদ্যায় আর পরিচয়—'ট্রিফোরিয়াম আর্কেড-জালিকায় মক্ষিকোষ নির্মাণ করে।' সেটি কী, তা একে দেখাতে গেলে বিস্তার আঁকজোক করতে হবে। কখনো

সাসারামে গেলে স্বচক্ষেই দেখবেন।

অনুমান হয়, নির্মাণ-সময়ে গম্বুজটা নীল রঙে আঁতুর করা ছিল—সে আঁতুর খুয়ে-মুছে উঠে গেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রাথমিক পর্যায়ে ভূমি-নকশায় পশ্চিমদিক নিরূপণে সামান্য ভুল হয়েছিল। বনিয়াদের কাজ শেষ করার পর এ ত্রুটি আলিওয়ালের নজরে পড়ে। ইসলামী ঐতিহ্যে কিব্লা চিহ্নিত মিহরাব নিখুঁত পশ্চিমে থাকা চাই। আলিওয়াল এই আট ডিগ্রি গলতি উপরাংশে সুন্দরভাবে শুধরে নিয়েছেন। এমনকি ভূমি-নকশা বা প্ল্যানে ঐ ত্রুটিটাকে মনে হয় স্থপতিবিদের একটি সজ্ঞানকৃত প্যাটার্ন বুঝি !

দিল্লি মহানগরীতে শের শাহের স্থাপত্যকীর্তি : পুরানা কিল্লা বা ষষ্ঠ দিল্লি নগরী। সে স্থাপত্যকীর্তি দেখতে আজকের দিনের ট্যুরিস্ট যায়-কি-না যায় ! নেহাৎ একজিভিশন হাউডে কোনো আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হলে, অথবা চিড়িয়াখানা দেখতে যাত্রী ওপাড়ায় পা ম্যাড়ায়। যদি যান : দেখবেন, ককালসার কিছু ষ্বেংসত্বপূ। হুমায়ুন পরবর্তী জমানাতে, শের শাহের মৃত্যুর পর— দিল্লি পুনরুদ্ধার করেন। এই অঞ্চলের অনেকগুলি শেরশাহী ইমারৎ ষ্বেংস করে নতুন মোকাম বানিয়েছিলেন। তাই পুরানা কিল্লার জৌলুম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। তবু এখনও লক্ষ করলে দেখতে পাবেন—শের শাহ দরওয়াজা বা বড়া-দরওয়াজার বিচিত্র অলংকরণ ; কিম্বা কিল্লা অভ্যন্তরস্থ কিল্লাই-ই-খুহনা মসজিদ।

খুহনা মসজিদ—সম্রাটের প্রার্থনাস্থল—এক যুগের অবসান ও অপর যুগের আগমনের দ্যোতক। ভূমি-নকশায় আয়ত ক্ষেত্র— 48×13.7 মিটার। উচ্চতা 33-33 মিটার। মসজিদে প্রবেশ দ্বারটি লক্ষ করে দেখুন, খিলানগুলি দু-পর্দায় নির্মিত। বাহিরে ইমারতের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার অনুপাতে বিশালকায় খিলান, তার কিনার বরাবর গিয়াস-উদ্দীন মকব্বারা অথবা আলাই দরওয়াজার সেই পদ্ম-কুঁড়ির নকশা। আর ভিতর দিকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় প্রকৃত প্রবেশ দ্বার। বাহিরের দিকের উচ্চতা স্থাপত্যের প্রয়োজনে, ভিতর দিকে মানুষের প্রয়োজনে। এই রীতিটি পরবর্তী বহু ইমারতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে—যার চরম সাক্ষ্য ফতেপুর সিক্রিতে আকবরী বুলন্দ দরওয়াজায়। আরও দেখুন, প্রবেশ পথের ঐ অরিয়ল গবাক্ষটি আকবরী-জমানার আশ্রয় কিল্লার জাহাঙ্গীরী মহালে, ফতেপুর সিক্রির বহু বহু গবাক্ষ, এমনকি জয়পুরের হাওয়া-মহলের স্থিতিও আপনাদের মনে জাগিয়ে তুলতে পারে। প্রবেশপথের দু-পাশে দেওয়াল-মুই-মুই দুটি মিনারিকাকে লক্ষ্য করেছেন ? যা উপরে গিয়ে গুলদস্তায় রূপান্তরিত ? উত্তর দিকে ঐ খাঁজ-কাটা নকশাটা কেমন যেন চেনা-চেনা, নয় ? ওটা দেখেছেন বৃহৎ-মিনারে। অরিয়ল গবাক্ষটা ঘিরে পাথরের জালিকাজ, তাও পরবর্তীকালে জমানান নতুন ছন্দে বিবর্ধিত হয়েছে—ইতমৎউদ্দৌলায়, সেলিম চিতির দরগাহ, এমনকি তাজমহলে। দিল্লি পরিক্রমা কালে এই ক্ষুদ্র ইমারৎটি স্বতই উপেক্ষিত হয়ে যায়—কিন্তু আপনি যদি স্থাপত্যের ছাত্র হন, তাহলে বলব ও তীর্থে একবার হাজিরা দিয়ে যাবেন। হোক ছোট, এই উপেক্ষিত স্থাপত্যকীর্তিতেই শের শাহ শুর অনেকগুলি বীজ বপন করেছিলেন যা অন্যত্র অনন্য মহীরূহে বিকশিত হয়েছে।

মাত্র পাঁচ বছরের ভিতর কেমন করে শের এত-এত কাজ করে ফেললেন ? কেমন

করে বুঝলেন—কুৎব-মিনারকে অতিক্রম-করা কীর্তি আলি-মিনার নয় ; গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ! উচ্চতায় শুধু দার্জেরই ব্যাঞ্জনা, বিস্তারে মহাবতের ! দু-হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ সোনারগাঁও-পাঞ্জাব সড়ক কুৎব-এর ২৭৩ মিটার উচ্চতাকে পিছনে ফেলে গেল। আজ পাঁচ শ' মানুষ যদি দৈনিক কুৎব দেখতে যায়, তবে পাঁচ লাখ ব্যবহার করে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক রোড !

সাসারামের সেই নগণা যুবক ফরিদ কোন মন্তব্যে দিল্লির তক্ত-ই-সুলেমানে আসীন হয়ে এ ইন্দ্রজাল সফল করল ? জবাব মিলবে সুফী পণ্ডিত জালালের ভাষায় :

আন নিশান্ এ-দীদ্ এ হিন্দুখাঁ বুবদ্।

কি জহদ অজ্ খাব ও দিওয়ানা শবদ।*

কলিঞ্জর দুর্গ আক্রমণের সময় এক দুর্ঘটনায় এই অনন্যসাধারণ সুলতানের মৃত্যু হয়। বারুদের স্তূপে আগুন ধরে যাওয়ায় ঘটল এই দুর্ঘটনা। বিস্ফোরণমাত্র মৃত্যু হয়নি শের-এর। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় জীবিত ছিলেন তিন দিন। দুর্গের পতন হয়েছে জেনে তৃপ্তির সঙ্গে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন। পাঁচ দিনের দিন কলিঞ্জর কিল্লায় এসে উপনীত হলেন শাহজাদা—যিনি ইসলাম খাঁ নামে পরবর্তী দিল্লির সুলতান। সদ্য-বিজিত কলিঞ্জর দুর্গে অনাড়ম্বর অভিষেক সেরে ইসলাম খাঁ প্রাক্তন দিল্লীখরের মরদেহ নিয়ে রওনা হলেন সাসারামের দিকে।

ইতোমধ্যে উস্তাদ আলিওয়াল খাঁ নির্দেশ মতো সেই তৃতীয় মকবারাটি সমাপ্ত করেছে। অথচ সেটি শূন্যগর্ভ। এ পাঁচ বছরে দিল্লীখরের সাক্ষাৎ পায়নি শিল্পী, তাই জেনে নেওয়া হয়নি—কে সেই শাহ্-এন-শাহের গোপন-প্রেমের পাত্রেী !

বিরাট শোকযাত্রার মিছিল এসে সামিল হল সাসারামে। সারা সাহাবাদের মানুষ ছুটে এল তাদের অতি-আপনজনকে শেষ দেখা দেখতে। সেই জনসমুদ্রের একান্তে অন্তর্বাসীর মতো দাঁড়িয়েছিল আলিওয়াল। এ কয় বছরে সে আরও বুড়িয়ে গেছে। মনে মনে বলছিল—প্রভু, এ কী বিড়ম্বনার মধ্যে তুমি ফেলে গেলে আমাকে। মকবারা বানিয়েছি, অথচ তার মালিকানা কার তা জানি না !

এই শেষ বয়সে অকৃতদার আলিওয়াল কি আলাতালার নাম ভুলে গিয়ে চিরাগ হাতে পথে পথে ফিরবে খুঁজতে কে হতে পারে সেই সুন্দরী, যার কপটতার ক্রমকালো তিলের বিনিময়ে তামাম-হিন্দুখাঁর শাহ্-এন-শাহ্ সমরবন্দ-বুদ্ধির বিনিময়ে দিতে পেছপাও নন !

সুলতানী সেপাই এসে ওর হাত চেপে ধরল, বললে, উস্তাদজী, হুয়ং সুলতান তোমাকে তলব করেছেন। ত্বরন্ত চল এস।

বিস্মল আলিওয়াল এসে দাঁড়ালো নয়-সুলতান ইসলাম শাহ্ শূরের সম্মুখে। আভূমি নত হয়ে তিনবার কুর্শি করল। ইসলাম শাহ্ বললেন, উস্তাদজী ! সমস্ত দায়-দায়িত্ব

* হিন্দুধর্মের অন্তরাচার প্রকৃত পরিচয় যখন কেউ পায় তখন তার ন্যাওয়া-খাওয়া ছুটে যায়। সুগোপিত মানুষটা উন্মাদ হয়ে যায়।

তোমার। আকাজানের কফিন সমাধিস্থ কর।

বৃদ্ধ ওস্তাদ হুকুম তামিল করল। শোকযাত্রার পুরোভাগে নির্দেশ দিতে দিতে সে নিয়ে গেল সন্ধ্যার মরদেহ মক্কার ভূগর্ভে। সেই আকাশচুম্বী আশ্চর্য ইমারতের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল না। নতনেত্র নিজ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। নকই-হুই-হুই বড়ো ইমাম সাহেব মিম্বারের উপর উঠে দাঁড়িয়ে খুৎবা পাঠ করলেন। হাজার হাজার মানুষ নতজানু হল।

অনুষ্ঠান শেষে ইসলাম শাহ্ যখন আলিওয়ালকে পারিশ্রমিক দিতে গেলেন তখন তিন-পা পিছিয়ে গেল লোকটা। হাত দুটি জোড় করে বললে, ইমান ইনসাফের মালিক। আপনাদের নিমক খেয়েই বেঁচে আছি। কিন্তু আজকের এ কাজের জন্য আমাকে কোনো খিলাৎ দেবেন না। খোদাবন্দ! এ বান্দার এটাই ছিল শেষ কর্তব্য।

ইসলাম বললেন, তুমি এখানেই থাকবে উস্তাদজী। আকাজান নির্দেশ দিয়ে গেছেন, এখানকার মক্কারগুলির দেখভাল, মেরামতির সব দায়-দায়িত্ব তোমার। সেজন্য তামাম-জিদেগী তুমি একই হারে মাসোহারা পেয়ে যাবে।

অশ্রুসজল চোখে বৃদ্ধ কোনক্রমে সাহস সপ্তয় করে বললে, গোস্তাকি মাফ করবেন জীহাপনা, আপনার আকাজান—তঁার লাখোবরিষ বেহেস্তবাস মঞ্জুর হোক—হুকুম দিয়েছিলেন, আরও একটি মক্কার বানাতে। সেটি শেষ হয়েছে, কিন্তু তার মালিকানা কার তা তো এ বান্দা জানে না।

ইসলাম খাঁ অতি দুঃখেও হেসে ফেলে। বলে, সে কি হে? তুমি জান না? আমরা তো অনেকদিন থেকেই জানি। বাদশাহী খেয়াল! শাহ্-এন-শাহ্ ঐ মক্কারটা বানিয়েছিলেন তাঁর জমানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদের জন্য।...কী? চেন তাঁকে? লোকটার নাম : উস্তাদ আলিওয়াল খান।

বজ্রহত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বৃদ্ধ। কুর্ণিশ করতে, কৃতজ্ঞতা জানাতে ডুল হয়ে গেল তার। এ কী বিশ্বাস্য? মহামহিম দিল্লীশ্বর অতি ক্ষুদ্র কীট আলিওয়াল...সেই রহস্যঘন রসিকতা...‘ব-খালই হিন্দোওশ বখসম্ সমরখন্দ ওয়া বুঝারার।’

দু-হাতে মুখ ঢেকে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল বৃদ্ধ।

গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে যদি কখনো পশ্চিমে যান, আল্লার দোহাই একবার গাড়ি থামাবেন সাসারামে। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে না—নজরে পড়বেই শের শাহ্ শূরের সমাধি। কাকচক্ষু নির্মল জল নয়, সবুজ শ্যাওলা-গোলকমোলা পানি। নীল-আস্তর-করা গম্বুজটা হাড়-পাঁজরা বার-করা। তা হোক, তবু আরও সেই মগ্গচৈতন্য ইমারৎ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে—দেখছে, নিজ প্রতিবিম্বটাকে। শের রসিকতা করে বলেছিলেন, এ ইমারৎ নার্সিস। সত্যিই, প্রতিবিম্বের দিকে নিবন্ধদৃষ্টি ঐ কঙ্কালসার ইমারৎকে দেখে নার্সিসাস ফুলের সেই আত্মরতিমূলক ব্রীকউপকথাটি মনে পড়ে যাবে আপনার। কিন্তু না! সেটাই বোধ করি শেষ কথা নয়। নার্সিসাস নিজ প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে ভাবছে কিন্তু আনন্দের কথা—একটা ফুলের মতো মুখের আদল? যে বৃক্ষক্ক মানুষটা ওকে চিন্তে পেত্রছিল, যে বলেছিল : তুমি নার্সিস!

তারপর চারশ বছর পার হয়ে গেছে—তেমন দরদী সমজদার আর কেউ আসেনি এ ফুল বাগিচায় ! কোথায় গেল সেই মানুষটা । বেচারী জানে না, সে আছে ওরই অন্তরতম হয়ে

হাজারো সাল সে নাগিস
অপনা বে-নুরী-পর রোতি হয় ;
—বড়া মুশকিল সে হোতি হয়
চ্যমন্ মে দিদাবর পয়দা ॥*

। বে-নুরী = অতুলনীয় সৌন্দর্য ; চ্যমন = বাগিচা ; দিদাবর = connoisseur ।

অদূরেই মিঞা হাসানের মক্কারা । বড়া-ইমাম সাহেবের দোহাই, দেখতে ভুলবেন না সেই দামাল ছেলে ফরিদের বাপমায়ের কবর । শের শাহর দাপটে শের-বকরি নাকি এক ঘাটে পানি পিত । হলফ নিয়ে হক্-বেহক্ কবুল করতে পারব না ; কিন্তু দেখবেন, জেদী একরোখা মিঞা হাসানকে সে শুষিয়ে দিয়েছে তার আত্মজানের কলিজা সুই-সুই করে । ভদ্রিটা দেখেছেন ? দেখুন, দেখুন, ভালো করে লক্ষ্য করে দেখুন । যা আছে পশ্চিমে, পশ্চিম দিকে ফিরে । তার মানে ? জীবিতকালে যৌবনোত্তীর্ণা যে মহিলাটি ছিলেন সুবেদারের করুণার ভিখারিণী তিনি আছেন মুখ ফিরিয়ে, আর পিছন থেকে বাপ তার দিকে ফিরে ।

এখানেই সাসারাম দেখা শেষ করবেন না যেন । খোদ শেরের দোহাই—চলুন দেখে আসি তাঁর 'দিলকা কলিজাকে' । রিক্সা-ওয়াল, ভাজি-ওয়াল, পথ চলতি মানুষজনকে ক্রমায়ে জিজ্ঞাসা করুন—কেউ-না-কেউ হিন্দু ব্যাৎলে দেবেই । দেখিয়ে দেবে দূর থেকে, ঘন কাঁটাগুলো ঢাকা একটি চুনবাঁলি-বসা উপেক্ষিত ধ্বংসস্থাপ । পুরাতত্ত্ব বিভাগের কোনো তা-বড় তা-বড় 'দিদাবর' সে 'চ্যমনে' কন্ঠিনকালেও পদার্পণ করেননি, দেখলেই বোঝা যায় । কোন এক নাম-না-জানা আলিওয়ালের কবর ।

—'বহু কৌন থা ? ক্যা জানে ! কোই ছোট-মোট জায়গীদার, মনসবদার, ইয়ে সিপাহসালার হোগা সায়েদ ! মুখে না মালুম ।'—স্থানীয় লোকটা পাশ কাটাবে ।

আজ্ঞে না, মীর মহম্মদ আলিওয়াল খাঁর হক্-হিন্দু আমিও জানি না । অতি ভাষা-ভাষা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যকে মূলধন করে, মনগড়া সংলাপ ঘেঁদে একিসসা পয়দা করেছি । তবু বিশ্বাস করুন, ঐতিহাসিক লেখকের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-গড়ির বাইরে আমি একবারও পদার্পণ করিনি । শের শাহ শুর অথবা তাঁর জুমানার শ্রেষ্ঠ স্থপতিবিদ আলিওয়ালের ইতিহাসকে আমি সজ্ঞানে বিকৃত করিনি একতিল ।

অদ্বিতীয় কুৎবমিনারের মূল স্থপতিবিদ কেমন হতভাগ্য—সে কথা জানিয়ে কুৎবের গায়ে কোনো ফলক লাগবার কথা স্বৈয়াল ইয়মিন আইবক-ইলতুৎমিস-আলাউদ্দীনের ; বুলন্দ দরওয়াজার ঐ আকাশচুম্বী দার্টা জানিয়েছিল কোন 'বিশ্বস্ত-বিশ্মতকীর্তি' স্থপতির

*হাজার বছর ধরে নাগিস/সৌন্দর্য-পশরার উপর কাঁদছে । (ও জানে) এ বাগিচায় দরদী সমজদার/এক অতি সুন্দর স্বতীকর ॥

খ্যানে, সে কথা উল্লেখ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেননি জনদরদী স্বয়ং আকবর বাদশাহ্ তাঁর দু-হাজার এক শ' ছিয়াশি পৃষ্ঠার জীবনীতে। আজমহলের নির্মাণ-ইতিহাসে শুধু লেখা আছে—‘কাগজ নকশায় মকবারা হর এক উস্তাদ মৌ আআভর্দান্দ। চুন-এক নকশা-পসন্দ আলিজাঁ হজরৎ!’—ব্যস। ঐটুকুই। গোবাল-টেন্ডারে সাজা দিতে কাবুল-কান্দাহার-ইরাণ-তুরাণ থেকে হরেক উস্তাদ নকসার টেন্ডার দাখিল করলেন, এবং তার ভিতর বেছে-বেছে একটি বিশেষ নকশা আলিজাঁ-হজরৎ পছন্দ করলেন? কিন্তু কে দেখেছিল খ্যানের দৃষ্টিতে সেই মর্মর-স্বপ্ন-সবার আগে, সবার আগেচরে? কাগজের-বুকে-ছকা কোন হতভাগ্যের নকশা আলিজাঁ-হজরৎ পসন্দ করলেন? সেই মীর মহম্মদ গাজী মিঞা ‘আনান’-এর নামটা ইতিহাসে লিখে রাখতে ভুল হয়ে গেল বেগম-বিরহতুর-শাহজাঁহর!

এই যখন দুখিনী ভারতজননীর সহস্রাধীষ্যাপী ললাট-লিখন, তখন আপনার মনে হতে পারে—সেই জননীকণ্ঠে গ্র্যান্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের শতনরী দুলিয়ে দিয়েছেন বলেই নয়, বিহারের জনপদপ্রান্তে ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মকবারাটি বানিয়ে শিল্পের উপর শিল্পীর মর্যাদা স্বীকার করেছেন বলেই শের শাহ শূর ভারতেতিহাসে অনন্য, একমাত্র ব্যতিক্রম!

বড়া মুশকিল সে হোতি হয় চ্যম্‌নমে দিদাবর পয়দা।

কটকগুলাবৃত সেই ভগ্নত্বপের পৃতিগন্ধময় পরিবেশে দাঁড়িয়ে কোনো অন্তসূর্য-উদ্ভাসিত সন্ধ্যায় হঠাৎ হয়তো আপনার মনে হবে—না, শাহজাঁহা নয়, একমাত্র শের শাহ শূরের প্রতিই ঐ পংক্তিটা সুপ্রযুক্ত:

‘তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ!

টীকা ও তথ্যসূত্র

1. শের শাহ-র প্রামাণিক জীবনীকার ডঃ কানুনগোর মতে ফরিদের জন্ম 1486 কিন্তু শ্রীপরমাশ্রম সারণ এ মত অস্বীকার করে প্রমাণ করেছেন [‘The date and place of Sher Shah's Birth’, J. B. O. R. S. 1934, P. P. 108-22] যে, ফরিদের জন্ম 1472 খ্রীষ্টাব্দে। রমেশচন্দ্র এ মত স্বীকার করেন।

2. ফরিদের গুর্ভধারিণীর নাম ইতিহাসে খুঁজে পাইনি। ন্যা পাওয়াই স্বাভাবিক—জাহাঙ্গীর তাঁর অতবড় আত্মজীবনীতে মায়ের নামটা লিখে রাখার প্রয়োজন বোধ করেননি। স্ত্রীলোক ও ছপতিকে সে যুগ সমদৃষ্টিতে দেখত। ছপতি ইয়ারৎ পয়দা করে, স্ত্রী করে সন্তান। তাদের নাম লিখে রাখা নিষ্প্রয়োজন। কাহিনীর স্বাতিরে ‘সরিফা’ ও ‘কানিজা’ নাম দুটি নিয়েছি। ‘সরিফা’ মানে সর্ববংশজাতা, ‘কানিজা’ ভর বিপরীতার্থবোধক।

3. Advance History of India, R. C. Mazumdar, P. 435.
4. Ibid, P. 436.
5. History of India, Elliot, Vol. III, P. 375-76.
6. Advance History of India, R. C. Mazumdar.
7. Indian Architecture, Islamic Period, Percy Brown.



ফতেপুর সিক্রি

কিছু বিতর্কিত স্থাপত্য



ফতেপুর সিক্রি ভারতীয় স্থাপত্য ইতিহাসে এক অনন্য তীর্থ। ইন্দো ও ইসলামী স্থাপত্যের মহামিলনক্ষেত্র। ভারতবর্ষ জয়ের পর প্রথম তিন সাড়ে তিনশ বছর দিল্লীর ‘মূলতানেরা’ ছিলেন একান্তভাবে পশ্চিমমুখী—ইরান, তুরান, আফগানিস্তানের অন্ধ অনুসারী। আকবরই প্রথম দিল্লীগ্রর যিনি প্রণিধান করলেন ভারতবর্ষকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে; তাই তিনিই প্রথম পয়দা করলেন ইন্দো ও ইসলামী এই দুই ধারার এক মিলিত স্থাপত্য। ইসলামী স্থাপত্যের গম্বুজ, মিনার, মিনারিকা, খিলান, গুলদস্তা, চবুতরা এবং আর্কুয়েট প্রয়োগ কৌশল, হাত মেলালো

হিন্দুদের করবোলিং, ব্র্যাকেট, শঙ্খ-চক্র-পদ্ম-ঘণ্টা-কলস ট্র্যাবিয়েট পদ্ধতির সঙ্গে। এই ফতেপুর সিক্রি মহাতীর্থেই।

সেলিমের জন্ম ইতিহাসটা আমাদের অজানা নয়। স্যার যদুনাথ, ডঃ ব্রমেশ মজুমদার কিম্বা ডঃ শ্রীবাস্তব যা পারেননি তাই সম্ভব করেছেন সোরাব মেদী—গোটা ভারতবর্ষকে জানিয়ে দিতে সেই ‘মুঘল-এ-আজম’-এর কিসসা।

নিতান্ত রূপকথার গল্প : রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, অথচ রানীমার কোল আলো করা সাতরাজার ধন মানিক নেই। তারপর কে হুঁমু এসে সংবাদ দিল—আগ্রার অনতিদূরে নগণ্য সিক্রি গাঁয়ে বাস করেন এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ফকির : শেখ সেলিম চিস্তি।

তঁার আশীর্বাদে কী না হয়?

‘অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন’।

আকবর তঁারই শরণ নিলেন। বিরুট শোভাযাত্রা চলল আগ্রা থেকে সিক্রি। হাতি-ঘোড়া-সৈন্য সামন্ত আর সবার পুরোভাগে দুইটি হিন্দুস্থানের শাহ-এন-শাহ! পদরজে!

বৃদ্ধ ফকিরের বয়স তখন নব্বই শুরতে বছর দুই বাকি। সম্রাটের আর্জি শুনে

বললেন : হবে ! খোদাতালা তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

তাই হল। অনতিবিলম্বেই প্রধানা বেগম অমরমহিষীর গর্ভসংস্কারের লক্ষণ দেখা গেল। সিক্রি গ্রামে ঐ সম্রাসীর কুটিরের কাছাকাছি রাতারাতি এক মোকাম বানিয়ে সম্রাট তাঁর সারাহ বেগমকে পাঠিয়ে দিলেন। এখানেই জন্ম হল তাঁর পুত্রের। বাদশাহ্ ঐ ফকিরের নামানুসারে তার নাম রাখলেন—‘সেলিম’। ডাকতেন ‘শেখু বাবা’ বলে।

শহর আগ্রা থেকে ঊনত্রিশ কিলোমিটার দূরে এই নগণ্য গ্রামটি সম্রাটের মনে ধরে গেল। সেখানে গড়ে উঠল এক অপূর্ব নগরী। ছয় কিলোমিটার দীর্ঘ প্রাচীর, যথেষ্ট উঁচু প্রাকারের উপর আড়াই মিটার চওড়া পথে ঘোড় সওয়ার টহল দিতে পারে।

আপনি নিশ্চয় আগ্রা থেকে আসছেন। ফলে প্রধান তোরণ আগ্রা দরওয়াজা অতিক্রম করেই পাবেন নহবৎখানা। ডানহাতি একটা সড়ক—যে পথে উস্তাদৌ-কী-উস্তাদ মিঞা তানসেনের আবাস। সোজা পথের ডহিনে কবরখানা। তারপরেই রাজপ্রাসাদ।

প্রাসাদে দুটি অংশ। সামনে দেওয়ান-ই-আম। বা দরবার। তার একপাশে দফতরখানা।

আম-দরবারের পিছনে অসংখ্য সৌধ—এক একটি এক-এক জাতের। বামে ‘অনুপ তালাও’ যেখানে বসত তানসেন-বৈজুবাওয়ার সঙ্গীতের আসর। গানবাজনার সখ যদি থাকে তবে সবার অলক্ষ্যে হাতটা ঐ পাথরে ছুঁয়ে কপালে ঠেকাতে পারেন। তার দক্ষিণে ‘বোয়াবগার’ বা শয়নকক্ষ। তালাও-এর উত্তর-পশ্চিম কোণে ‘আবদর-খানা’। সম্মুখে পাশা খেলার ‘ছক’—‘পশ্চিমী কোট’। এগিয়ে যান উত্তরে—‘তোশাখানা’ এবং ‘দৌলতখানা’।

এরপর উত্তর-দক্ষিণ লম্বা একটা প্রাচীর অন্দরমহলকে আড়াল করেছে। সেখানে আকবর জননীর ‘সুনহারা মহল’, প্রধানা বেগম ‘বোহাবাদি প্রাসাদ’, ‘তুর্কি-সুলতানা কোঠি’, ‘হাওয়া মহল’, ‘বীরবল প্রাসাদ’ প্রভৃতি।

পায়ে চলা পথ ধরে যদি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে যান পাবেন জাম-ই-মসজিদ, যার ভিতর শেখ সেলিম চিস্তির দরগা এবং যার দক্ষিণপ্রান্তে ইতিহাসখ্যাত : লাজবাব বুলন্দ দরওয়াজা।

সময় থাকলে দেখতে পারেন আরও কিছু দলছুট স্থাপত্যকীর্তি, যথা হিরণ মিনার।

আগ্রা থেকে সকালে বাস ছাড়ে, সব কিছু দেখে সন্ধ্যায় আবার ফিরে আসতে পারেন আগ্রায়। তখন এই পরিত্যক্ত নগর শুধু শেয়াল, পাঁচা আর রাতচরা পোকের আশ্রয়।

আমি অনেককে জানি, যাঁরা তাজমহল একাধিকবার দেখেছেন ঐচ্ছক ফতেপুর সিক্রি দেখে ওঠার সময় পাননি। ও পাড়ায় যদি আদৌ যান, তবে ও ভুলটা করবেন না।

আমি অবশ্য ওখানে দু-এক রাত থাকার ব্যবস্থা করেই গেছিলাম। খুঁটিয়ে দেখতে। তার ফলে মনে অনেকগুলো সমস্যা জেগেছে। বড় বড় পণ্ডিতদের অনেক নির্দেশ খোলা-মনে মনে নিতে পারিনি।

দেখা যাক, আপনারা কী বলেন।

‘বীরবল-প্রাসাদ’ কি বীরবলের প্রাসাদ ?

আমি তো সবিনয়ে কিন্তু দৃঢ়ত্বের বলব : আক্ষে না !

জানি, অসংখ্য ব্রডিংন্যাগিয়ানের অরণ্যে আমি একা লিনিপুটিয়ান। পুরাতত্ত্ব বিভাগের বিশেষজ্ঞ এবং ঐতিহাসিকেরা রায় দিয়েছেন, ফতেপুর সিক্রির বেগম-মহলে, যোধাবাই-প্রাসাদের উত্তর-পশ্চিম কোণের ঐ মোকামটি বীরবলের প্রাসাদ। গাইড বইয়ের নির্দেশ তাই, সরকারি রিপোর্টের সঙ্কেতও তাই। পুরাতত্ত্ব বিভাগের দোষ নেই—ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের সিদ্ধান্তও সেটাই।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের তথ্য ঐতিহাসিকদের স্বপক্ষে তিনটি যুক্তি।

এক : নাম। স্থানীয় লোকেরা একে বরাবরই বলে ‘বীরবলের মোকাম’।

দুই : হিন্দু স্থাপত্য-ভাস্কর্যের আধিক্য।

তিন : বিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা ডঃ শ্রীবাস্তব তাই বলেছেন।

আমাদের আপত্তিটাও শুনুন :

মুঘল-জমানায় হারেমের যে দুর্ভেদ্য পর্দা-প্রথা ছিল, তাতে কোনো বহিরাগত হিন্দু-অমাত্য, তা তিনি দীন-ইলাহী ধর্ম গ্রহণ করুন বা না করুন, আকবরের হারেমের ভিতরে বাস করবেন এটা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। প্র্যানে এ ইমারতের অবস্থানটা লক্ষ্য করুন।—উত্তরে ও পশ্চিমে ঝাড়া প্রাচীর, দক্ষিণে অশ্বাবাস ও উষ্ট্রাবাস, পূর্বে দিকে অন্যান্য বেগমদের আবাস—যোধাবাই মহল (জাহাঙ্গীর জননী, অম্বরমহিষী, অর্থাৎ পাটিরানীর আবাস), সুন্দারা মকান (আকবর জননীর আবাস), হাওয়ামহল (পুরনারীদের সন্ধ্যাযাপনের অভ্যুত্থান), নওরোজ : বাগিচা (পুরনারীদের বাগান, যেখানে উৎসব সময়ে একমাত্র সম্রাট ও শাহজাদা ভিন্ন কোনো পুরুষমানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না) এবং নাগিনা মসজিদ (শুধুমাত্র মহিলাদের প্রার্থনাস্থল) অর্থাৎ হারামের কেন্দ্রবিন্দুতে।

এটি যদি বীরবলের প্রাসাদ হয় তাহলে প্রশ্ন হবে—তিনি কোন পথে যাতায়াত করতেন ? উত্তরে ও পশ্চিমে ঝাড়া প্রাচীর, দ্বারের চিহ্নমাত্র নেই। তবে কি অশ্বাবাস ও উষ্ট্রাবাসের মাঝখান দিয়ে ? নাকি বেগমমহলের সমুখ দিয়ে ?

ডঃ শ্রীবাস্তব এ প্রশ্নে বলছেন (আকবর দ্য গ্রেট, পৃঃ 316) “আকবরের আদেশে বীরবলের জন্য একটি মর্মরপ্রাসাদ নির্মিত হয় ; সেটি সমাধি স্থল সম্রাট তাঁর প্রিয় সভাসদদের দীর্ঘ দিনের বাসনা চরিতার্থ করতে স্বয়ং তাঁর গৃহে ছারোদ্যাটনের নিমন্ত্রণ রাখতে যান (জানুয়ারী 1583)। গৃহপ্রবেশের দিন বীরবল এক বিরাট ভোজের আয়োজন করেন। সাম্প্রতিককালের কোন কোন গবেষক সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, হারেমের ভিতর বহিরাগত কোন পুরুষের বাসস্থান থাকা সম্ভবপর নয়। কিন্তু আবুল ফজল স্পষ্টাঙ্গের বলেছেন, ‘আকবর বীরবলের জন্য একটি মর্মরপ্রাসাদ নির্মাণ করিয়ে দেন।’ যোধাবাই-প্রাসাদ সংলগ্ন ঐ একটিমাত্র ইমারত ভিন্ন আর কোন মোকামই দাঁড়িয়ে নেই। সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলেবে—ফতেপুর সিক্রিতে ঐ (যোধাবাই মহল) প্রাসাদের উত্তর পশ্চিম কোণে দণ্ডায়মান ইমারতটি, যাতে দুটি গম্বুজ আছে, তা আকবর তৈরি

করেছিলেন বীরবলের জন্য।”

ডঃ শ্রীবাস্তব একজন ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত। আকবরের প্রামাণ্য জীবনীকার। তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু এটা তাঁর কোন জাতের যুক্তি হল? ‘যেহেতু আর কোন প্রাসাদ খাড়া নেই, তাই এই বাড়িটাই সেই বাড়ি।’ কেন? আকবর বানিয়েছেন বলে সেটা খুলিসাং হতে পারে না? ঐ আবুল ফজলই তো বলেছেন, আকবর আগ্রা কিল্লার পাঁচ শ’ ইমারৎ বানিয়েছেন, এবং গুণে দেখছি বর্তমানে ইমারৎ সংখ্যা পাঁচশতের কম। তাহলে আগ্রা-কিল্লার যাবতীয় খাড়া ইমারৎ আকবর নির্মিত। আমরা যে জানি অনেকগুলি শাহজাহার কীর্তি। বরং ডঃ শ্রীবাস্তবের বর্ণনা তো তাঁর সিংহাসনের বিরুদ্ধ যুক্তিকেই প্রতিষ্ঠা করে। মনে মনে কল্পনা করতে পারছেন—বীরবল তাঁর নব-নির্মিত ইমারতের দ্বারোদঘাটন উপলক্ষে হাজার দেড়হাজার মেহমানকে নিমন্ত্রণ করেছেন (সকলেই আবশ্যিকভাবে পুরুষ, কারণ এসব উৎসবে স্ত্রীলোকদের নিমন্ত্রণ হত না) আর ‘মেহমানরা সবাই তসলিম রাখতে আসছেন। আবার প্রশ্ন করব : কোন পথে? ঘোড়া ও উটের পুরীষ ডিঙিয়ে সংকীর্ণ গলিপথে ‘কিউ’ দিয়ে? অথবা—যা নিতান্ত অবিদ্যাস্য : জেনানা-মহলের অন্তরে গর্দানা ঘুষিয়েছেন দেড়-হাজার মর্দনা!

টোডরমল, তানসেনের আবাস চিহ্নিত—রাজপ্রাসাদ থেকে বহু দূরে। নবরত্নের অন্যান্য রত্ন : আবুল ফজল, ফৈজি, খানই-খানান, মানসিং প্রভৃতি কডিকেই প্রাসাদ চত্বরের ভিতরে থাকতে দেওয়া হয়নি, হারেমের ভিতর তো দূর অস্ত—শুধুমাত্র ঐ বীরবলই ব্যতিক্রম?

ওঁদের দ্বিতীয় যুক্তি : হিন্দুশৈলীর আধিক্য। এটা ভুল যুক্তি। ফতেপুর সিক্রির প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই হিন্দু শৈলীর প্রবণতা লক্ষণীয়। বীরবল প্রাসাদে হিন্দু ত্র্যাকোট আছে, ঘণ্টা-চক্র-পদ্ম-ট্রাবিয়েট পদ্ধতি আছে, স্বীকার করছি, কিন্তু সেখানে রাম-সীতা, রাধা-কৃষ্ণ বা হনুমানের মূর্তি নেই। তা বরং আছে ‘সুনহারা-মকানে’ যে ইমারৎ-এ বাস করতেন নিষ্ঠাবান আকবর-জ্ঞানী, এবং তাঁর পিসী গুলবদন! তাহলে?

ওঁদের তৃতীয় ও শেষ যুক্তি ছিল : নাম! হ্যাঁ স্বীকার করছি, লোক পরস্পরায় এ মোকামের নাম : ‘বীরবল-প্রাসাদ’। কিন্তু বীরবলের নামটা কী ভাবে ব্যবহৃত হয় তা আমরা জানি না? অসংখ্য মজাদার গল্প, যা পরবর্তীযুগের কোন রসিকব্যক্তির উর্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত, তা বীরবলের নামে চলে। তার শতকরা পঁচানব্বই ভাগ কাহিনীর সঙ্গে বীরবলের কোন সম্পর্ক নেই। লোকমুখে নাম জড়িত স্বীকারে যদি গুরুত্ব দিতে হয়, তাহলে তো স্বাধীন ভারতের এক প্রখ্যাত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী নামে লোক-মুখে প্রচলিত জোকসগুলিকেও ঐ মন্ত্রীমহোদয়ের জীবনীতে উল্লেখ করতে হয়!

তাহলে এই ইমারতে কে বাস করত? এ বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য আছে। এই যুক্তিটা আমার মনে জেগেছে ঐ সৌধের ক্ষুদ্রতম্পূর্ব ভূমি-নকশা থেকে। প্লানে লক্ষ্য করে দেখুন এটি একটি যমজ-বাড়ি। আঙ্গুলি বলবেন, যমজ বাড়ি বা টুইন কোয়ার্টার্স-এর মধ্যে নতুন কী কথা? ফেটওয়ান লগার পরিকল্পনাকার তো এমন যমজ বাড়ি বেশ কিছু বানান। এ ক্ষেত্রে বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, আধখানা বাড়ি অপর আধখানার দর্পণ

প্রতিবিশ্ব নয়। দুটি অংশের প্রবেশদ্বার বিপরীত দিকে। গোটা বাড়ির মধ্যবিন্দু দিয়ে যে-কোন দিকে একটি সরলরেখা টানুন, এবং একদিকের বাড়ি ঐ মধ্যবিন্দুকে পরিক্রমা করে (যেভাবে সপ্তর্ষি মণ্ডল খুব নক্ষত্রকে পরিক্রমা করে) 180 ডিগ্রি ঘুরিয়ে বসান। দেখবেন প্রতিটি দেওয়াল, কোণা, দরজা-জানালা খুবই মিলে যাবে। সাধারণ টুইন কোয়ার্টারে অ হয় না। আধুনিক টুইন কোয়ার্টারে যা হয়, তাকে বলে 'মিরর-ইমেজ' বা 'দর্পণ-প্রতিবিশ্ব'। এ-জন্যই এ বাড়ি অনন্য।

এই অদ্ভুত প্ল্যানিং থেকেই যুক্তিটি আমার মনে এসেছে। দেখুন, আপনারা মেনে নিতে পারেন কিনা :

আকবরের পাটনারী অমর রাজকুমারীর যোধবাঈ-মহলে সম্রাটের অশ্রুপার মহিষীরা বাস করতেন। তার কেন্দ্রস্থলে তুলসীমণ্ড। পশ্চিমপ্রান্তে পূজা দালান ও ঠাকুর-ঘর। জাহাঙ্গীর জননীই হচ্ছেন ইতিহাসে প্রথম মহিলা যিনি মুসলমানের স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবন হিন্দু মতে পূজা অর্চনা করে গেছেন। কিন্তু তিনি আকবরের তৃতীয়া পত্নী (বিবাহ 1562)। ইতিপূর্বেই আকবর দুবার বিবাহ করেছেন—রুখোয়া বেগম (1551) এবং আবদুল্লা-তনয়াকে (1557)। এই দুজন মহিষী, যাঁরা পাটনারীর পূর্বে সম্রাজ্ঞী হয়েছেন, তাঁরা কনিষ্ঠা সপত্নীর মন্দিরে-মণ্ডিত 'যোধবাঈ' মহালে বাস করতেন এটা আশা করা যায় না। তাই কি সম্রাট তাঁদের দুজনের জন্য এই পৃথক সৌধটি নির্মাণ করান? সেইজন্যই কি ঐ ইমারতের স্থাপত্যে এ জাতীয় অনন্য বৈভবতার স্বাক্ষর? যেন যমজ বোন!

আমার এই যুক্তিটা যদি আপনারা মেনে নিতে পারেন তাহলে অদ্ভুত একজন উপকৃত হবেন। বেচারী রাজা বীরবল! তিনি আমাদের অনেক অভ্যাচার সহ্যেছেন। যে ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেনি তার দায়িত্ব তাঁকে বহন করতে হয়েছে কয়েক শতাব্দীকাল। আপনারা রাজি হলে বেগমমহলে বে-এস্তিয়ারের মতো ঢুকে পড়ার অপরাধ থেকে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

এবার আরও দুটি ইমারতের বিষয়ে কিছু বিতর্কমূলক আলোচনা করা যাক। প্রথমত ইবাদতখানা এবং দৌলতখানা। শেখ সেলিম চিন্তির দরগাহর বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই; কিন্তু ঐ অনবদ্য ইমারতের দুটি বিশেষ দ্রষ্টব্য সম্বন্ধে আপনারা দুটি আকর্ষণ করতে চাই বলেই সেটির সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে।

ইবাদতখানা বাস্তবে কৌন খবসত্বপটি?

ইবাদতখানা : আক্ষরিক অর্থ প্রার্থনাস্থল। আকবরের ইতিহাস নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁদের কাছে এ ইমারত—হিন্দু হলে কাশী, মুসলমান হলে মক্কা। সম্রাটের জীবনদর্শনের সৌরমণ্ডলে এ সৌধটি সূর্যদেব। ইতিহাস বলেছে 1575 সালে সম্রাট এটি নির্মাণ করান ঠিক কোথায় তা বলা হয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্দেশ্য ছিল—এখানে মুসলমান মোল্লাদের সঙ্গে সম্রাটের মতামতের আলোচনা করবেন। সিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের বিবাদ মিটিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। পরে আকবর এই ইমারতের দ্বার অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের

জন্মও উন্মুক্ত করে দেন। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, খ্রিস্টান, জরথুষ্ট্র প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মের পণ্ডিতদের তিনি পর্যায়ক্রমে আমন্ত্রণ করতেন—তাদের বক্তব্য শুনতেন, তর্ক করতেন এবং নিজ সিদ্ধান্তে আসার পথ খুঁজতেন। এর শেষ ফলশ্রুতি 'দীন-ই-নাই' ধর্মের প্রবর্তন।

পুরাতত্ত্ব বিভাগের মতে উট্টাবাসের পিছনে যে ধ্বংসস্তুপ দেখতে পাওয়া যায় সেটাই ইবাদতখানার ধ্বংসাবশেষ। ওঁরা সে ধ্বংসস্তুপ মেপে সিদ্ধান্তে এসেছেন—ইবাদতখানা—যার ভিত-টুকু মাত্র দৃশ্যমান—তা ছিল একটি চতুষ্কোণ ইমারত, ৭.৫ মিটার বর্গক্ষেত্র।

এটা মেনে নিতে পারা যায় না।

আমাদের বিশ্বাস, ইবাদতখানা ছিল দেওয়ান-ই-খানের পশ্চিমদিকের চতুষ্কোণ অংশটিতে, যার চতুর্দিকে অলিন্দ এবং পূর্বপ্রান্তে একটি প্রবেশদ্বার, যে দ্বারটি অতীতে ছিল, বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে (চিত্রে E চিহ্নিত)।

পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'ফতেপুর সিক্রি' গ্রন্থে বিশেষজ্ঞ সৈয়দ আব্বাস রিজ্জতি বলেছেন (পৃঃ ১৫) "রক্তসৌধ থেকে বেরিয়ে এসেই দেখতে পাবেন উত্তর-পূর্ব কোণে কিছু অলিন্দের ধ্বংসাবশেষ। তার গায়ে একটি দোতলা বাড়ির ধ্বংসস্তুপ। তাতে রাবুল ম্যাসনরির গাঁথনি। দেওয়ান-ই-আমের নিরাবরণ প্রাচীরে কিছু সকেটের চিহ্ন। বেশ বোঝা যায়, এই অবলুপ্ত সৌধকে আড়াল করার জন্য সেখানে একটি ঝরোকা-প্রাচীর ছিল। যে প্রবেশপথটি বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সেই দরজাটি থেকে অন্তরমহলকে আড়াল করাই-এ ঝরোকা-প্রাচীরের উদ্দেশ্য।"

আশ্চর্য্য! এই অবলুপ্ত ইমারত এবং বর্তমানে বন্ধ করে দেওয়া দ্বারটি কী জন্য নির্মিত সে-কথা রিপোর্টে আলোচনা করা হয়নি। আমাদের অনুমান—এ অবলুপ্ত ইমারতটিই ইবাদতখানা।

ঐ ইমারতটি ইবাদতখানারূপে চিহ্নিত হলে ঐ দ্বারটি অর্থবহ হয়ে ওঠে। না হলে, ঐ দ্বারের অস্তিত্বকে বলতে হয় প্ল্যানিং-এ এক প্রকাণ্ড ত্রুটি। কারণ এটির অবস্থিতি প্রাসাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে। ঐ যিড়কি-দরজার জন্য পৃথক প্রহরীর প্রয়োজন। যে-কারণে পুরাতত্ত্ব বিভাগ ঐ দ্বারটি বর্তমানে বন্ধ করে দিয়েছেন। অর্থাৎ ঐ ইমারতটি ইবাদতখানা হলে দ্বারটি আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

ইবাদতখানায় পণ্ডিতেরা আসবেন বাহির থেকে, সন্ন্যাসীরা অন্তরমহল থেকে। ফলে ব্যবহারিক প্রয়োজনে তাতে দুটি দ্বার প্রত্যাশিত। পুরাতত্ত্ব বিভাগ যে ভগ্নস্তুপকে ইবাদতখানারূপে চিহ্নিত করছেন, সেখানে যেতে হলে সন্ন্যাসীদেরকে নানান ঝামেলা পোহাতে হয়। অন্তরমহল থেকে সন্ন্যাসী ঐ উট ও ঘোড়ার আস্তাবলের মধ্য দিয়ে কোনও যিড়কি পথে সভায় যেতে পারেন না। তাহলে তাঁদের যেতে হয় বিকল্প পথে দফতরখানার ভিতর দিয়ে, যোধবাসি প্রাসাদের পায়খানার সারিকে ডান হাতি রেখে (ইয়ে বিসমিল্লাহ! সে আমলের খাটা-পায়খানার সমরি) উট ও ঘোড়ার আস্তাবলের পিঠোপিঠি ঐ মোকামে। বেশ, তাই যদি যান, তবে কীভাবে যান? এতটা পথ সন্ন্যাসী হেঁটে যাবেন না। ফলে দেহরক্ষী ও নিরাপত্তার আয়োজন চাই। প্রত্যহ!

অপরপক্ষে দেওয়ান-ই-আমের পূর্বদিকে, আমরা যেখানে বলছি, সেখানে সেই অবলুণ্ড ইমারতটি ইবাদখানা হলে কোম অসুবিধা নাই। পণ্ডিতের আসতে পারেন বর্তমানে বুদ্ধ ঐ দ্বারপথে : সত্রটি শ্রাসাদ অবরোধের বাহিরে না গিয়েও সভায় যেতে পারেন ভিতর দিক থেকে। আর সেজন্যই ঐ বারোকা-প্রাচীর। হারেমের আবরু রক্ষা করতে।

আমাদের যুক্তির সপক্ষে আর একটা মারাত্মক প্রমাণ আছে।

একটি মোগলচিত্র। আকবরের আমলে আঁকা 'নরসিং'-এর মিনিয়চার। আবুল ফজল লিখিত 'আকবরনামা'র একটি সচিত্র পৃষ্ঠা। মূল চিত্রটি আছে Chester Beatty Library তে ডাবলিন-এ (Ms. 3, Fol. 1769)। চিত্রের বিষয়বস্তু ইবাদখানায় সত্রটি আকবর দুইজন যেসুইট প্রাচীর সঙ্গে আলোচনারত। এই সমসাময়িক চিত্রের পশ্চাদপটে যে খিলান-সম্বন্ধিত অলিঙ্গ তা আমাদের শনাক্তকরণেরই সাহায্য দেয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগ বর্ণিত চতুশ্চোণ গৃহ এটি নয়।

জানি না, এ যুক্তি পুরাতত্ত্ব বিভাগ মেনে নেবেন কি না। নিতে পারলে 'কম্পারেটিভ রিলিজেন'-এর এই অবলুণ্ড গঙ্গোত্রী-তীর্থটি উটের পুরীষ ও হারেমসারার শৌচাগারের পৃতিগন্ধময় পরিবেশ থেকে মুক্তি পাবে।

শেখ সেলিম চিস্তির কবর

সৈয়দ রিজভী বলেছেন, "সেলিম চিস্তির মার্বেল-মক্‌বরার বর্ণনা দিতে সকলেই ভালজাতের বিশেষণের খোঁজে অভিধান হাতড়ান... ভারতবর্ষের যাবতীয় মর্মর সৌধের মধ্যে এটি অনন্য।"

শেখবর্ণের এ সমাধিসৌধ বাস্তবে না দেখলে অনুভব করা যাবে না এর নয়নাভিরাম রূপ। দু-একটি কথা বলব :

প্রথম কথা, আপনারা হয়ত তাজ ও ইতমুউদ্দৌলা দেখার পর ফতেপুর সিক্রিতে এসেছেন, তাই প্রথমেই খেয়াল করবেন, এ সৌধ তাদের পূর্বসূরী। এবারে লক্ষ্য করে দেখুন সন্দোখ-ঘিরে কী সূক্ষ্মজালি কাজ। অভূতপূর্ব!

দ্বিতীয়ত, সমাধিসৌধ ঘিরে প্রসারিত বাহু ছজ্জা যেন শেখ সেলিম চিস্তি— শূন্য আতপতাপ থেকে নয়, রোগরশোক দুর্দৈবের হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতে বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর হাত।

তৃতীয়ত, ব্র্যাকেটের ডিজাইনটা লক্ষ্য করেছেন? ইংরেজী S অক্ষরের মত। মাপের ফণা? মরালতীবা? না! তাওতো নয়! তবে কিসের মতো? হঠাৎ হয়ত মনে পড়ে যাবে—বীরভূম অথবা বাঁকুড়ার কোন মেলায় দেখা দরবেশ, মুশকিলী আসান বা ফকিরকে। উননবই বছরের দরবেশ শেখ সেলিম চিস্তিকে কি সত্রটি অমনই একটি লাঠি ঠুকঠুক



ফতেপুর সিক্রির কিছু বিতর্কিত স্থাপত্য

করে ঘুরতে দেখেছিলেন? সেলিম চিন্তি নই, আকবরও নিশ্চিহ্ন, কিন্তু ঐ বন্ধিময়টির ছায়াপাতটুকু শাশ্বত হয়ে আছে ব্র্যাকেট ডিজাইনে।

সবশেষে বলব, লক্ষ্য করে দেখুন, ছাদের জলনিকাশি ব্যবস্থাটি।

ছাদের চারিদিক ঘিরে নিশ্চিহ্ন প্যারাপেট। ব্যাপার কী? তাহলে বৃষ্টির জলটা নিকাশ

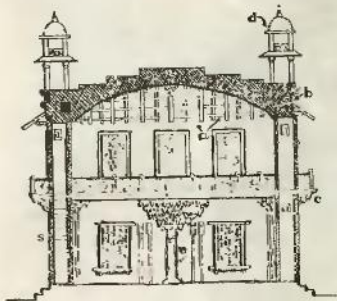
হয় কোনপাশে? গহিড়কে জিজ্ঞাসা করবেন, সে দেখিয়ে দেবে। গম্বুজ-ধোয়া জলটা একটি ফাঁপা ভারবহী স্তম্ভের ভিতর দিয়ে জমায়েত হয় শেহানের কেন্দ্রীয় জলাধারে। যে জলে অঞ্জু করে ন্যামাজ পড়ার নিয়ম।

সেলিম চিন্তির দরগায় মুহু হবার অবকাশ অনেক—কিন্তু মাপ করবেন আমার স্থূল দৃষ্টিভঙ্গিটাকে, আমি সবচেয়ে অভিভূত হয়েছি ঐ প্রয়োগ বিদ্যার অভিনবত্বে! কী অপরিমীম শ্রদ্ধা সঙ্গটের। আকাশ থেকে যে জলধারা আন্নার বিগলিত করুণাধারার মত নেমে আসবে গম্বুজে, তাতে যেন কারও পা না লাগে! তাই অতি নিঃশব্দে এই আয়োজন! গুরুর স্মৃতিতে মঠ-মন্দির-মসজিদ-গির্জা তো কতই দেখলাম—এর পূর্বে ও পরে কিন্তু এমন একটি শব্দবিনশ হৃদয়ের পরিচয় তো আর কোথাও পাইনি।

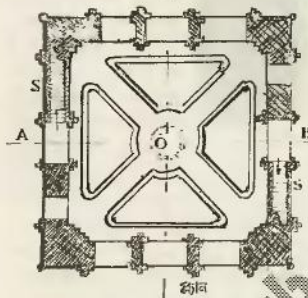
দৌলতখানার রহস্য

ক্যামেরায় যদি একটিমাত্র ফিল্ম অবশিষ্ট থাকে তখন টুরিস্ট বিধায় পড়েন—ফতেপুর সিক্রিতে কিসের ফটো তুলবেন? বুলন্দ-

দরওয়াজার, না দৌলতখানার ঐ কেন্দ্রীয় স্তম্ভের? সঙ্গে ফ্লাশ-বাথ থাকলে নির্বাচনে দ্বিতীয়টিই সচরাচর জেতে।



A-B চকর



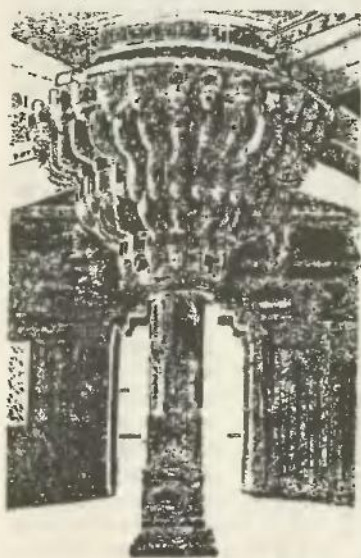
খাম্বাহল (?) দৌলতখানি (?)

[ইবাদতখান-ই-খাম্বা ?]

পুরাতত্ত্ব বিভাগের রিপোর্টে বলা হয়েছে “এটি দেওয়ান-ই-খাশ নয়, ইবাদতখানাও নয়; সম্ভবত এখানে বসে সশ্রুট তাঁর মণিমুক্তা-জহরতগুলি পরীক্ষা করতেন।”

তব্বটা মেনে নিতে মন সরে না।

আবুল ফজল অবশ্য বলেছেন, সরকারি তহানার তিনটি বিভাগ ছিল। একটায়



থাকত তাম্রমুদ্রা; দ্বিতীয়টিতে সোনা ও রূপা; তৃতীয়টিতে মণিমুক্তা-জহরত। কিন্তু সেই তথ্যের ভিত্তিতে এই সৌধকে দৌলতখানারূপে চিহ্নিত করা অযৌক্তিক। তাহলে ইমারতের অসামান্য স্থাপত্য নিরর্থক হয়ে যায়। কেন ঐ বিচিত্রদর্শন কেন্দ্রীয় স্তম্ভ? কেন দুপাশে দুটি সিঁড়ি? কেন দ্বিতলে রথনেমির কেন্দ্রস্থলে সিংহাসন স্থাপনের আয়োজন?

স্থাপত্যের বিচারে এ সৌধ অনন্য—একমেবাদ্বিতীয়ম্। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের অপূর্ব মিলন ঘটেছে এখানে। স্থপতি যদি নিতান্ত ব্যতুল না হন, তাহলে ব্যবহারিক উপযোগিতার মূল্যায়নে এ ইমারতকে কষে ধরেতে হয়।

এতটুকু বাড়িয়ে দু-দুটি সিঁড়ি (S) বাহ্যিক; বাসের পাশে এ প্রকাম সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। স্থপতি গম্বুজ

খানার প্রাচীরে ১৩৫০, ১৩৫০, ১৩৫০-সিঁড়ি।

বানিয়েছেন, কিন্তু নিচে থেকে পাথরের কড়ি-বরগা (a) স্তম্ভদর্শকদের বুঝতে দেননি কী-ভাবে ছাদের ভার রক্ষিত হচ্ছে। বাহিরের দিকে হিন্দু-ব্রাহ্মণ (c) এবং চার কোণে চারটি ইসলামী চতুস্তম্ভ বা কিয়স্ক (d) সম্বন্ধে বিস্ময়কর ঐ কেন্দ্রীয় স্তম্ভটি, যা বিশ্ববিখ্যাত। তার পাদপীঠ চতুষ্কোণ, তার উপর হিন্দু মন্দিরের অষ্টদিকপালের আটকোণা : তার উপর পারসিক নকশাযুক্ত বোল-কোণা। সবার উপরে তিন-থাকে এক বিচিত্র অলঙ্কার! কী এই বিচিত্রদর্শন স্তম্ভের বাজনা?

সেটা আপনার অভিরুচির উপর নির্ভর করে। বলতে পারেন—ঐ একমেবাদ্বিতীয়ম্

স্তম্ভটি বলতে চায় : লা ইলাহা ইল্লা লাহা (আল্লা ভিন্ন অন্য প্রভু নাই) অথবা “আই অ্যাম হু অ্যাম :” কিম্বা “য একবর্ণ্য বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান নিহিতার্থ দধাতি....”

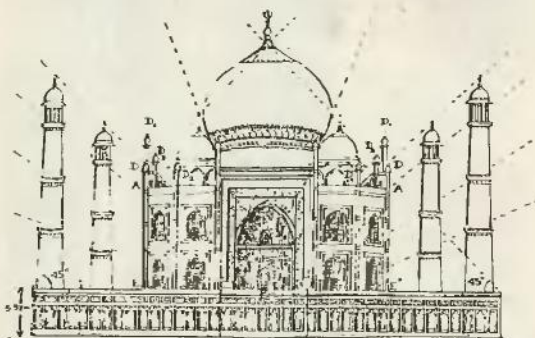
তাই আমার মনে হয়েছে (আমার সনাত্ত করা) ইবাদত্‌খানার অতি সন্নিকটে নির্মিত এই বিচিত্র সৌধে সম্রাট বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণীদের নিয়ে সম্মেলন ধর্মালোচনা করতেন। এমন বিষয়ে আলোচনা হত যা ধর্মাক্ত পুরোহিত বা মোল্লাদের সামনে করা যায় না ; সাধনমার্গে যাঁরা একধাপ উপরে উঠেছেন, যাঁদের সঙ্গে জনান্তিকে আলোচনা করা যায় : নিরীশ্বরবাদীদের যুক্তি, চার্বাক দর্শন, আউল-বাউল বা সুফী পণ্ডিতদের অতি অন্তরঙ্গ মরমিয়া-কথা। অর্থাৎ এ মোকাম : ইবাদত্‌খানা-ই-খাশ্ !

প্রতিযোগীরা ভিন্ন ভিন্ন সোপান বেয়ে দ্বিতলে উঠে আসতেন, বসতেন সম্রাটের চতুর্দিকে। সম্রাটের আসনটি ছিল কেন্দ্রীয় স্তম্ভের উপর এক ঘূর্ণমান সিংহাসন।

স্বীকার করছি, এ-এক অবিশেষজ্ঞের নিতান্ত অনুমান। পণ্ডিতেরা বলেননি। মানা-না-মানা আপনাদের অভিরুচি।

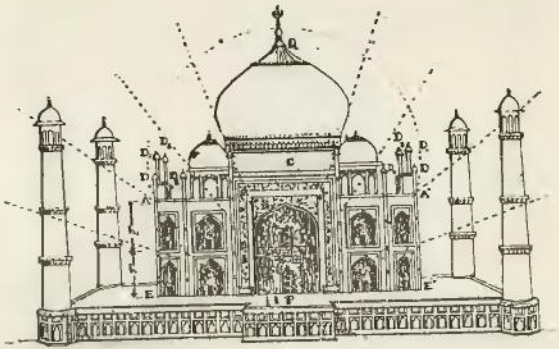


তাজমহল ও হিন্দু শিল্পশাস্ত্র



(চিত্র- ১)

তাজের সম্মুখদৃশ্যের মৌল ন্যাদনিক ছন্দটি রূপায়িত হচ্ছে 'বিলীয়মান-বিলু'-র সংস্থাপনে। কেন্দ্রীয় জলাধারে দণ্ডায়মান দর্শকের দৃষ্টি যখন মোকাম-কুসির সমতলে (জমি থেকে ৫.৭৭ মিটার উচ্চে) থাকে (চিত্র ১) তখন সে-বিলীয়মান-বিন্দুটিকে দেখে প্রবেশ পথের কেন্দ্রে। আবার প্রধান প্রবেশ-তোরণের দ্বিতলীয় খালিকনি থেকে যদি সে গুরুভাবলোকনে তাজকে দেখে (চিত্র ২) তখন তার দৃষ্টিতল উপরে উঠে যায়-বিলীয়মান বিন্দুটি উঠে যায় প্রধান ইবান-এর খিলান-শীর্ষে। ন্যাদনিক ছন্দটি রূপায়িত হয় একটি উদ্যানভানুর রবির-শঙ্কটায় ভঙ্গিতে। অথচ এই প্যাটানটি ব্যতুশাস্ত্রসম্মত 'এলিভেশন'-চিত্রে আদৌ সৌধের মাস না (চিত্র ৩)। এলিভেশনে আমরা দেখি, সৌধের বিস্তার যতটা উচ্চতায় ওঠে ততটা এলিভেশন চিত্রে মোকাম-কুসির (প্রবেশের)



তাজমহলের পার্সপেক্টিভ, দৃষ্টান্তল প্রবেশতোরণের দিকতল বারাদ্দ।

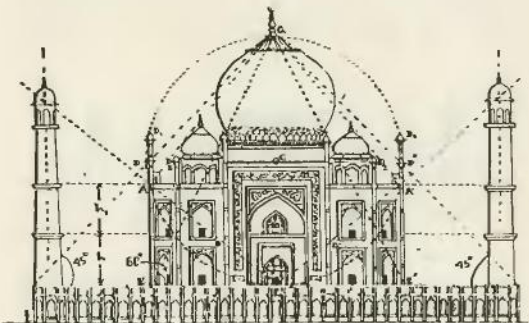
(চিত্র ২)

শেষপ্রান্তে দুটি পয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ রচনা করলে তা স্বাভাবিকভাবেই পিছনের মিনারিকায় অদৃশ্য। এই এলিভেশন চিত্রটি দেখে বিশ্বাসই হয় না যে পরিপ্রেক্ষিত চিত্রে এমন সুন্দর একটি প্যাটার্ন দেখা যাবে।

কিন্তু কেন ঐ উদয়ভানুর রশ্মিচ্ছটা? শুধুই কি একটা নয়নাভিরাম প্যাটার্ন? ওর কি বিশেষ কোনও ব্যঞ্জনা আছে? ওটা কি বিশেষ কিছু 'প্রতীকী'?

বিলীয়মান-বিন্দুর এই যে সৌন্দর্যসৃষ্টি এ কোনও ভেঙ্কি নয়। সিমেন্টিকাল ইমারতে এমনটাই হবার কথা। পরিপ্রেক্ষিত-বিজ্ঞানমতে। কিন্তু এ তথ্যটি তো সব জাতের ভারসাম্য-মূলক ইমারতের হবার কথা—হুমায়ুন মক্বারায়, ইত্যমুদ্দৌল্লায়, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে। কিন্তু অন্য কোথাও তো এটা এমনভাবে দেখি না। অপটিক্স-বিজ্ঞানে কতখানি অধিকার থাকলে এই বিজ্ঞান-সম্মত ভেঙ্কি স্বেচ্ছায় সম্ভব তা আপনি আমি বুঝব না, বুঝবেন যাঁরা আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ার।

অপটিক্স-বিজ্ঞানে তাজনির্মাতা ছিলেন আলিম। প্রধান ইবানের দুপাশে কুরাণশরিফের যে বাণী তুঘরা হাফে লেখা সেগুলি দেখলে মনে হয় সবগুলি অক্ষর বুঝি সমান মাপের। আসলে তারা তা নয়, বড় থেকে ছোট। তবুটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে সংলগ্ন (চিত্র ৭) থেকে। প্রতিটি অক্ষর স্বনতি সমান মাপের মনে হবে যখন তারা দর্শকের দৃষ্টিতে সমান কৌণিক মাপ দর্শন করবে। পাশ্চাত্যে TAJ MAHAL বড় ছোট মাপে



তাজমহলের এলিভেশান বা দাঁতুশাচসম্মত সংস্করণ।

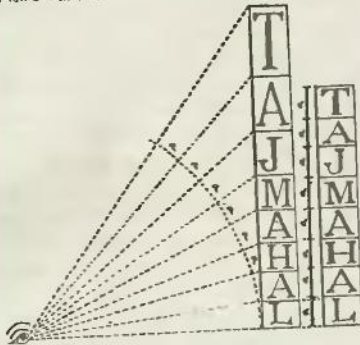
(চিত্র 3)

লেখা হয়েছে বলেই প্রতিটি অক্ষর সমান মাপের মনে হচ্ছে। এই প্রয়োগ কৌশলের ল্যাটিন নাম ট্রোম্পলি'ওই। এই প্রয়োগকৌশল তাজমহলে সুনিপুণভাবে প্রযুক্ত।

আমার মৌল বক্তব্য : তাজ পরিকল্পনাকার আকবরী স্থাপত্য দর্শনে বিশ্বাসী। সম্ভবত শাহজাহাঁর অজ্ঞাতসারে। হিন্দু ও মুসলমান—এই মহান উপদ্বীপের দুই প্রধান প্রতিবেশীর মাঝখানে একটা মিলনসেতু রচনা করতে চেয়েছিলেন আকবর, তাঁর স্থাপত্যের মাধ্যমেও। তারপর অর্ধশতাব্দী অতিক্রান্ত। সেই আকবরী চিন্তাটা নিয়ে আর ফ্রেড মাথা ঘামায়নি। এ পণ্ডাশ বছরে—ইতমদউদ্দৌলা। জাহাঙ্গীরী মক্কারা, আত্রা কিল্লার সম্প্রসারণে সেই অনুভাবনাটি তিল তিল করে বিস্তৃতির অতলে তলিয়ে যেতে বসেছিল। তাজ পরিকল্পনাকার—তিনি যেই হোন—সেই মহান দার্শনিকদের শেষ প্রয়োগ করেছেন তাজে। তার প্রতিটি অঙ্গে সেই বেদাগ মিলনচিহ্ন। ভূমি-নকশায়, পঞ্চরত্ন-দেউলে, তাজের-মন্দিরের ছন্দে গম্বুজে, ঐ মন্দিরের মহাপাশ-ঘটা কলস গ্রহণ করে ত্রিশূলের পরিবর্তে ঈদের চাঁদ সংস্থাপন করে। সবই গোপন। কারণ তাঁকে এবার 'ট্রাবিয়েট' শাহজাদার সঙ্গে 'আর্কুয়েট'-হিন্দ রাজকুমারীর বিবাহ দিতে হয়েছে গোপনে—গোঁড়া সুরি মুসলমান শাহজাহাঁর চক্ষুর আড়ালে।

হিন্দু শিল্পশাস্ত্র মতে শিল্পের ক্ষুদ্র-ভঙ্গ। আকবর এ তত্ত্বটা জানতেন, এবং মানতেন, তা বুলন্দ দরওয়াজা মূল্যায়ন-কালে আমরা দেখছি। তাজ শিল্পী যদি একই পথের পথিক

হন তাহলে তিনিও নিশ্চয় এ-ভারে ডেবেছেন। ভাষান্তরে আমাদের বক্তব্য : হ্যাভেল যে বলেছেন, 'দি তাজ বিলংস্ টু ইন্ডিয়া, নট টু ইসলাম', তা ঘটনাচক্রে হয়নি, শিল্পীর সজ্ঞান প্রয়োগেই তা হয়েছে। শ্রী পি. এন. ওক. এর মত আমরা বিশ্বাস করি না—তাজ একটি হিন্দু স্থাপত্য। আমাদের বিশ্বাস এটি ইন্দো-ইসলামী কীর্তি। অবশ্যই শিল্পী হিন্দু শিল্পশাস্ত্র বিষয়েও আলিম।



(চিত্র 4) তাজে trompe l'oeil প্রয়োগকৌশল।

বাৎসায়ন প্রণীত 'কামসূত্রের' টীকায় যশোধরা একটি গ্লোক উদ্ধার করে বলেছিলেন, শিল্পের ছয়টি অঙ্গ : রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য-যোজনা, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ।

তাজের ক্ষেত্রে 'রূপভেদ' ও 'প্রমাণ' সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দর্শক সহজেই বুঝতে পারেন তাজ একটি সমাধিসৌধ, মেপে দেখতে পারেন তাতে 'প্রমাণ' অর্থাৎ মাপজোপের হিসাবে তিলমাত্র বিচ্যুতি নেই।

তৃতীয় অঙ্গটি—'ভাব'। নয়নেদ্রিয়গ্রাহ্য শিল্পের মধ্যে চিত্র ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেই এ অঙ্গটি প্রত্যাশিত। স্থাপত্যে নয়। কোন একটি ইট-পাথরে গড়া ইমারতের 'ভাব' পরিস্ফুট হবার অবকাশ কোথায়? ধ্বনির পর ধ্বনি সুনিপুণভাবে সাজিয়ে নিটোফোন থেকে রবিশঙ্কর ভাব সৃজন করতে পারেন, কথা সাজিয়ে সাজিয়ে তাঁ করেছেন কালিদাস থেকে রবীন্দ্রনাথ : তুলির টানে তাঁ করেছেন অজস্র শিল্পী থেকে অবনটাকুর : এমনকি পাথর খোদাই করে ভাবরূপ মূর্ত করেছেন মিকেলান্জেলো থেকে মহাবলীপুরমের ভাস্কর। কিন্তু স্থাপত্য? ওলন-পাঁটা কর্কক সম্বল স্বাজমিরি 'ভাবরূপ' মূর্ত করেছে—একথা কে করে শুনছে? ওটা যে হবার নয়। কেন নয়? কারণ ভাব হচ্ছে শিল্পের অন্তরঙ্গের সম্পদ, বহিরঙ্গের নয়। ইমারতের বহিরঙ্গ সর্বস্ব।

তাজ-শিল্পী বিশ্বনন্দনতর্কে একমাত্র ব্যতিক্রম। তিনি বললেন, না। সেতারের তার,

কবির কলম, শিল্পীর তুলি যদি ভাবরাজ্যের মনোজগতে দর্শকের উষাও হওয়ার পাথেয় যোগাতে পারে, তবে স্থাপত্যও তা পারবে।

দিনের এক এক সময় তাজের এক এক ভাবরূপ, বছরের এক এক ঋতুতে তার এক এক আবেদন। উষার প্রথম আলোকস্পর্শে-জেগে-ওঠা বালারূরাগ রঞ্জিত তাজ কিশোরীর অবাক স্বপ্নের মত অপাপবিদ্ধ, নিদাঘ-মধ্যাহ্নে তার হীরকজ্যোতির জৌলুসে চোখ ঝাঁপিয়ে যায়, আবার বিষণ্ণ প্রদোষে বিদায়ী-সূর্যের শেষ লালিমা মিলিয়ে গেলে সে উদ্যাসীন বসে থাকে। তখন হৃদয় বেদনায় আত্মত হুয়ে যায়। পূর্ণিমা-রাতে তাজকে দেখেছেন? অতীন্দ্রিয় অনুভূতি দিয়ে গড়া এক অবগুণ্ঠনবতী। শূনেছি, নির্মেষ্য অমাবস্যারাত্রি বিশ-ত্রিশ বছর আগেও তাজের আর এক ভাবমূর্তি ফুটে উঠত। অযুত-নিযুত আলোকবর্ষের ওপার থেকে অতি ক্ষীণ আলোকে আবছা দেখা যেত তাজের বহিরঙ্গরেখা। সে তাজের আবেদন নাকি যাঁরা দেখেছেন তাঁরা বলেছেন—অনির্বচনীয়। অধুনা আশ্রা শহরের বিজলীর রোশনাইয়ে সে তাজ হারিয়ে গেছে।

শীতের কুয়াশা ঢাকা আধো প্রস্ফুটিত তাজ, যমুনার পরপারে পুঞ্জীভূত বর্ষার জলদসঙ্গারে ঘনকৃষ্ণ পশ্চাৎপটে 'থিরবিজুরি'-র মত তাজ—এদের ভাবরূপ সম্পূর্ণ পৃথক। একই সেতারের তারে কখনও বেহাগ, কখনও ইমন, কখনও বা পূরবী।

'লাবণ্য-যোজনা'-র অঙ্গটিও কানায় কানায় টলমল। 'লাবণ্য' প্রসঙ্গে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নিটোল একটি মুক্তার দানার সর্বঙ্গে যে চলচল তরলিত আভা, সেটি যদি শিল্পী রূপায়িত করিতে পারেন তবে তাঁহার মুক্তা ঐক্য সার্থক। ইহাই লাবণ্য-যোজনা।'

ষড়-অঙ্গের শেষ অঙ্গ—বর্ণিকাভঙ্গ। লিপিচাতুর্য। এখানেও শিল্পী শতকরা শতভাগ সার্থক : সিলিঙ-এ সন্দোখ ঘেরা জালি কাজে, ড্যাডোর Pietra dura, opus sectile অথবা ইনলে কাজে।

কিন্তু ষড়-অঙ্গের পঞ্চম অঙ্গ : 'সাদৃশ্য'?

এটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন।

কারণ এ অঙ্গটি শুধুমাত্র চিত্র-শিল্পেই প্রত্যাশিত। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে নয়। তবু বুলন্দ দরওয়াজায় আমরা দেখেছি, বাদশাহ্ আকবর কী বিচিত্র কায়দায় এই 'সাদৃশ্য' অনুভাবনাটি ব্যবহার করেছেন বীররস, ভয়ানক রস ও শান্ত রসের পরিবেশনে। তাজে কিন্তু তা করা হয়নি।

এই প্রসঙ্গেই উঠছে ঐ উদয়-ভানুর বিচিত্র প্যাটানটির মাথাধর্মের কথা।

শিল্পী কি তাঁর স্থাপত্যের মৌল বস্তুব্যাটা বলতে চেয়েছেন ঐ প্যাটানটির মাধ্যমে? একটি 'সাদৃশ্য' পরিবেশন করে? এ ইমারতের মৌল বস্তুব্যাটা কী?

'মুগল রাজবংশের পুরুষসিংহ এখানে শায়িত।'

যদি সাদৃশ্যের মাধ্যমে একথা বলতে হয় তবে মুগল রাজবংশের প্রতীকচিহ্ন কী হতে পারে?

এখানে নিবেদন করি : স্বাধীন ভারতের সীলমোহর যেমন অশোকচক্র, তেমনি মুগল সৈন্যদলের নিশানে যে প্রতীকচিহ্ন যাকে বলে হেরাল্ড বা স্ট্যান্ডার্ড—তা ছিল উদয়সূর্যের

সম্মুখে নতজানু একটি সিংহ।

গোটা ইমারতও কি তাই বলতে চাইছে? তাজের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উচ্চতা ও অন্যান্য মাপজোপ এমনভাবে নির্ধারিত হয়েছে যাতে পরিপ্রেক্ষিত চিত্রে—দৃষ্টিকোণ যেখানেই থাক—দেখতে পাওয়া যাবে, উদয়ভানুর ঐ রবির রশ্মিচ্ছটা। রেখাগুলি শিল্পী টানেননি, টেনেছেন আপনি, দর্শক। কারণ শিল্পাচার্যের ভাষায়, ‘ভাবের অনুরণন যাহা দেয় তাহা উত্তম সাদৃশ্য, আর কেবলমাত্র আকৃতি বা রূপের অনুকরণ যাহা দেয় তাহা অধম সাদৃশ্য।’

তাই নতজানু সিংহকে দেখতে হবে মানসচক্ষে : মৃত্যুর মহিমায় কবরে শায়িত আল্লাতালার সম্মুখে নতজানু ঐ পুরুষ সিংহটিকে : শাহজাহাঁকে !

এখানে একটি সঙ্গত প্রতিপ্রশ্ন হতে পারে। যদি স্বীকারও করে নেওয়া যায় যে, এই বিচিত্র নকশার ছন্দে তাজ-শিল্পী মুগল নিশানের প্রতীকটি ব্যবহার করেছেন, তবু এটা যে হিন্দু শিল্পসম্মত ‘সাদৃশ্য’ তা বুঝব কেমন করে? ‘প্রতীকী’ অলঙ্কার তো সব জাতের শিল্পেরই উপাদান, কী প্রাচ্যে, কী প্রতীচ্যে। এমনকি আধুনিক চলচ্চিত্রেও তা ব্যবহৃত। আদি কবির আদিমতম শ্লোকে রাবণের প্রতীক ব্যাধ, রামসীতার প্রতীক কৌণ্ড মিতুন। কালিদাস শকুন্তলার প্রথম অংশেই যখন লিখলেন ‘ভো ভো রাজন আশ্রমমৃগোহং ন হস্তব্যা ন হস্তব্যঃ’ তখন মুগ কে? শকুন্তলার প্রতীক নয় কি? এগুলি কি ‘সাদৃশ্য’? অথবা আরও দূর দেশে যাওয়া যাক। মিকেলাঞ্জেলো তাঁর জীবনের প্রথম ভাস্কর্য গড়েছিলেন সিঁড়ির তলায় শিশু-যীশু ক্রোড়ে মেরী মাতার মূর্তি। সেখানে যখন দেখি শিশু পীতরের হাত এবং সিঁড়ির ‘ব্যালাস্ট্রেড’ মিলে-মিশে একটি ক্রুশচিহ্ন রচনা করেছে, তখন বেশ বুঝতে পারি—যীসাস্-এর অন্তিম পরিণামটা কিশোর শিল্পী একটা তির্যক ‘প্রতীকী’র মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। এ প্রতীক অবনীজ্ঞানথ ব্যাখ্যাত, হিন্দুশিল্পসম্মত শতকরা শতভাগ ‘সাদৃশ্য’। কিন্তু মিকেলাঞ্জেলো যে হিন্দু শিল্পশাস্ত্র-অধ্যয়ন করেননি এটাও ত শতকরা শতভাগ সত্য।

সেভাবে গ্রহণ করলে, তাজের ঐ নান্দনিক ছন্দটি—উদয়ভানুর চরণমূলে নতজানু সিংহ—একটা প্রতীকী, সাদৃশ্য নয়। তা সে সিম্বলিজমই হক, আর সাদৃশ্যই হক, শিল্পী যেসুনিপুণভাবে সেটি ব্যবহার করেছেন এতে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। সে জন্য রইল সেই অজ্ঞাত তাজ পরিকল্পনাকার—মীর মহম্মদ গাজী মিঞা ‘অ্যানন’ এর উদ্দেশ্যে—আপনার-আমার লাখো সালাম !

তাজমহলের নব-মূল্যায়ন

তাজমহল সম্ভবত এই পৃথিবীতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি। এ কথা ঘোষণা করার জন্য বিশেষ পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নেই। যুগে যুগে বিভিন্ন মনীষীরা সে কথা সোচ্চারে বলে গেছেন। ব্যতিক্রমই যে নিয়মের পরিচায়ক তার প্রমাণস্বরূপ কিছু বিরুদ্ধ মতও আছে; যথা : বুডিয়র্ড কিপলিঙ অথবা অলডাস্ হাঙ্গলে। তা হোক, তবু ফার্গুসন থেকে রবীন্দ্রনাথ তাজমহলের যে ভাবরূপ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, তারপর তার নব-মূল্যায়নের প্রচেষ্টা হয়ত ষ্টূতা মনে হবে। তবু পূর্বসূরীদের বিশেষণের প্রভাবমুক্ত হয়ে আজ খোলা মনে সেটা যাচাই হওয়া উচিত।

প্রথম কথা : যে-অর্থে নিউটনের গতি-সূত্র, ডারউইনের বিবর্তনবাদ বা আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক-একটি ক्रास्तিকারী আবিষ্কার, সে অর্থে বিশ্ব কেন, ভারতের স্থাপত্য-ইতিহাসেও তাজমহল কোন মৌলিক পদক্ষেপ নয়। নূতন কোনও প্রয়োগ কৌশল, নূতন কোনও দিক্‌দর্শনের জন্য নয়, তাজমহল অনন্য এজন্য যে, সে : তিলোত্তমা। প্রাথমিক হিন্দু, পারসিক ও ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যচিন্তার শুধুমাত্র গুণগুণি একানে সঙ্কলিত, দোষগুলি বর্জন করে। তাজমহলের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, সে তার আকার, আয়তন ও ‘ম্যাস’ (Mass) কে অতিক্রম করে একটা ভাবরূপকে মূর্ত করে তুলেছে—লঘুপক্ষ মেঘের মতো, অলীক স্বপ্নের মতো।

দ্বিতীয় কথা : মূল্যায়নের সঙ্গে একটা ‘সেন্টিমেন্ট’ ওতপ্রোতভাবে এবং অহেতুকভাবে জড়িয়ে গেছে : সম্রাটের অমর প্রেম। শেষ প্রশ্নের কমলমণির সঙ্গত প্রশ্ন সবেও আমরা ও বিষয়ে একটা বঙ্গমূল সংস্কারে আবদ্ধ। আমরা ভুলে যাই : চতুর্দশতম সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে যে বেগমটির মৃত্যু হল, সেই মমতাজ মহল শাহজাহাঁর একমাত্র পত্নী নন। তাঁকে বিবাহ করার (1612) পূর্বে সম্রাটের প্রথম স্ত্রীর গর্ভে একটি কন্যার জন্ম হয়েছিল (1611) ; এবং মমতাজের চার-চারটি সন্তান হবার পরেও তিনি পুনরায় বিবাহ করেন (1617)। সম্রাটের প্রেম আদৌ একনিষ্ঠ ছিল না। আমরা আরোও ভুলে যাই : শাহজাহাঁ এবং মমতাজের উনিশ বছর দুইমাস এগারো দিনের বিবাহিত জীবনের মধ্যে চৌদ্দটি সন্তানকে জন্ম দিতে গিয়ে গর্ভবী সময়ের ব্যবধান পেয়েছিলেন গড়ে এক বছর চার মাস এগারো দিনের। ভুলে যাই : হাকিম ওয়াজির হুসৈন মতে মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সে আর্জুবান বানু বেগমের মৃত্যুর হেতু : রক্তাক্ত—বারে বারে সন্তানধারণের দৈহিক ক্ষয় !

তৃতীয়ত : তাজের নির্মাণ ব্যয়ের ব্যর্থতা। মার্কিন মূল্যে বাস্তাকারের একটা সংজ্ঞা প্রচলিত আছে 'ইঞ্জিনিয়ার তাকেই বলবে যে এক-ডলারে এমন একটা কিছু পয়দা করতে পারে যা যে কোনও মূর্খ পারে দু-ডলারে।' এ সংজ্ঞা অবশ্য আদি কিছা মধ্যযুগের কোনও গজদস্তমিনারবাসী স্বীকার করেননি। মানেননি মিশরের ফারাও, পারস্যের শাহ, চীনের সম্রাট বা চতুর্দশ লুই। ফলে এজন্য শাহজাহাঁকে দায়ী করি কোন আক্কেলে। দায়ী নাই করুন, হিসাবটা দেখতে দোষ কী? খরচ হয়েছিল সাড়ে আঠার কোটি টাকা। তার অর্থ কী? শাহজাহানী এক তঙ্কায় তখন কত মন চাউল খরিদ করা যেত? একজন মেহনতি মানুষ কতদিন কোদাল চালিয়ে এক তঙ্কা উপার্জন করত? জানি না। কিন্তু প্রায় সমসাময়িক নথী থেকে জানি—অতি প্রকাণ্ড লাল কিল্লার যাবতীয় ইমারৎ, প্রাচীর, পরিখা, জলসরবরাহ-ব্যবস্থা, অলঙ্করণ ও আসবাব সমেত মোট খরচ হয়েছিল দশ কোটি টাকা। অর্থাৎ তাজের প্রায় অর্ধেক। শুধু তাই নয়, জমির মূল্য সহ তাজমহলের যাবতীয় ইমারৎ বানাতে—সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ শেষ করতে খরচ হয়েছিল মাত্র পঞ্চাশ লক্ষ টাকা। বাকি আঠার কোটি নাকি খরচ হয়েছিল অত্যন্ত দামী পাথরের অঙ্গসজ্জায়, যা বর্তমানে অবলুপ্ত। হিসাবটা প্রায় অবিশ্বাস্য—অথচ তাই লেখা আছে সমসাময়িক ইতিহাসে। যার অর্থ দাঁড়ায় : সম্রাট যে পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিলেন তার প্রায় তিনশতাংশ আজ আপনি-আমি দেখতে পাই। বাকি সাতানব্বই শতাংশ লুট হয়ে গেছে, বর্বর নাদির শাহ থেকে 'বিদগ্ধ' ইংরাজ আমলে।

প্রশ্নটা উঠছে তাই থেকেই। বিচক্ষণ সম্রাট এই সাদা কথাটা কেন বুঝলেন না? কেমন করে তিনি আশা করলেন, অনাগতকাল তাঁর বেগমের প্রতি শ্রদ্ধাবশত ঐ হীরা-মুক্তা-জহরৎ ওখানে থাকতে দেবে? তিনি নিজেই কি তাঁর পিতামহের নির্মিত ইমারৎগুলি ধ্বংস করে হাল ফ্যাसानের মোকাম বানাননি, আত্মা কিল্লার? টুটেনখামেন-এর নাম না জানলেও সোমনাথ মন্দিরের কথা তো তাঁর জানা ছিল।

সবচেয়ে বড় কথা—এমন ধারণা করার যথেষ্ট কারণ থাকে যে, সম্রাট তাজমহল পরিকল্পনাকারের নামটি ইতিহাস থেকে সজ্ঞানে মুছে দিয়েছেন। তাজমহল নির্মাণ-ইতিহাসের সরকারি ঐতিহাসিক মীর মুগল বেগ জানাচ্ছেন, সম্রাট তাঁর লোকান্তরিত পত্নীর জন্য এমন একটি মক্বারা বানাতে চাইলেন যা হবে নায়ার (নতুন), কামাল (সার্থক), লভিফ (উৎকৃষ্ট) এবং আজিব-ই-ঘারিব (বিশ্বব্যপ্তি ইমারৎ)। সম্রাটের ইচ্ছানুসারে কাবুল-কান্দাহার-ইরান-তুরান থেকে 'ক্লাগজ-নকশায়ে মক্বারা হর-এক উস্তাদ মৌ আত্মাভদাত' (হরেক ওস্তাদ কাগজে নকশা ছকে টেভার দাখিল করলেন)। পরের পৃষ্ঠাটি : 'চুন-এক নকশা পসন্দ আলিঙ্গি হজরৎ' (তার ভিতর একটি বিশেষ নকশা সম্রাটের পছন্দ হল)। ব্যাস! ঐটুকুই নকশা? কে সেই অসামান্য স্থপতি? ইতিহাস নীরব। অথচ দেখুন—এই ইমারতে কত হাজার কত শ' কত হীরা-চুনী-প্রবাল-পাশা-মুক্তা ব্যবহৃত হয়েছে তার নিখুঁত হিসাব রাখা আছে।

নামটা বাদ দেওয়া যে অনুযায়ী হল, এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক কিন্তু সচেতন। তাই পরবর্তী অনুচ্ছেদে সাক্ষ্যই গাইছেন—এ নকশা অনুযায়ী কাঠের মডেল বানানোর পর অনেক

উস্তাদ অনেক পরামর্শ দেন, যার ফলে বেশ কিছু অদলবদল করা হয়। যেন এটা একটা যৌথ পরিকল্পনা। বেশ, যদি ধরেও নেওয়া যায়, তাজের পরিকল্পনাকার একজন নয়, একটি 'টীম', তাহলেও প্রশংসা থেকে যায়। সভ্যতার ইতিহাসে দেখি, যৌথ প্রচেষ্টায় যখনই মহৎ কিছু সৃষ্ট হয়েছে, তখনই কেন্দ্রবিন্দুতে দেখা গেছে একজন অসীম প্রতিভাধর মানুষকে। রাশিয়ার বিপ্লব একটি যৌথ সাফল্য—কিন্তু কেন্দ্রবিন্দুতে একটি মাত্র মানুষ : লেনিন। তাঁর পশ্চাৎপটে 'ডাস্‌ ক্যাপিটাল' হাতে মার্কস। পারমাণবিক শক্তির আবিস্কার একটি যৌথ প্রচেষ্টা ; কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগের পিছনে একাধিক বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনা—রাদারফোর্ড, চাডউইক, জোলিও কুরি, এনরিকো ফার্মি, অটো হান। এখানেও পশ্চাৎপটে মাত্র একজন মানুষ : $E=mc^2$ ফর্মুলা হাতে আইনস্টাইন। তাজমহলের পরিকল্পনার পিছনেও আছে এমনি একটি ধারাবাহিক বিবর্তন-ইতিহাস : হুমায়ুন এবং খান-ই-জাহান-এর মক্কারা, চণ্ডীসেবা দেউল, তাজোর মন্দির, ইতমদুদ্দৌলা, সেকেন্দার প্রবেশ তোরণ। কিন্তু এসব কিছুর পশ্চাৎপটে কে সেই প্রতিভাধর পুরুষ, যার ধ্যানের দৃষ্টিতে ধরা দিয়েছিল তাজ, সবার আগে, সবার অলক্ষ্যে, সবার অগোচরে ?

যদি বলেন শাহজাহাঁ, তবে বলব—মেনে নিতে রাজী আছেন অ্যাটম বম্বের আবিস্কর্তা প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ? যেহেতু স্বরচের ব্যয়বরাদ্দ তাঁরই স্বাক্ষরের জোরে ?

শাহজাহাঁ নিশ্চয় নয়। আলিজাঁ হজরৎ অবশ্য জুহুরী, এটুকু কৃতিত্ব তাঁকে দেব ; কারণ 'চুন-এক নকশা পসন্দ'-এর কেরামতিটুকু তাঁর। তবে কে ? মোটামুটি পাঁচটি থিয়োরি আছে। তিনটি নিতান্ত অবচীন উক্তি। দুটি বিবেচ্য। কিন্তু কী লাভ আজ সেই অজ্ঞাতনামার পিতৃদত্ত নামটা উদ্ধার করে ? নামহীন হলেও তিনি বিশ্ববন্দিত : তাজমহলের পরিকল্পনাকার হিসাবে।

লোকগাথা বলে, "সদ্যসমাগু তাজমহল দেখে শাহজাহাঁ এতই অভিভূত হয়ে পড়েন যে, তাঁর আদেশে তৎক্ষণাৎ মূল পরিকল্পনাকারের শিরশ্ছেদ করা হয়। যাতে তাজের জুড়ি কেউ না বানাতে পারে।" অধিকাংশ পণ্ডিত বলেছেন—এটা নেহাতই গল্পকথা। আমরাও তাই বলি। তবে ঐ সঙ্গে মনে একটা সন্দেহও জাগে : যা 'বটে' তার কিছুই কি 'বটে' নয় ?

হয়তো লোকগাথাটিকে আক্ষরিক অর্থে নয়, ভাবার্থে নিতে হবে।

এটা সূর্যোদয়ের মত স্পষ্ট যে, সশাটের আদেশে না হলেও তাঁর ইচ্ছানুসারে মূল পরিকল্পনাকারের নামটা ইতিহাস থেকে মুছে ফেলা হয়েছে। টেটাল অ্যানিহিলেশন। সেটাই তো শিল্পীর পক্ষে শিরশ্ছেদ। কিন্তু হেতুটা কী ? একটিই সম্ভাব্য জবাব : অনাগতকাল যেন মুখ ফসকেও না বলে ফেলে 'শাহজাহাঁর তাজমহল'। বরং তারা বলুক—'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ।'

ভুল বুঝবেন না আমাকে। এ বক্রোক্তি স্বীকৃতিস্বরূপে প্রতি প্রযুক্ত নয়। ঐ অনবদ্য কবিতার লাভ প্রভাব থেকে পাঠককে মুগ্ধ করার জন্য এ আমার আত্মপক্ষ সমর্থন মাত্র। আমার বক্তব্য : গীতিকাব্যের সঙ্গ এক, আর ঐতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক তথ্য অন্য জিনিস। 'শাহজাহান' কবিতায় শাহজাহাঁ কে ? মিছরির দানায় সুতোটি বই তো নয় ?

কবির কাছে শাহজাহাঁ এক বিরহী আত্মার প্রতীক—যেমন বামির হাতে নিবে-যাওয়া প্রদীপ বিশ্বপ্রপাণ্ডের মহা-অবলুপ্তির দ্যোতক ; যেমন বালিকার কণ্ঠে ‘যেতে নাহি দিব’ এই মরণশীল দুনিয়ায় জীবনের পুকার। রবীন্দ্রনাথ যদি সাংস্কৃতিক অর্থে বিশ্বাস করতেন যে, শাহজাহাঁ তাজোত্তর মহাপুরুষ, তবে তিনি কবিতা লিখতেন না—‘চারিত্রপূজায়’ আর একটি প্রবন্ধ যোগ করতেন।

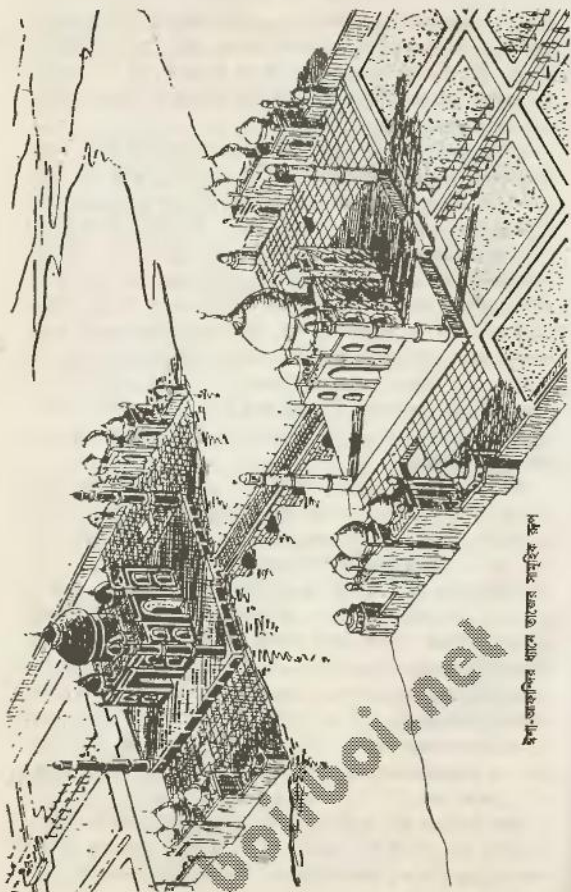
এ তিলোত্তমার প্রতিটি অঙ্গ নিখুঁত। তার ভূমি-নকশা, সমুদ্রদৃশ্য, মিনার, গম্বুজ-কুর্সি, গুলদস্তা খিলান, ক্যালিওগ্রাফীর নিখুঁত “frompelocil”, সন্দোখ ঘিরে ‘পীটা-ডুরার’ নকশা—সর্বত্র, সর্বত্র। সে-কথা বলতে আমি আসিনি, সে-কথা আপনাদের জন্য। আমি শুধু বলতে এসেছি—ঐ অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি নিদারুণ একটা প্রত্যাঘাত করেছিলেন এটা কি নজর করে দেখেছেন?

তিনি তাজমহল-স্থাপত্য থেকে শাহজাহাঁকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলেছেন। টোটাল অ্যানিহিলেশন। সম্রাট বুঝতেও পারেননি। নয়-বাঁকওয়ালা খিলান, একতলা মোকামের সমতল ছাদ, চারপ্রান্তে চার ছত্রী, জোড়া-জোড়া স্তম্ভের ছককাটা নকশা, হিন্দুশৈলী বর্জন ইত্যাদি যাবতীয় ‘শাহজাহানী ম্যানারিজম’—যা দেখে দেখে দর্শক ক্লান্ত বোধ করেন লাল-কিল্লায় অথবা আগ্রা-কিল্লায়—তার চিহ্নমাত্র নেই তাজমহলে। শাহজাহাঁ তো ছাড়, ফার্গুসনের মত পণ্ডিত পর্যন্ত বুঝতে পারেননি তথ্যটা। বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। এ তিলোত্তমার একটি মাত্র তিল নিয়ে আলোচনা করা যাক : তাজের গম্বুজ।

পণ্ডিত-প্রবর ফার্গুসন বললেন, তাজের গম্বুজ নিখুঁত ‘ম্যারাসেনিক’ (অর্থাৎ ইসলামী)। কারণ হিন্দুভারত পৈয়াজী-গম্বুজ বানাবার কায়দাটা চতুর্দশ শতাব্দীতে জানতো না। পৈয়াজী-গম্বুজ (bulbous dome) তাজের পূর্বে কোনো মুসলমানী স্থাপত্যে দেখা যায় না (লাহোরে আসফ আলির অখ্যাত মক্কারা ব্যতিরেকে)। হয়তো সেটিও একই ডিজাইনারের কীর্তি। সর্বত্রই গম্বুজের ব্যাস অধিষ্ঠান-পীঠেই বৃহত্তম—এমন সরু থেকে মোটা এবং মোটা থেকে সরু নয়। তাই ফার্গুসন বললেন, এটি ইসলামী-শৈলীর এক নয়া আবিষ্কার। পরবর্তী গবেষক হ্যাভেল বলছেন—“Fergusson made a great mistake in his statement that bulbous domes were not known in India in the 14th century.” তিনি ছবি ঐকে দেখিয়েছেন তাজের গম্বুজে পড়েছে তাজের গম্বুজের প্রভাব। শাহজাহানী-স্থাপত্যের হিন্দু শৈলী বর্জন নীতিকে অস্বীকার করে এখানে এসেছে তাজের মন্দিরের পত্রিকা, মহাপাণ্ড, কলস,—শুধু সর্বোচ্চস্থানে, শূলপাণির শূলের পরিবর্তে ঈদের চাঁদ। যেন অম্বরকুমারীর মেহদীরঞ্জিত হাতে আবার হস্ত মেললেন দীন-ইলাহীর প্রবর্তক। তাই হ্যাভেলের মতে—“The Taj belongs to India, not to Islam.”

তাজে একটি মাত্র ত্রুটি। সামূহিক প্রতিসাম্য-মূলক পরিকল্পনায় একটি মাত্র বিচ্যুতি।

হরগিজ্ আফসোস—কী বাৎসরিক ও সন্দোখ দুটি কেন্দ্রীয় অক্ষরেখার এক পাশে সরে গেছে। এ ত্রুটির জন্য অংশ্য সেই অজ্ঞাত পরিকল্পনাকার দায়ী নন আদৌ। দায়ী : স্বয়ং মহাকাল।



ইপা-আফগির ধ্বংসে তাজের সামুহিক রূপ

পরিকল্পনাকার বাবুরী-‘চাথরবাগের’ এক নব-রূপায়ণ করতে চেয়েছিলেন। যমুনা থাকবে কেন্দ্রস্থলে। দু-পাশে দুটি তাজ। শূভ্রতাজে মমতাজ, কৃষ্ণতাজে শাহজাহাঁ। মাঝখানে শাশ্বতকাল প্রবাহিত হবে বিরহের নীল যমুনা। তাই মমতাজকে শূইয়ে দিয়েছিলেন শূভ্রতাজের কেন্দ্রীয় অক্ষরেখায়। যমুনার পরপারে কৃষ্ণতাজের কাজ শুরুও হয়েছিল—আজও তার কুর্সি (প্লিথ) পর্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়।

ঔরঙ্গজীবের হাতে শাহজাহাঁ বন্দী হবার পর এল বাদশাহী হুকুমৎ—বন্ধ করে দাও কৃষ্ণতাজের কাজ। মর্মান্বিত হলেন অজ্ঞাত মহাশিল্পী।

শাহজাঁহার মৃত্যুর পরে ভারসাম্য রক্ষার খাতিরে মমতাজের কবর যে হাত দুই পূর্বদিকে সরিয়ে দেবেন তারও উপায় নেই—শাহী শরিয়তী তারিকে কবরে শায়িত মানুষকে সরানো-নড়ানো বারণ।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাজ পরিকল্পনাকারের নামের শেষ চিহ্নটুকু বে-হদিস মুছে ফেলে বাদশাহ্ বোধ করি নির্জন ঝোয়াবগ্নাহে অট্টহাসে ফেটে পড়েছিলেন—নেই, কোথাও নেই সেই বেতনভুক মানুষটার পরিচয়।

তামাম হিন্দুস্থানের মালিক শাহ্-এল-শাহের যেমন ছিল অপরিসীম ক্ষমতা, তাঁর মনসুর প্রতিদ্বন্দ্বীর ছিল তেমন সীমাহীন প্রতিভা। তাই কি তিনি প্রত্যাঘাত করেছিলেন একই ভঙ্গিতে? তাজমহল-স্থাপত্য থেকে শাহজাহাঁনী ম্যানারিজম নিঃশেষে মুছে ফেলে ‘অন্তরে যার মমতাজ নারী’ তার বাহিরে শাহজাহাঁকে তিলমাত্র ঠাই না দিয়ে?

দৈরখ-সমরে বিজয়ী হয়েও এ ক্ষেত্রে উস্তাদোঁ-কি-উস্তাদ মীর মহম্মদ গাজী মিঞা বিস্মৃত-বিস্মৃতকীর্তি ‘অ্যানন্’ সেই আখরি-হাস হাসতে পারেননি। অসমাপ্ত কৃষ্ণতাজের পরিত্যক্ত কুর্সিটার দিকে তাকিয়ে ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলেছিলেন।

শাহজাহাঁর মৃত্যুতে নয়, ভারসাম্যহীন তাজের মৃত্যুতে।



কলকাতার স্থাপত্য কেমন ভাবে এল

প্রত্যেকটি নগরেরই একটি চরিত্র বৈশিষ্ট্য থাকে। পশ্চিমের মত এদেশেও তা আছে : কাশী, হরিদ্বার, দিল্লী বা দার্জিলিং নিজ নিজ স্থাপত্য-বৈশিষ্ট্যের বড়াই করতে পারে। তা পারে কলকাতাও।

সেদিক থেকে কলকাতা যেন গোটা ভারতবর্ষের চুশক। দীর্ঘ তিনশ বছর ধরে কলকাতা-স্থাপত্য রূপায়িত হয়েছে, আজও হচ্ছে।

ইতিহাস বলে, বিজয়ী জাতি বিজিত রাজ্যে স্থাপত্যে প্রভাব বিস্তার করে। ইসলাম করেছিল স্পেন থেকে ভারতে। ইংরেজ এ-ক্ষেত্রে কোন ব্যতিক্রম নয়। ডিহি গোবিন্দপুর সূতানুটিতে তাই প্রথম যুগের ইমারতে গ্রাক-ভিক্টোরিয় ইংরাজ-স্থাপত্যের স্বাক্ষর। তবু স্থপতিকে মানিয়ে নিতে হল স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে। তাই কোম্পানির আমলে রূপায়িত হতে দেখি এক বিচিত্র শৈলী। একক-সৌধ, তাতে সুউচ্চ গ্লিঙ্ক (এমন বর্ষা ওরা দেখেনি), মোটা দেওয়াল, চওড়া বারান্দা ও সুউচ্চ ছাদ (এমন গ্রীসেও নয়), ফাসাদে দৃঢ়মূল স্তম্ভের সারি ও প্রশস্ত এন্টাব্রচার (ক্ষমতা ও দার্ঢ্যের প্রকাশ)। স্তম্ভগুলি স্বাভাবিকভাবেই গ্রীক ও রোমান শৈলীর।

কয়েক দশকের ভিতরেই স্থানীয় জমিদারেরা আমদানি করলেন স্থাপত্যে কিছু রকমফের। নির্মিত হল বাঙালী ঘরানার কিছু গোষ্ঠীগৃহ—বাইরের দিকে বিল্যাতী অনুকরণে সদর-মহল, ভিতরে ঐতিহ্য অনুপ্রাণিত অন্দর মহল। দু-পাশে সার্ভিস-কোয়ার্টার্স। সদর-‘ফাসাদ’-এ থেকো-রোমান ন্যূনের সঙ্গে মিলিত হল ভারতীয় অলঙ্করণের অনুভাবনা—জন্ম নিল একটি হাইব্রিড : পরী। ভিতর মহলে যুক্ত হল প্রকাণ্ড সব ভৌমিশীয়া ঝড়ঝড়ি-পাল্লা, পর্দাপ্রথার প্রয়োজনে। যার অনবদ্য প্রতিচ্ছবি পেয়েছি সত্যজিৎর ‘চারুলতা’য়। উত্তরের পাইকপাড়া; পাথুরিয়াঘাটা, বাগবাজার থেকে মধ্যাঞ্চলের জোড়াসাঁকো পার হয়ে দক্ষিণের সাবর্ণ-চৌধুরী-তক্ একই ছক।

ওদিকে ভালহোসি অঞ্চলে গড়ে উঠতে থাকে ব্যাণিজ্যিক প্রয়োজনে নানান প্রাসাদ—সচরাচর ইংলিশ ম্যানর-হাউসের সঙ্গে ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের সংমিশ্রণে। তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল : আর্কেড।

ফুটপাথের উপর সারি সারি থাম-পেট্ট, একতলা ছাদ। মূল সৌধ তার পিছনে, প্রপার্টি-লাইন থেকে। তাতে এই বৌদ্ধ-বৃষ্টি বিভূষিত শহরে পথচারীরা পেত সাময়িক আশ্রয় ; অপরদিকে শোভাযাত্রার সময় ঐ বারান্দায় হতো বিচিত্রবর্ণের জন-সমাবেশ।

শহর-কলকাতার সে কী বিচিত্র বাহার। গ্র্যান্ড, বা গ্রেট-ইস্টার্নের সামনে আজও রয়ে গেছে, তার ছিটেফোঁটা। বর্তমানে কর্পোরেশন-আইনে এই 'আর্কেড' না-মঞ্জুর।

ইংরেজ-স্থপতিদের ধন্যবাদ, তাঁরা শহরটাকে প্যাকিং বাস্ক বানাননি। হেদো, গোলদিঘি, মনোহর দাস তড়াগের মত জলাশয়, দেশবন্ধু-দেশপ্রিয়-ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মতো সবুজের আমেজ তাঁরা উপহার দিয়েছিলেন কলকাতাকে। সবচেয়ে দামী উপহার : গড়ের মাঠ।

সে আমলের তৈরি রাইটার্স বিল্ডিংস, গভর্নর হাউস, বেনভেডিয়ার, যাদুঘর বা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল স্থাপত্য-বিচারে প্রশংসনীয়। তাতে সর্বাঙ্গসুন্দর সামঞ্জস্য আছে। যাকে বলে 'আর্কিটেকটনিকাল' মহিমা। যে প্রসঙ্গে মুক্তবা আলি-সাহেব বলেছিলেন, "স্থাপত্যের এই অনিন্দ্য সামঞ্জস্য যদি কাব্যে কিংবা উপন্যাসে পাওয়া যায়, তবে বলা হয় কাব্যখানিতে 'আর্কিটেকটনিকাল' মহিমা আছে—মহাভারতে আছে, ফাউস্টে আছে, এবং 'ওয়ার অ্যান্ড পীসে' আছে ; 'জ্যা ক্রিস্তফ' উত্তম উপন্যাস, কিন্তু এ গুণটি সেখানে অনুপস্থিত।"

ঠিক যেমন তাজের ছায়া দিয়ে গড়া ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে তা আছে ; অথচ কুৎস-এর ছায়া দিয়ে গড়া অষ্টারল্যানি মনুমেন্টে তা নেই।

প্রাক-স্বাধীনতা যুগে ইংরেজের সাহায্য ছাড়াই কলকাতাবাসীর স্বনির্মিত দুটি স্থাপত্যের কথা মনে পড়ছে ; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাজাতি সদন। আমার সাব্জেকটিভ মূল্যায়নে তার কোনটিই স্থাপত্য হিসাবে উৎরায়নি। সেনেট হল, বিশ্বভারতী অথবা মালব্যজীর কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থাপত্যের স্বকীয়তা আছে, যার সম্মান পাইনি যাদবপুরে। মহাজাতি সদনের ফাসাদে প্রতিফলিত হয়নি তদানীন্তন সংখ্যাগরিষ্ঠ বঙ্গবাসীর স্বীকৃতি। সেটাইন্দো-ইসলামী স্থাপত্যের নয়। তাছাড়া যে উদ্দেশ্যে ঐ প্রেক্ষাগৃহ নির্মিত, স্থপতি সেই উদ্দেশ্যটাও সফল করতে পারেননি—শব্দবিজ্ঞান বা 'অ্যাকসটিক্স'—এ এই স্থাপত্য ব্যর্থ।

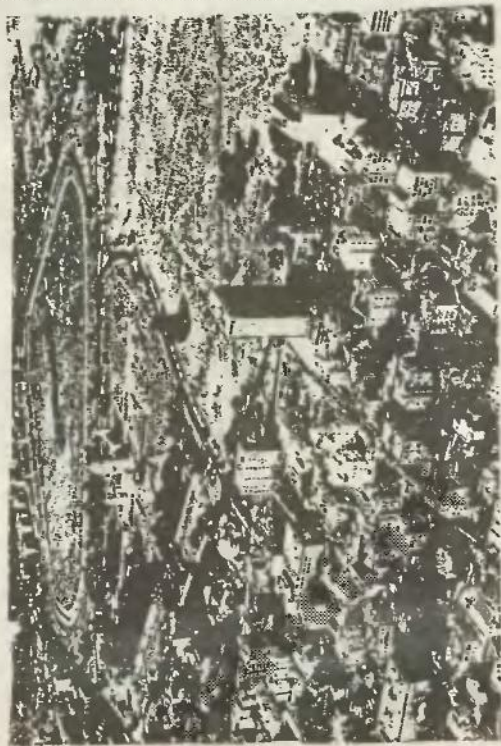
তারপর ভারত স্বাধীন হল। এল উদ্বাস্তুর বন্যা। যে-যেখানে পারলেন বাড়ি বানালেন। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সৌন্দর্যবোধকে শিকেয় তুলতে হল। জীবনমৃত্যুর সংগ্রামকে কেউ অস্বীকার করবে না ; কিন্তু ঐ প্রসঙ্গেই এল, উটের শিঠি শেষ তৃণ—আইনসঙ্গত সেই শকাটি : জ্বর-দহল। তখনই হয়ে গেল সব। স্বতন্ত্র বাড়িবার উপায় নেই, শহর উত্তর-দক্ষিণে বৃদ্ধি পেল অস্বাভাবিকভাৱে।

শহরের নাতিশ্রাস উঠছে দেখে পশ্চিমবঙ্গ ডাক্তার ডাক্তার ডাক্তারবাবু বিধান দিলেন : উদ্ধার কর শহরের উত্তরপূর্ব প্রান্তের লবণ হ্রদ।

ওষুধটা ঠিকই, কিন্তু তা প্রয়োগ করতে আমাদের সময় লাগল তিন দশক। তার চেয়েও বড় দুর্ভাগ্য : প্রগ্নসিসের মূল উদ্দেশ্যটাই গেল হারিয়ে। শতাব্দির দশকের শেষাংশে থকে লবণ হ্রদ জাঁকিয়ে উঠছে ; কিন্তু কলকাতার অস্বাভাবিক ঘনবসতির চাপ তাতে কমল না। নিম্ন ও মধ্যবিত্তের ঠাই হল না সেখানে। তাই একদিকে যেমন গড়ে উঠছে লবণ হ্রদ, অপর দিকে তেমন ভরে উঠছে ওয়েলিংটন স্কোয়ার, গড়ের

মাঠ। লবণ হ্রদে বস্তু নেই—ভাল কথা। কিন্তু যতই খিলি হ'ক, বস্তিরও তো একটা অনিবার্য ভূমিকা আছে কলকাতার নাগরিক জীবনে? সল্ট-লেকের সাহেব-মেমেরা ফুটকা খাবেন না, রিকশায় বেড়াবেন না, পুরানো কাগজ বেচবেন না মানলাম; কিন্তু ঠিক্-খি, ফেরিওয়ালা, প্লাসার, ছুতোরও কি প্রয়োজন হবে না ওঁদের?

ঘাট ও সমুদ্র দশকে শহরে নির্মিত হল একাধিক বহুতল বিশিষ্ট স্বাইক্রেপার। সরকারি ও বেসরকারি। নিউ সেক্রেটারিয়েট, জীবনদীপ, টাটা সেন্টার, ইন্ডাস্ট্রি হাউস, চ্যাটার্জি



চট্টোপাধ্যায়ের ওপর থেকে কলকাতার স্থাপত্যের যে চিত্রের দ্বারা গড়ে

ইন্টারন্যাশনাল এবং অগুনতি কোঅপারেটিভ হাউসিং। এদের স্থাপত্যে 'কলকাতা', কোথাও নেই। অথবা আছে, 'নব্য-কলকাতা'। চ্যাটার্জি ইন্টারন্যাশনালের মোড়েইক-গবেশ বা রাশিচক্র অলঙ্করণ সত্ত্বেও বলা যায়, এগুলি অনায়াসে দিল্লি এবং বোম্বাইয়ে পায়দা হতে পারত। রবীন্দ্র সদনের ব্যবহারিক উপযোগিতা অনবদ্য, কিন্তু তার 'ফ্যাসাদ'-এ নেই বিশ্বভারতী বা ভারতীয় স্থাপত্যের স্পর্শ। 'ফ্যারে' যদি কাচের উপর আধুনিক প্রয়োগ কৌশলের বদলে থাকত কোন মুরাল, যেমন আছে শিপিং কর্পোরেশনের একতলায়, তাহলেও অন্তত মনটা ভরতো।

এই যুগেই এল সেম-পেন্টিং, স্লো-সেম, সী-সেম ইত্যাদি। শহর কলকাতার নতুন খোলতাই হল। সৌধ আর সৌধ রইল না; কারণ 'চলন্তিকা' বলছেন, 'সৌধ' শব্দের মূল অর্থ সুখা ধবলিত চুনকাম-করা প্রাসাদ; বর্ণ-বৈচিত্র্যের সে কি সমারোহ! কোথাও তা সিন্ধু, নয়নাভিরাম, মন-মাতানো; কোথাও বা কলেজের পাশ করা স্থপতির কিংবা আপন গৃহের নির্মাতা গৃহস্থামীর দগ্ধদগে স্বেচ্ছাচারের উৎপীড়ন। তা হোক, রঙের চেকনাই সাদা ও এলা-রঙের একঘেয়েমিতে আনল বৈচিত্র্য।

আবার কেউ কেউ পয়েন্টিং-করা ইটের দেওয়ালে আনতে চাইলেন রকমফের। যেমন মৌলানার মোড়ে ইয়ুথ সেন্টার, লেক-গার্ডেন মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে শ্রীপ্রবীর মিত্র পরিকল্পিত-একটি অনবদ্য সৌধ, অথবা এলগিন-শরৎ বসু মোড়ে সম্প্রতি সমাপ্ত একটি ইমারত।



নাইখাদামস্জিদ

গত দশকে পূর্ত-বিভাগ যে-কটি কাজ করেছেন তার ভিতর সবচেয়ে সুখ্যাতি হয়েছে নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামের ; কিন্তু সে ক্ষেত্রে কৃতিত্বের সিংহভাগ দাবি করতে পারেন বাস্তুকারের দল। স্থপতি বিভাগের সবচেয়ে বড় কীর্তি—কলকাতা শহরে হাইকোর্ট সম্প্রসারণ। এখানে একটু ইতিহাস ঘাঁটতে হবে। গথিক-স্টাইলে নির্মিত (1872) হাইকোর্টের স্থপতি : ওয়াল্টার গ্র্যানভিল। এটি কিন্তু মৌলিক ডিজাইন নয় ; বেলজিয়ামের Ypres শহরের টাউন হলের হুবহু অনুরণ। বিচিত্র ব্যাপার হল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বেলজিয়ামের ঐ নগর সৌধটিই শুধু নয়, তার প্ল্যানটিও খোয়া যায়। যুদ্ধান্তে ঐ শহরের মেয়র একজন স্থপতিকে পাঠিয়ে দেন কলকাতায়, আমাদের হাইকোর্টটা মেপে নতুন প্ল্যান ছকতে। অর্থাৎ পুরের অনুরণে মৃত পিতার রেজারেকশন হল বেলজিয়ামে।

সেই ঐতিহ্যময় হাইকোর্ট-বিল্ডিংস্-এর গথিক, শৈলীকে মেনে নিয়ে পূর্তবিভাগ তার সম্প্রসারণ করেছেন। শুধু তাই নয়, বিলানগুলি যে ভারবাহী নয়, গথিক শৈলীর অনুরণে অলঙ্করণমাত্র, এই ভব্বের তির্যক ইন্দি-দিতে বিলানগুলি একটু বাইরে ঝুকিয়ে বসিয়েছেন।

পূর্ত-স্থপতিবিভাগকে লাখ-লাখ সুক্রিয়া !

এই সঙ্গে মনে প্রশ্ন জাগে : এই শ্রদ্ধানুশ্রব মনোভাবটি তাঁদের কোথায় ছিল, যখন সেমেন্ট হলের ফাসাদটা ভেঙে ফেললেন ? সেই অনবদ্য ডোরিক-কলামগুলিকে বাঁচিয়ে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণ করা যেত না ?

যোধপুর পার্ক, নিউ-আলিপুর, এবং শহরের এখানে-ওখানে অনেক বাড়ি নজরে পড়ছে, যার স্থপতির সার্থক। সুন্দর, ছিমছাম, নয়নাভিরাম। তা নিশ্চয় আপনারাও দেখেছেন। অনেক ক্ষেত্রে স্থাপত্য-চাতুর্য বাইরে থেকে বোঝা যায় না—তার সাফল্য ‘প্ল্যানিং’-এ বিন্যাসছন্দে। যেমন, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণীতে শ্রীসঙ্কর সেনের ‘সর্বভোক্তা’ ; অথবা গোলপার্কের কাছাকাছি শ্রীদুর্গা বসু পরিকল্পিত মুন্সী-প্রাসাদের ব্যাবিলোনীয় হ্যাণ্ডিং গার্ডেন্স। সন্ট লেকের ‘অনন্যা’ সার্থকনামা ; ‘সোনার তরী’ গৃহ-মালিককে ‘ঠাই নাই’ বলেনি ; ‘স্বপ্নাতীত’ অবিশ্বাস্য ! শেষোক্ত গৃহের স্থপতি শ্রীপাল এক অদ্ভুত কেরামতি দেখিয়েছেন। বিশ্বাস করা কঠিন, লবণহ্রদের ‘একুশে আইনে’ বাড়ির ঝুঁমুনে বগান করা মানা ! বাড়ির একটি অচ্ছেদ্য-অঙ্গ আবশ্যিকভাবে বানাতে হবে রাস্তা থেকে এক মিটারের মধ্যে ! ‘স্বপ্নাতীত’ একস্তম্ভের ঐ পোর্টিকোটো বানিয়ে সেই আইনকে ছুঁয়ে বাড়ির সামনে বগান বানানো হয়েছে।

কেউ কেউ জাহাজ-বাড়ি, এয়ারোপ্লেন বাড়ি বানিয়ে দেখাতে চেয়েছেন। সন্ট লেকে শ্রীপালের বসত বাড়িটির ফাসাদও তেমনি বিচিত্র, ‘অনন্যা’র মতো “স্নিগ্ধতা” তাতে নেই।

আগেই বলেছি, ব্যাসস্কোচের সার্থকতা স্থাপত্যের একটি প্রধান গুণ। এদিক থেকে ডঃ কল্যাণ ব্যানার্জি এবং শ্রীগোপাল মিত্র ইতিহাস রচনা করেছেন। কো-অপারেটিভ হাউসিং-এ কলকাতায় বেশ কয়েকটি দশ-পনের তলা বাড়িতে তাঁরা নানান কৌশলে ব্যাস স্কোচনের অসামান্য সফলতা দেখিয়েছেন। এই ব্যাস স্কোচনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সন্ট

লেকে ড: ব্যানার্জির নিজের বাড়িটি একটি অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ঐ লবণ হ্রদের তিন নম্বর সেক্টরে প্রায় হাজার দুই চার তলা ভগ্নাট নির্মাণ করছেন হাউসিং বোর্ড, প্রতিযোগিতামূলক ডিজাইন-টেন্ডার আহ্বান করে। সাতটি স্থাপত্য-প্রতিষ্ঠানের ভিতর গতানুগতিকতা এড়িয়ে নতুন ডিজাইন দিয়েছেন দিল্লি-গ্রুপ অব আর্কিটেকটস্।

লবণ হ্রদ ডাক ও তার বিভাগের চারতলা বাড়িগুলিও সুন্দর। সম্প্রতি নির্মিত হয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং সেন্টার। বিশ্ব-নিদুকেও স্বীকার করতে বাধ্য হবে তার সৌন্দর্যের। কিন্তু সৌখের চরিত্রটি এখানে প্রতিফলিত হয়নি। হাজার হ'ক এটি একটি ট্রেনিং সেন্টার, শিক্ষায়তন। প্লেট-গ্লাসে আপাদমস্তক মোড়া বাড়িটিকে দেখলে মনে হয়, লস্-অ্যাঞ্জেলেসে অথবা লাস্ ভেগাসের একটি বিলাসবহুল মোটেল অনেকটা পথ ড্রাইভ করে এসে সন্টলেকে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। স্থপতি অট্টালিকার চরিত্রটি প্রতিফলিত করবেন, এটাই আমাদের আশা—যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ফাসাদ নিরাপত্তার প্রতীতি নিয়ে দণ্ডায়মান, তার প্রকাণ্ড প্রবেশদ্বারের পাশে দুটি উইং-ওয়াল যেন দুই হাত বাড়িয়ে নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়!



বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা : বাস্তবে

ওদেশের শার্লক হোমস্, মিসিয়ে ম্যারকুল প্যারো, প্যেরী ম্যাসন, মিস মারপল্ এবং এদেশের ব্যোমকেশ বসু, পরাশর শর্মা, কিরীটি রায়, আর ই্যা, সাম্প্রতিক পি. কে. বাসু—এঁদের মধ্যে কে বড় গোয়েন্দা তা নিয়ে আপনারা চায়ের কাপে তৃফান তুলতে পারেন, আমি সে আলোচনায় নেই। আমি বরং হিসেব কষে ব্যার করতে বসেছি—বাস্তব দুনিয়ায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হিসাবে কাকে শিরোপা দেব? এই শ্রেষ্ঠতা মাপবার কোন উপযুক্ত মাপকাঠি নেই, সে-কথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তবু সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, মনস্তত্ত্ববিদ, জীববিজ্ঞানী বা ক্রিকেট অলরাউন্ডার কে—এ প্রশ্ন একশ জন লোককে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারেন। মাপকাঠি থাক বা না থাক। হিসাব কষে দেখবেন চারটি ভালিকায় সবচেয়ে বেশিবার নাম উঠছে যথাক্রমে : আইনস্টাইন, ম্যেড, ডারউইন এবং গারফিল্ড সোবার্স। ঠিক তেমনি যারা অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা করেছেন তাঁদের যদি প্রশ্ন করা যায়—সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দাটি কে?—তাহলে যার নামটা ভালিকায় সবচেয়ে বেশিবার থাকবে বলে আশা রাখি তাঁর কথাই বলতে বসেছি।

ভদ্রলোকের জন্ম ১৮৫৩ সালে। পারীতে। মৃত্যু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাকালে, ১৯১৪-এ। একষট্টি বছর বয়সে।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে জন্মমুহূর্তে—যে সময় স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো বক্তৃতা অস্তে ভারতে ফিরছেন, প্রায় সেই সময়েই নিউইয়র্কের একজন বিখ্যাত পাবলিশারকে দেখা গেল পারীতে উপনীত হতে। ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হলেন প্যারীর পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে—‘ডিপার্টমেন্ট অব দ্য ফ্রেন্ড প্রিফেকচার অব পুলিশ’—এক জেনারেল, তিনি বড়কর্তার সাক্ষাৎপ্রার্থী। অনতিবিলম্বেই ডাক পড়ল বড়সাহেবের ঘরে।

প্রকাণ্ড টেবিলের অপরাধান্তে কর্মব্যস্ত মানুষটি অর্ন্তমী বসি নিয়ে কী একটা কাগজ পরীক্ষা করছিলেন। মুখ না তুলেই বলেন, অনুগ্রহ করে আসন গ্রহণ করুন।

প্রকাশক ভদ্রলোক গদি-মোড়া চেয়ারে বসে পড়েন। ঝুটিয়ে দেখতে থাকেন ঘরটাকে এবং গৃহস্থমীকে। বছর সাতচল্লিশ বয়সে, বুদ্ধিদীপ্ত নিশ্চয়ই—কিন্তু কে বলবে উনি বিশ্বের সবচেয়ে বড় গোয়েন্দা। মিনিট-পাঁচেক কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর ওঁর তন্ময়তা ভাঙলো। মুখ তুলে অতিথিকে দেখে বলেন, পারদ! আপনার কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। ই্যা, বলুন, কীভাবে আপনার সেবা করতে পারি? কোন বিপদে পড়ে এসেছেন নিশ্চয়।

মার্কিন ধনকুবের বললেন, আজ্ঞে না। বিপদ নয়, আমি একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। যদি অনুগ্রহ করে রাজী হন।

: কী প্রস্তাব ?

: আমি আপনার "আত্মজীবনী" ছাপতে চাই... না, না, আমাকে বাধা দেবেন না; আমি জানি, আপনি ব্যস্ত, অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। তাই আপনাকে লন্ডন-হ্যাংগে কিছু লিখতে বলব না। আমার প্রতিদিন প্রতিদিন আপনার কাছে আধঘণ্টা করে বসবে, আপনি শুধু মুখে মুখে আপনার জীবনের অভিজ্ঞতা বলে যাবেন।

সাতচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়টি হাসলেন। বললেন, মিসিয়ে, আপনি ঠিকই বলেছেন, আমি খুব ব্যস্ত, অত্যন্ত ব্যস্ত—কিন্তু সময়ের যে কী প্রচণ্ড অভাব তা আপনি আদাজই করতে পারছেন না। এত কাজ করার আছে—অথচ আপনি কি জানেন, দৈনিক কিছুটা না ঘুমালে শরীর-ধর্ম রাখা যায় না? সুতরাং আমাকে মাপ করতে হরে। প্রতিদিন নষ্ট করবার মত আধঘণ্টা সময় আমার হাতে নেই।

প্রকাশক বললেন, স্যার! আমার প্রস্তাবটা পুরোপুরি পেশ করতে দিন। মানে, আমি যে সম্মানমূল্য দিতে প্রস্তুত। আপনার উচ্চারিত প্রতিটি শব্দের জন্য আমি এক ডলার করে দেব। এবার কী বলবেন?

হাসলেন এতক্ষণে। বললেন, হিসাবটা শক্ত। অবসর নিতে আমার যে ক'বছর বাকি আছে তাতে যত হুঁ আমি রোজগার করব, আপনি বোধহয় তার কাছাকাছিই দিতে চাইছেন, নয়?

: কাছাকাছি নয়, বেশিও হতে পারে,—যদি আপনি বিস্তারিতভাবে আপনার স্মৃতিচারণ কয়েক মাস ধরে চালিয়ে যেতে পারেন।

ধন্যবাদ। আমি রাজী নই। সত্যি আমার অনেক কাজ।

মিসিয়ে আলফোর্সে বার্তিলৌ এরপর আরও চৌদ্দ বছর বেঁচেছিলেন। আত্মজীবনী লিখবার বা মুখে মুখে বলবার সময় পাননি। তার বদলে ঐ চৌদ্দ বছরে তিনি যা করে যান তার উপরেই গড়ে উঠেছে তাৎ দুনিয়ায় অপরাধ-বিজ্ঞান। 'অপরাধী বিষয়ক সংগ্রহালয়' তিনিই প্রথম স্থাপন করেন, এবং আঙুলের ছাপ থেকে কোন বস্তু ছাতের অপরাধীকে তিনিই প্রথম খুঁজে বার করেন।

বাবা ছিলেন-পারীর একজন ডাক্তার। মিসিয়ে আলফোর্সে পিতার দ্বিতীয় পুত্র। ছাত্র জীবনে মোটেই ভাল রেজাল্ট করতে পারেননি। নিতান্ত মার্মারি ছাত্র। ছাত্রজীবন শেষ করে প্রথম যৌবনেও কোন সম্ভাবনার ছাপ রাখতে পারেননি। সুতরাং চাকরি ধরেছেন এবং ছেড়েছেন।

তারপর এল হঠাৎ সুযোগ। সেনাবাহিনীতে তাঁকে আবশ্যিকভাবে যোগ দিতে হল। দিনের বেলা মিলিটারী ট্রেনিং নিতে হত, সন্ধ্যায় মিলিটারী হাসপাতালে যেতে হত। ঐ মেডিকেল স্কুলেই তাঁর বৌক পড়ল 'স্করকন্সাল' বস্তুটাকে খুঁটিয়ে যাচাই করার। খেয়ালী মানুষ—ওঁর মনে প্রশ্ন জাগে, প্রতিটি মানুষের সব কয়টি অঙ্গই কি দেহ-জৈবের অনুপাতে একরকম? একের পর এক মাপ নিয়ে দেখলেন : তা নয়। মানব

দেহের প্রায় সওয়া দুশ অস্থির মাপ তার দেহ-দৈর্ঘ্যের অনুপাতে গঠিত নয়। কিন্তু তার একটা আলাদা ছন্দ আছে।

ঐ সময়েই তাঁর মিলিটারি সার্ভিস শেষ হল। ওঁকে বদলি করা হল পারীর পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে—নিমন্তরের কেরানী হিসাবে। থানার বড়বাবু বললেন, শোন হে ছোকরা, তোমার কাজ হচ্ছে, দৈনিক যে সব অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে আনা হবে তাদের নাম, ধাম এবং দৈহিক বর্ণনা এই রেজিস্টারে টুকে রাখা। বুঝলে?

আলফোঁসে মাথা নেড়ে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

কহু বুঝেছ। বল দেখি, দৈহিক বর্ণনা খাতায় কেন লিখে রাখা হয়?

: যাতে ভবিষ্যতে ওরা দ্বিতীয়বার ধরা পড়লে, এবং নাম ভাঁড়াতে চাইলেও বুঝতে পারা যায়, এরা চেনা পাখি।

বড়বাবু খুশি হলেন। বললেন, নাঃ। তোমাকে যতটা গবেষ্ট ভেবেছিলাম, তুমি ততটা নও।

আলফোঁসে মনের মতো কাজ পেয়েছে; কিন্তু বারবার ওর মনে হয়—যেভাবে দৈহিক বর্ণনা ইতিপূর্বে রেজিস্টারে লেখা হয়েছে তা তো নিরর্থক। চশমা-দাড়ি-গোঁফ আছে কি নেই সেটা তো অবাস্তব। দৈর্ঘ্য, ওজন, এমনকি চেষ্টা করলে মথার চুলের রঙও তো বদলে ফেলা যায়। এমন কী উপায় আছে যাতে লোকটাকে সন্দেহাতীতভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব?

আলফোঁসে খুলে বসে তার সেই মেডিকেল কলেজে বানানো তালিকা। ইতিমধ্যে সে হিসাব কষে দেখেছে বিশ থেকে ষাট বছর বয়সের মধ্যে মানুষের দেহে কতকগুলি অস্থির মাপ অদল-বদল হয় না। সুতরাং ঐ যে লোকটা—পাঁচ বছর আগে জেল থেকে ছাড়া-পাওয়া বিশ বছরের টম, আর আজকের ধরা-পড়া পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ডিক এরা অভিন্ন ব্যক্তি কিনা বুঝে নিতে ঐ হিসাবটা তো কার্যকরী হতে পারে। ওদের ওজন এক নয়, চুলের রঙ অন্যরকম, ডিক-এর মুখে প্রকৃষ্ট একটা ক্ষতচিহ্ন যা টমের ছিল না—কিন্তু ওদের দুজনেরই বাঁ-দিকের ফিমার বোন-এর মাপ 351 মিলিমিটার।

নতুন চাকরিতে যোগ দেবার আট মাসের মধ্যে আলফোঁসে হিসাব কষে দেখল—প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দেহে অন্তত এগারোটি প্রত্যঙ্গ আছে যার মাপে অদল-বদল হতে পারে না। ও ঐ বিজ্ঞানটার নাম দিল : অ্যানথ্রোপোমেট্রিক্স।

বারে বারে পরীক্ষা করে, সন্দেহাতীত প্রমাণ যোগাড় করে ছাব্বিশ বছরের তরুণ করণিকটি তার 'থিসিস' নিয়ে একদিন হাজির হল খোদা-বড়কর্তার কাছে—পুলিস প্রিফেক্ট স্বয়ং আঁদ্রে-সাহেবের চেম্বারে।

আঁদ্রে ওর গোটা থিসিসটা উন্টেপাল্টে দেখলেন। রাগে তাঁর মুখ থমথম করছে। শেষ পাতাটা উন্টে তিনি কাগজের বাঙিলটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। গর্জে উঠলেন, কী-চাও হে তুমি ছোকরা? ঐই চেম্বারে বসতে? আর আমি তোমার ডেসকে গিয়ে রেজিস্টার কপি করব?

আলফোঁসে তার কাগজের বাঙিলটা তুলে নিয়ে ফিরে এল। বসল গিয়ে তার

ডেসকে। আরও তিন বছর তাকে অপেক্ষা করতে হল। তা হোক, এ তিন বছরে সে আরও অনেক অনেক তথ্য সমৃদ্ধ করে ফেলল তার 'থিসিস'।

বোধকরি কথাটা ঠিক—সাধনায় যে একনিষ্ঠ, একদিন-না-একদিন ভাগ্যদেবী তার মাথায় পরিয়ে দেন জয়ের মুকুট। হোক না কখনো বা কাঁটার। তাই ওরও ভাগ্য প্রসন্ন হল। আঁদের বদলে নতুন একজন বড়কর্তা বদলি হয়ে এলেন। আলফোঁসে বার্তিলৌ রবার্ট ব্রুসের ভূমিকায় আবার গিয়ে দেখা করল বড়কর্তার সঙ্গে। বোঝাতে চেষ্টা করল তার সিস্টেম।

নতুন বড়সাহেব অতটা কাঠ-গোঁয়ার ছিলেন না। তিনি ওর বক্তব্যে ফটটা অভিভূত হলেন তার চেয়েও বেশি হলেন ওর আন্তরিকতায়। হয়তো পাগলামি, কিন্তু কী নিষ্ঠার সঙ্গে আজ চার-পাঁচ বছর ধরে সে একের পর একটি স্ট্যাটিসটিক্স সাজিয়ে গেছে। এমন মানুষের উৎসাহে ঠাণ্ডা জল ঢেলে দিতে তাঁর বাধল। বললেন, মিসিয়ে বার্তিলৌ, আপনাকে আমি মাত্র তিন মাসের জন্য সুযোগ দিতে পারি। আপনি যে কাজ করছেন সেটা কাল থেকে অন্য লোকে করবে। তিন মাসের জন্য আপনি আপনার পদ্ধতিতে পরীক্ষা চালাতে পারেন। এই তিন মাসের মধ্যে যদি একটিমাত্র অপরাধীকে আপনার পদ্ধতিতে চিহ্নিত করতে পারেন, তাহলে আপনার সিস্টেম আমরা গ্রহণ করব। যদি তিন মাসের মধ্যে একটিও অপরাধীকে এভাবে ধরা না যায়, তাহলে কথা দিন-আর কোন দিন আমাদের বিরক্ত করবেন না, আর নিজের সময়ও এভাবে নষ্ট করবেন না। কেমন রাজি?

মাত্র তিন মাস! বার্তিলৌ দ্বিধায় পড়ল। তা হোক, সে বুঝে নিয়েছে, এ ছাড়া দ্বিতীয় পছন্দ নেই। সুপ্রতিভভাবে বললে, ঠিক আছে, স্যার। আমি তাতেই রাজি। আপনি যে মহানুভবতা দেখালেন সেজন্য প্রসংখ্য ধন্যবাদ।

পরদিন থেকেই বার্তিলৌ কাজে লেগে গেল। দিনে যোলাে ঘন্টা খাটিছে সে। প্রত্যেকটি অভিযুক্তকে সে চেয়ারে বসিয়ে নানান ফটোগ্রাফ নেয়। 'প্রোফাইল' ছবি নেয়, যাতে কপাল, নাক, চিবুকের গঠনটা ঠিকমত ধরা পড়ে। নাক ও চিবুকের ক্রোজ-আপও নেয়। পর পর স্বাতায় সাঁটে।

এছাড়া নেয় বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নিখুঁত মাপ। বিশেষ করে মাথা, ভরদিকের কান, বাঁ-হাতের মাঝের আঙুল, বাঁ-হাতের কনুই থেকে কব্জি, বাঁ-পায়ের বিভিন্ন-হাড়ের মাপ। দেহের কোথাও কোন তিল বা জড়ুল আছে কি না লিখে নেয়। সব ছবি একটি তালিকায় লিখে ফাইল করে—অপরাধীর নাম বা উপাধির আদ্য-অক্ষর অনুসারে নয়, কারণ বার্তিলৌ জানে, লোকটা সবার আগেই বদলাবে তার নাম। সে তালিকা তৈরী করে দেহ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে বয়সের এক জটিল হিসাবের পদ্ধতিতে।

প্রসঙ্গত বলি, নব্বই বছর পূর্বে সঙ্কলিত সেই প্রাথমিক তালিকাটি আজও ফরাসী জাতীয় সরকারের অপরাধ-বিজ্ঞান সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত। এই প্রসঙ্গে আরও বলি, ঐ সংগ্রহশালায় বর্তমানে প্রায় সত্তর লক্ষ তালিকা সংগৃহীত—বিশ্বের যাবতীয় ক্রিমিনালদের খতিয়ান।

দু-মাস শেষ হল। বার্তিলৌর পন্থায় একটিমাত্র অপরাধীকেও এ পর্যন্ত সনাক্ত করা যায়নি। তারপর আবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল ওর।

সেদিন ফরাসী পুলিশ ধরে এনেছে একজনকে। সিঁদেল চুরির অভিযোগে। হাতে-নাতে ধরা কেস। অপরাধ প্রমাণ হওয়া মোটেই শক্ত নয়। তবে কথা হচ্ছে—এই লোকটা যদি প্রমাণ করতে পারে যে, এই তার প্রথম অপরাধ, তবে প্রচলিত আইনে তার সামান্যই সাজা হবে। আর পুলিশ যদি প্রমাণ করতে পারে এর আগেও ও একই অপরাধে শাস্তি পেয়েছে তাহলে ওকে দীর্ঘমেয়াদী সাজা দেওয়া যাবে। বলা বাহুল্য, লোকটা বলছে এমন কাজ আমি জীবনে কখনও করিনি হুজুর, মা মেরীর দিবি।

লোকটার নাম দুর্প। ফরাসী দেশে অত্যন্ত প্রচলিত নাম—যেন, নেতাই বা কেটা! থানার বড়বাবু পুরানো রেজিস্টার খেঁটে বিশ-ত্রিশটা দুর্পকে উদ্ধার করেছেন—কিন্তু এ দুর্পের সঙ্গে ঐ দু-আড়াই ডজন দুর্পের আশমান-জমিন ফারাক।

বার্তিলৌ সারারাত জেগে তার নথীপত্র ঘাঁটল। পরদিন সে থানায় এসে ডেকে পাঠালো ঐ অপরাধীকে। বললে, মিসিয়ে মার্তিন, এই ফটোগ্রাফখানা চিনতে পারেন?

লোকটা হাতজোড় করে বললে, স্যার, আমার নাম দুর্প, মার্তিন নয়।

: জানি। সে-কথা তুমি বলছ। কিন্তু ঐ মার্তিন নামে লোকটা মাস-চারেক আগে সিঁদেল চুরির দায়ে ধরা পড়ে। প্রথম অপরাধ বলে সেবার সে বেকসুর ছাড়া পায়। ওর দেহের প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গের মাপ কেমন করে তোমার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এটা বুঝিয়ে বলতে পার?

একটু তদন্ত করেই প্রমাণ পাওয়া গেল মার্তিন আর দুর্প একই ব্যক্তি। লোকটাও শেষমেশ বাধ্য হয়ে কবুল করল।

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হল বার্তিলৌর নিরীক্ষাপদ্ধতি কার্যকরী। পুলিশের বড়কর্তা ওকে ডেকে অভিনন্দন জানালেন। বার্তিলৌ সবিনয়ে বললে, কিন্তু শুধু অভিনন্দন নয় স্যার, আপনি কথা দিয়েছিলেন—আমি বাজি জিতলে আপনি এই সিস্টেম চালু করবেন?

: নিশ্চয়ই করব মিসিয়ে বার্তিলৌ। কিন্তু তার আগে যে একটা কাজ আছে। প্রেস থেকে আপনার ইন্টারভিউ নিতে এসেছে। ওঁদের বুঝিয়ে বলুন—আপনার পদ্ধতিটা কী?

আলফোঁসে বার্তিলৌ রাতারাতি প্রতিষ্ঠা পেল। চাকরিতেও উন্নতি হল। পুলিশ সংস্থায় পরীক্ষামূলকভাবে একটা নতুন বিভাগই খোলা হল। বার্তিলৌ তার কর্তৃত্ব আর দিবাকর সে খাটছে তার পদ্ধতিটার কার্যকারিতা প্রমাণ করতে।

প্রথম বছরে সে বিভাগে 7,336টি অপরাধীর যাবতীয় বৃত্তান্ত নথীবদ্ধ করা হল এবং ঊনপঞ্চাশটি অপরাধীকে সনাক্ত করা গেল। পরের বছর 24 জন অপরাধীকে সনাক্ত করা গেল একই পদ্ধতিতে। এখন আর সংশয়ের কোন অবকাশ রইল না। পরীক্ষামূলক বিভাগটা এবার স্থায়ী বিভাগে পরিণত হল। ফরাসী সরকার আলফোঁসে বার্তিলৌকে এই নতুন 'সনাক্তকরণ বিভাগের' কর্মীর হিসাবে নিয়োগ করলেন।

প্রথম যুগেই সে বিভাগে ফেভারি কাজ হল তা যে কোন গোয়েন্দা কাহিনীকে হার মানায়।

মার্নো নদীতে ভেসে আসা একটি গলিত শব্দ খুলিস বিভাগের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। লোকটা কে, কেঁউ বলতে পারে না—কেমন করে খুন হল সে তো পরের কথা। বার্তিলৌ সেই মৃতদেহের মাপজোখ নিয়ে তার খাতা দেখে বলে দিল লোকটার পূর্বপরিচয়। সে একজন দাঙ্গী আসামী। দলের লোকেরাই তাকে হত্যা করেছে। সেই সূত্র ধরে পরে অপরাধী ধরা পড়ল।

তার চেয়েও মজার কাণ্ড ঘটল রাজমিস্ত্রি রদার ব্যাপারে। রদা একদিন নিরুদ্দেশ হল। খোঁজ-খোঁজ-খোঁজ। সাতদিনের মাথায় মর্গের একটি বিকৃত মৃতদেহ দেখে সনাত্ত করে গেল রদার স্ত্রী এবং ছোট ভাই। রদাকে কে খুন করেছে, কেন করেছে খুঁজতে বসল পুলিশ। পোস্টমর্টেমের পরে মৃতদেহটা নিয়ে গেল ওর স্ত্রী কবর দিতে। বার্তিলৌর কী-জানি কী সন্দেহ হল; সে তন্নয় হয়ে পড়ে রইল নিজের চেষ্টারে। অরপর হঠাৎ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে সে গাড়ি নিয়ে ছুটলো কবরখানায়। মৃতদেহকে ততক্ষণে সমাধিস্থ করা হয়েছে। বার্তিলৌ এগিয়ে এসে মৃতের স্ত্রীর হাত দুটো তুলে নিয়ে বললে, মাদাম রদা, হওভাগটাকে কবর দিয়েছেন ভালই করেছেন, তবে ঐ ট্যাবলেটটা আর লাগাবেন না। কারণ যাকে এইমাত্র কবর দিলেন তিনি আপনার স্বামী নন। ও একজন পাকা ক্রিমিনাল। ওর প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ সেই ক্রিমিনালের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে।

মাদাম রদা কী বলবেন ভেবে পাননি।

বাকশক্তি তিনি অবশ্য ফিরে পেয়েছিলেন, তাঁর ফেরারী স্বামী গ্রেপ্তার হয়ে ফিরে আসার পরে।

ক্রমে বার্তিলৌর এই পদ্ধতি বিশ্বের বিভিন্ন অপরাধ-বিজ্ঞানী সংস্থা গ্রহণ করল। দু-একটি বড় জাতের রহস্য সমাধান করতে বিদেশী সরকার ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানানেন, বার্তিলৌর সাহায্য চেয়ে। কয়েকটি ক্ষেত্রে 'প্রায়-অসম্ভব' রহস্যের সমাধান করে ফেললেন তিনি। প্রতিদানে রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস তাঁকে একটি স্বর্ণমডিও এবং মুস্তাখচিত টেবিল ঘড়ি উপহার দিলেন। কুইন ভিক্টোরিয়া দিলেন সোনার মেডেল।

শুধু ঐ দু'জনই নয়, স্বদেশের বাইরে থেকে চৌদ্দটি বিদেশী সরকার—অস্ট্রিয়া, সুইডেন, জার্মানী প্রভৃতি, তাঁকে সম্মানিত করেছে, হয় সরকারী অভিনন্দন জানিয়ে, অথবা খেতাব দিয়ে, কিম্বা মহামূল্য প্রতীক উপহার দিয়ে।

বার্তিলৌর সুনাম তখন পৃথিবীব্যাপী। তবু বিশ্রাম নেই তাঁর। নতুন নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে চলেছেন তিনি। বার্তিলৌ প্রায়ই বলতেন, 'নিখুঁত অপরাধ' (perfect crime) বলে কোন কিছু নেই। প্রত্যেকটি অপরাধের পিছনেই কোন না কোন সম্ভাবন সূত্র থাকবেই। হয়তো সেটা এতই সুস্বাভাসিক যে গোয়েন্দার নজরে পড়ল না, এই যা।"

এই সময়েই বার্তিলৌ একটি ঐতিহাসিক কেস-এর রহস্য ভেদ করেন— ব্যারন জিডলার হত্যা— আর তাতেই প্রমাণ হল তাঁর উদ্ভিটার—'পারফেক্ট ক্রাইম' বলে কিছু নেই।

ব্যারন জিডলার একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। শনকুণ্ডের। জার্মান। নিতান্ত দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুটা অত্যন্ত মর্মবিদারক। ব্যারনের ছিল অনেকগুলি খানদানি রেসের ঘোড়া। রেস

খেলার মাধ্যমেই তাঁর ঐশ্বর্যের সন্ধ্যা। মারাও গেছেন তাঁর আস্তাবলে। জার্মান পুলিশ অনুসন্ধান করে উপসংহারে এসেছে—নিতান্ত দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু। ঘটনাটা যখন ঘটে তখন আস্তাবলে আর কেউ ছিল না। ছিল শুধু অনেকগুলি স্থানদানি রেসের ঘোড়া, এবং সদ্ব্যকীত একটি আরবীয় স্ট্যালিয়ন। মৃতদেহটা পড়ে ছিল ঐ জংলী ঘোড়াটার পিছনের পায়ের অদূরে। মাথার খুলিটা উড়ে গেছে ঘোড়ার পায়ের চাঁট খেয়ে। কেন যে তিনি ঐ অচেনা ঘোড়ার কাছে অমন একা-একা গিয়েছিলেন তা কেউ বলতে পারে না।

তবু কী-জানি কেন সন্দেহ হল পুলিশের বড়কর্তার। সন্দেহের হেতু ব্যারনের বিপুল বিত্ত এবং তাঁর একাধিক শত্রু থাকায়। জার্মান সরকার অনুরোধ জানালেন ফরাসী সরকারকে, মিসিয়ে বার্তিলৌ যদি একবার দয়া করে দেখে যান।

বার্তিলৌ যখন ওখানে এসে পৌঁছিলেন তখন মৃতদেহকে কবরস্থ করা হয়নি বটে, তবে আস্তাবল থেকে তাঁর ড্রইং রুমে নিয়ে আসা হয়েছিল। সব কিছু শুনে বার্তিলৌ বললেন, মৃতদেহটি ঠিক যে অবস্থায় যেভাবে প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছে সেই অবস্থাতে রাখুন দেখি। আদেশ পালিত হল। তখন উনি বললেন, হের কমিশনার, এবার গুঁর মাথার চোটা পরীক্ষা করে দেখুন। কোন দিকে চোট লেগেছে এবং কোন দিকে খুলিটা ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। এমন আঘাত ঘটতে পারে দুটি বিকল্প ঘটনাতে। এক, ঘোড়াটা উন্টোদিকে চোট মেরেছিল—অর্থাৎ তার ঠ্যাঙ মাটি থেকে উপরে ওঠেনি বরং উপর থেকে নিচে নেমেছিল। দুই, ব্যারন জিডলার ঘোড়াটার দিকে শিরপা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন—অর্থাৎ তাঁর মাথা ছিল নিচে, ঠ্যাঙ আকাশে। নয় কি? তৃতীয় কোন বিকল্পে আঘাতটা ওভাবে লাগতে পারে না। এবার বলুন, কোন বিকল্পটা আপনারা মেনে নিচ্ছেন?

এতবড় ‘ক্লু’-টা এতক্ষণ কারও নজরে পড়েনি। জার্মান পুলিশের বড়কর্তা বললেন, ঠিক কথা। ওভাবে চোট কেমন করে লাগল?

বার্তিলৌ বললেন, তার একটিই সমাধান : এটি একটি প্রায়-নিখুঁত খুন, যাকে বলে “Near-perfect crime!”

পরবর্তী অনুসন্धानে খুনী ধরা পড়ে। উনি ঠিকই আন্দাজ করেছিলেন। ব্যারন জিডলারকে আততায়ী পিছন থেকে জাপটে ধরে এবং ঘোড়াটার দিকে ছোঁড় করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে। ঘোড়াটার প্রথম চোট লাগে ব্যারনের বুকে। তিনি অজ্ঞান হয়ে যান এবং তাঁর মাথাটা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে। ঐ অবস্থায় ঘোড়াটা দ্বিতীয়বার চোট ছোঁড়ে এবং ব্যারনের খুলি উড়ে যায়। আততায়ী ভেবেছিল সে ধরা-হোওয়ার বাইরে। ভুল ভেবেছিল বেচারি।

এই ঘটনার পর থেকেই বার্তিলৌর নির্দেশে স্থির হয় কোনও মৃতদেহ আবিষ্কৃত হলে যতক্ষণ না পুলিশ এসে তার ফটো নিচ্ছে ততক্ষণ অকুহল থেকে মৃতদেহকে অপসারিত করা হবে না—প্রাণ আছে কিনা ঐটুকু বুঝে নিতে যতটুকু স্পর্শ করতে হয় তার বেশি যেন মৃতদেহকে স্পর্শ না করা হয়। এ আইন অপরাধ-বিজ্ঞানে এখন সর্বদেশে স্বীকৃত।

অপরাধ-বিজ্ঞানের অনেকগুলি সুত্রই আলফোঁসে বার্তিলৌর অবদান। পায়ের ছাপ

কত দূরে দূরে পড়ছে সেটা মেপে আন্তর্জাতিক উচ্চতা বলে দেবার যে হিসাব সেটাও তাঁর আবিষ্কার। ফটোগ্রাফির অনেক কায়দা তিনি আবিষ্কার করেন। 1911 সালে ল্যান্ডার মিউজিয়াম থেকে বিশ্ববিশ্রুত তৈলচিত্র মোনালিসা একবার চুরি যায়। পরে সেটি পুলিশে উদ্ধার করে। অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন সেটি আসল মোনালিসা নয়, তার নিখুঁত নকল। বার্তিলৌ ক্যামেরার সাহায্যে বলে দিতে পারেন—এটা নকল নয়, আসলই। *

অনেকের ভুল ধারণা আছে, বার্তিলৌই বুঝি আবিষ্কার করে বলে দেন যে, প্রত্যেকটি মানুষের আঙুলের ছাপ বিভিন্ন প্রকারের। না, সেটা ঠিক নয়। Finger-print বিজ্ঞানের ইতিহাসটা অন্যরকম। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে থেকেই চীনখণ্ডে নিরক্ষরের ক্ষেত্রে টিপছাপ নেবার ব্যবস্থা ছিল। ওরা ধরে নিয়েছিল, প্রতিটি মানুষের আঙুলের ছাপ বিভিন্ন। 1856 সালে দেখা যায় এক ইংরাজ ভদ্রলোক পেনশন দেবার সময় টিপছাপ নিচ্ছেন। উনি ঐ চৈনিক ব্যবস্থাটায় বিশ্বাসী—মৃত টমের বদলে তার সমবয়সী ডিক বা হ্যারি পেনশন নিয়ে যাচ্ছে কিনা পরীক্ষা করতে তিনি এ ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপারটায় তখনও কেউ গুরুত্ব দেয়নি। ফিঙ্গার-প্রিন্ট সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে অগ্রসর হলেন 1892 সালে একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক, যাকে এজন্য পরে নাইটহুড দেওয়া হয় : স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন।

অবিশ্বাস্য মনে হবে—কিন্তু এই আবিষ্কারের কথা শুনে গোয়েন্দা কুলতিলক বার্তিলৌ সেটাকে আদৌ কোন গুরুত্ব দেননি। তিনি ওটা বিশ্বাসই করতে চাননি। এমনই হয়। বিশ্ববিশ্রুত জার্মান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট অটো হান যেমন বিশ্বাস করতে পারেননি মাদাম কুরির কন্যা আইরিন কুরি অ্যাটম বিদীর্ণ করেছেন—ইউরেনিয়াম পরমাণুতে নিউট্রন 'বোম্বার্ড' করে পেয়েছেন 'ল্যাথানা' ধাতু। পরে কিন্তু সেই সূত্র ধরেই অটো হান নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং নিজেই ইউরেনিয়াম-235 ভেঙে পেলেন 'বেরিয়াম'। যা থেকে আজও স্বীকার করা হয়, জার্মান পণ্ডিত অটো হান হচ্ছেন অ্যাটম-বোমা আবিষ্কারকদের মধ্যে অন্যতম ভগ্নীর্থ।

বার্তিলৌর ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হল। স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনের কয়েকজন শিষ্য এসে ওঁকে বোঝাতে চাইল "ফিঙ্গার-প্রিন্ট" অপরাধ-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার হচ্ছে চলেছে। তারা বলল, মানুষের হাতের আঙুলের ছাপ অপরিবর্তনশীল। মাতৃগর্ভে চার মাস স্বাস্থ্যসেই এই ছাপ গড়ে ওঠে এবং মৃত্যুর পরেও তা অপরিবর্তিত থাকে। মিশরের মন্দির টিপছাপ এনে দেখালো পাঁচ হাজার বছরেও তা অবিকৃত আছে। ওরা বলল, আঙুলের চামড়া যদি ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে টেঁছে তুলে ফেলা যায়, তবুও নিত্যই নেই। নতুন টিসু যখন গজাবে তখন তা একই ধাঁচের রেখা নিয়ে গজাবে। ওঁদের হিসাবমতো দুটি মানুষের হাতের টিপছাপ কিছুতেই একরকম হতে পারে না। 'প্রোবাবিলিটি'-র গাণিতিক হিসাব কষে অর্থাৎ সম্ভাব্যতার আঁক কষে দেখা গিয়েছে দশ কোটি মানুষের মধ্যে দু'জনের আঙুলের ছাপ এক হতে পারে না।

* ঐ ঘটনা অবলম্বন করে প্রায় একটা গোটা বইই এককালে লিখে ফেলেছিলেন : "প্রবঞ্চক"।

বার্তিলৌ শূনে বলেছিলেন, বিষয়টা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আচ্ছা, আমি এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে জানাব।

তার আগেই উনি সফলতার স্বাদ পেয়েছেন। উনি জীবনে সার্থক। হয়তো তাই এই নতুন পদ্ধতিটার দিকে ঠঁর আগ্রহ জন্মাল না। উনি তখনও ঠঁর সেই প্রিয় থিয়েরী ‘অ্যানথ্রোপোমেট্রি’ নিয়েই মেতে আছেন। সেটাকেই অপরাধ-বিজ্ঞানের চরমতম অস্ত্র হিসাবে ধরে রেখেছেন।

এরপর একটি ঘটনা ঘটল। ঠিক যেভাবে আটো হান রাতারাতি স্বীকার করেছিলেন আইরিন কুরির আবিষ্কারটা যুগান্তকারী, তেমনিভাবে বার্তিলৌও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন, স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনের ঐ আঙুলের ছাপটাও অপরাধ-বিজ্ঞানের এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সদ্যমৃত একজন অপরাধীকে বার্তিলৌর প্রথায় মাপজোখ নেওয়া হচ্ছিল এবং ফটো তোলা হচ্ছিল। লোকটার নাম উইল ওয়েস্ট। হঠাৎ তদন্তকারী অফিসারটি বলে বসল—ঠিক এইরকম চেহারা, এই মাপজোখ আগেও কোথায় পেয়েছি। বছর দুই আগে। কোথায়? উইল ওয়েস্ট কিছুতেই স্বীকার করল না যে, তাকে আগে কখনও স্থানায় ধরে আনা হয়েছে এবং এভাবে মাপজোখ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তদন্তকারী অফিসারটিও নায়েড়বান্দা। দিন তিন-চার ক্রমাগত অনুসন্ধান চালিয়ে সে খুঁজে পেল সেই গোপন সূত্র। বছরতিনেক আগে একটি লোকের মাপজোখ নেওয়া হয়েছিল। লোকটার নামও উইলিয়াম ওয়েস্ট। তার ফটো, হুবহু এই উইল ওয়েস্টের মতো—নাক, চিবুক, হাড়-গোড়-এর যাবতীয় মাপ হুবহু এক। কিন্তু কিছুতেই কবুল করল না উইল ওয়েস্ট। বললে, হ্যাঁ ঐ ফটোটা মনে হচ্ছে আমারই। আপনারা কেমন করে তা সংগ্রহ করেছেন তা জানি না। তবে আমার জ্যতসারে এ ফটো নেওয়া হয়নি।

এ কৈফিয়ৎ যে নেহাতই অর্থহীন তা সবাই বুঝল। কিন্তু উইল ওয়েস্টের উকিল যে প্রমাণ দাখিল করল তা অচিন্তনীয়। শোনা গেল, উইলিয়াম ওয়েস্ট আজও মেয়াদ খাটিছে।

সে কী! পুলিশের লোক ছুটল সেই জেল-এ। হ্যাঁ, উইলিয়াম ওয়েস্টকে সেখানে পাওয়া গেল। যেন ‘বিশ্বের বন্দী’ উপন্যাস। দু’জনের চেহারা হুবহু এক। অ্যানথ্রোপোমেট্রির মাপজোখ অনুসারে, বার্তিলৌর থিয়েরী অনুসারে, উইল ওয়েস্ট এবং উইলিয়াম ওয়েস্ট অভিন্ন ব্যক্তি। অথচ দু’জনেই জন্মজাত ঠেঁকে!

টেলিগ্রাম গেল পারীর পুলিশ হেড-কোয়ার্টার্সে। সমস্ত তথ্য মাপজোখ এবং এক ভজন ফটো পাঠিয়ে দেওয়া হল। পাশাপাশি দু’জনের আছে উইল ওয়েস্ট এবং উইলিয়াম ওয়েস্ট। তাদের সামনে থেকে তোলা ছবি, পাশ থেকে তোলা ছবি, দূর থেকে এবং কাছ থেকে নেওয়া ছবি। সবই হুবহু এক। আর ঐ সঙ্গে দুটি কাগজ : একটায় উইল অপরটায় উইলিয়ামের আঙুলের ছাপ। সেখানে আশমান-জমিন ফারাক।

সফলতার তুঙ্গশীর্ষে উঠে স্বতন্ত্রেই আলফোর্সে বার্তিলৌ হয়েছিলেন তদানীন্তন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা—এই কাগজপত্র পাওয়ার পর তিনি যা করলেন তাতেই তিনি

হয়ে গেলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা।

এক নম্বর : তিনি একটি টেলিগ্রাম করে অভিনন্দন জানালেন স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটনকে। বিলম্বিত অভিনন্দনের জন্য ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে।

দু নম্বর : ফিসার-প্রিন্ট বিজ্ঞানটার সম্ভাবনা বুঝে উঠতে যে কয় বছর দেয়া করেছেন তার পরিপূরক হিসাবে অফিসের কাজ বাড়িয়ে দিলেন। অবিলম্বে নতুন বিভাগ খোলা হল : 'আঙুলের ছাপ বিভাগ'। সেখানে নিজেই বসলেন গবেষণা করতে।

প্রথমে এ বিষয়ে যা কিছু লেখা হয়েছে, অবজ্ঞামিশ্রিত অনীহায় যা এতদিন পড়ে দেখেননি, সেগুলি দিব্যরাত্র পরিশ্রমে সব পড়ে ফেললেন। পর পর দুটি আবিষ্কার করলেন এ বিষয়ে : এক নম্বর, 'ফিসার-প্রিন্ট ফটোগ্রাফির' কিছু নয়া পদ্ধতি ; দু-নম্বর, ভূষো কালির বদলে একজাতীয় সাদা পাউডার।

কিন্তু একটা কথা। তখনও পর্যন্ত আঙুলের ছাপ দেখে কোন বড় জাতের অপরাধীকে ধরা যায়নি। এ বিজ্ঞানটা আবিষ্কৃত হয়েছে আট-দশ বছর আগে, স্বীকৃতিও পেয়েছে—কিন্তু তার ব্যবহারিক প্রয়োগ হয়নি।

সেটাও ঘটল ঐ বার্তিলৌর হাতে, যিনি নিজেই প্রথমে অধীকার করেছিলেন এ পদ্ধতির কার্যকারিতা মেনে নিতে।

1902 সালের অক্টোবরে পারীর একজন দস্ত চিকিৎসকের চেম্বারে একজন অজ্ঞাত আততায়ী প্রবেশ করে। ঢুকেছিল স্কাই-লাইটের কাচ ভেঙে। উদ্দেশ্য : বলা বাহুল্য। আলমারি ভেঙে ক্যাশ ও কিছু যন্ত্রপাতি ব্যাগে ভরে যখন কেটে পড়তে চাইছে তখনই নিশ্চয় মুখোমুখি দেখা হয়ে গিয়েছিল ডাক্তারবাবুর চাকরটার সঙ্গে। কারণ পুলিশ এসে যখন ঐ চাকরটার মৃতদেহ আবিষ্কার করল তখন দেখা গেল রীতিমত একটা মারামারি হয়েছিল দু'জনের। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে ভাঙা জিনিসপত্র... আততায়ী না-পাতা।

সদর দপ্তর থেকে বার্তিলৌ স্বয়ং এলেন অনুসন্ধানে। তদন্ত করতে করতে খুঁজে পেলেন ভাঙা স্কাই-লাইটের উপর কিছু আঙুলের ছাপ। সম্মুখানে কাচখানা নিয়ে এলেন নিজের বিজ্ঞানাগারে। এনলার্জড ফটো তুললেন। তারপর শুরু হল ফাইল ঘাঁটার কাজ।

আশ্চর্য! অপরিসীম আশ্চর্য! ঐ আঙুলের ছাপ হুবহু মিলে গেল ওঁর ফাইলে রাখা একটি দাগী আসামীর টিপছাপের সঙ্গে। তার নাম শোফার। অচিরেই ধরা পড়ল লোকটা।

মামলা চলার সময় প্রমাণিত হল শোফার চুরি করতে আসেনি আদৌ। বিশেষ কারণে তার রাগ ছিল ডাক্তারবাবুর ঐ চাকরটার উপর। অনেক অনেকদিন ধরে সে রাগ পুষে রেখেছে। চাকরটা ওর বিরুদ্ধে বহুদিন আগে একবার একজাহার দিয়েছিল। কিন্তু এবার সে হত্যাটা এমনভাবে সাজাতে চেয়েছিল যাতে মনে হয় এটা হিঁচকে চোরেরই কাণ্ড—বাস্য হয়ে সে চাকরটাকে খুন করে রেখে গেছে।

মামলায় শোফার দোষী সাব্যস্ত হল।

উপসংহারে বার্তিলৌ বলেছিলেন, হত্যার এটিকেও একটা near-perfect crime বলা যেতে পারে—সুন্দর পরিকল্পনা করেছিলে তুমি।

শোফার বলেছিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আপনি যে কেমন করে আমার পাত্তা পেলেন সেটা আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি, স্যার।

* বার্তিলৌ হেসে বলেছিলেন, তোমাকে আমি ধরিনি শোফার, ধরেছেন স্যার ইন্সপেক্টর গ্যালটম। তাঁকে তুমি চিনবে না। তবে তোমার নামটা অপরাধ-বিজ্ঞানে চিরস্থায়ী হয়ে রইল—কারণ, ফিঙ্গার-প্রিন্ট সূত্র ধরে তুমিই প্রথম আসামী যে ঘরা পড়ে কনভিক্টেড হল।

বার্তিলৌ একষট্টি বছর বয়সে 1914 সালে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। কিন্তু অপরাধ-বিজ্ঞান থেকে কোনদিন তাঁর নাম বিদায় নেবে না।*

*তথ্যসূত্র : Irving Wallace-এর লেখা TRUE [Fawcett Publications Inc. 1940]



হিন্দু স্কুলের উষাযুগ ও আমি

ঠাকুর বলতেন, কুয়ার ব্যাঙ কোনদিন সাগরের হৃদিস পায় না। হক কথা! কিন্তু ঠাকুরের ঠাকুরাণী তো শুনেনি দয়ারময়ী। ভাবলে বিনা দোষে ঐ অঝোলা জীবাণুকে এভাবে বশিত করলেন কেন? কথাটা নিয়ে অনেক ভেবেছি। পরে বুঝতে পেরেছি, কুয়ার ব্যাঙের ট্রাজেডির মূলটা ওখানে নয়, অন্যত্র।

ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি শুনুন : ঠাকুরের ঠাকুরাণী তাঁর কারিগর বিশ্বকর্মাণকে ডেকে বলে দিয়েছিলেন, “বাপু হে! ব্যাঙের বেলা চোখ দুটো মাথার দু-পাশে না গড়ে মাথার উপর গড়বে, বুঝলে?”

—কেন গো?

কারণ কুয়ার ব্যাঙের চারধারে শুধুই কুয়ার ‘পাড়’। পাড়ের পর পাড়, তারপর পাড়, তারপর আবার পাড়। সারিসারি সমকেন্দ্রীয় কুয়ার পাড়ের চক্করের মধ্যখানে এক মুঠো গোলাকার নীলমতো কী যেন! কী ওটা? সংসারের চক্করে-পড়া কুয়ার ব্যাঙ তা জানে না। সেটাই ওর জীবনের আসল ট্রাজেডি! মাথার উপর একজোড়া চোখ থাকা সত্ত্বেও বেচারি বোঝে না—শেষপ্রান্তের ঐ ছোট্ট নীল-মতো গোলাকার বস্তুটা মহাব্যোমের প্রতীক—এক মুঠো নীলাকাশ! যা ঐ সাগরের চেয়ে অনেক অনেক বড়—লক্ষকোটি গুণ! বোধকরি জগৎ স্রষ্টার বৃহত্তম সৃষ্টি।

আমারও একই ট্রাজেডি!

জীবনের দু-দুটি বছর মাথার উপর ছিল ঐ একমুঠো নীলাকাশ। যে নীলাকাশে বিগত শতাব্দীতে বিচরণ করতেন : রামানন্দ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, রামগোপাল ঘোষ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অর্থাৎ অত্রি-অদ্বিরা-পুলহ-পুলস্ত-মারীচ-কৃত্তু আর বশিষ্ঠ! আমি টের পাইনি!

খুলেই বলি :

উনিশ শ ছত্রিশ সাল। ক্লাস সিক্স থেকে সদ্য প্রমোশন পেয়েছি অন্য একটি স্কুলে। বাবা-মশায়ের নির্দেশে সেজদা আমাকে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন হিন্দু স্কুলে—ক্লাস সেভেন-এ। আগের বছর অন্য স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষায় নম্বর ভালই পেয়েছিলাম, ভর্তি হতে বেগ পেতে হল না। কিন্তু দু-বছরের ভিতরেই পারিবারিক হেতুতে আমাদের কলকাতা ছাড়তে হল। আমি গিয়ে ভর্তি হলাম আসানিসোলে ই-আই-আর স্কুলে—হরিদাস গোস্বামীর ছত্রছায়ায়। সেখান থেকেই ম্যাট্রিক দিই।

মাত্র দুটি বছর ছিলাম হিন্দু স্কুলে। ক্লাস সেভেন আর এইট। তাই নিজেকে প্রান্তন ছাত্র বলতে সঙ্কোচ হয়। হিন্দু স্কুলের কোন সম্ভবতন্ত্রে কখনো আমন্ত্রিত হইনি, নিজে থেকে যেতেও কুণ্ঠা হয়েছে। সহপাঠীদের মধ্যে স্বাক্ষর চারজনের কথা মনে আছে। ফার্স্ট

বয়স মিলিত মিত্র পরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হয়। কেদারনাথ দে আমার সঙ্গে বি. ই. কলেজে পড়তে যায়। পাশ করা সিভিল এঞ্জিনিয়ার। তিন নম্বর বটুকনাথ মুখুজে হয় এম. বি. বি. এস. ডাক্তার, আর সঙ্গীতকেশরী লালচাঁদ বড়ালের বংশের দুর্নীচাঁদ গান-বাজনায় নাম করে—কিছু বাঙলা ছবিতে সুরারোপও করে। বাদ বাকি প্রায় চল্লিশজন সহপাঠী স্মৃতি থেকে স্রেফ কর্পূর।

মাটির মহাশয়দের মধ্যে মাত্র দুজনের কথা মনে আছে। প্রথম কথা ড্রইং স্যার। নামটা ভুলে গেছি, তবে একশর উপর পরমায়ু না হলে এতদিনে তিনি বৈকুণ্ঠলোকে বসে নন্দনকাননের স্বেচ আঁকছেন। অমর্যিক আত্মভোলা শিল্পী মানুষ। ড্রইং-এ 'ফেলু মারলে' ক্লাস প্রমোশন আটকাতো না; ড্রইং-এর নম্বর টোটাতে যোগ করাও হত না। ফলে ড্রইং ক্লাসটা ছিল 'এলেবেলে', অধিকাংশের কাছে। তারা ক্লাসে কাটাকুটি খেলত অথবা গোষ্ঠ পাল কিংবা ব্র্যাডম্যানের প্রতিভার মূল্যায়ন করত। কিংবা না কি আরও শক্ত জাতের অঙ্ক, তাহি কষত : দেবিকারাণী আর লীলা চিটনীস্ এর মধ্যে কে বেশী সুন্দরী তাই হিসেব করে বার করত। আমরা গুটি তিন-চার ছাত্র ড্রইং-স্যারের কোল ঘেঁষে ছবি আঁকা শিখতাম।

মুশকিল হল এই যে, স্যার কী জানি কী-করে আমার ভিতর এক হবু চিত্রশিল্পীকে আবিষ্কার করে বসলেন। ফলে আমি ড্রইং খাতায় যা আঁকি উনি তা সব সময়ে নিখুঁত করতে বক্তপরিবর্তন। এত ইরেজার ঘষেন যে, আমার আঁকা মূল ছবিখানা ধূপের ধোঁয়ার মতো মিলিয়ে যায়—প্রথমে সূর্যতাপে পীড়ের রাস্তায় ছলকে-পড়া জলের দাগের মতো। পরিবর্তে আবির্ভূত হয় সংশোধিত নতুন ছবি—বক্তৃত আদ্যন্ত স্যারের আঁকা! বাড়িতে সবাই আমার ড্রইং-খাতা দেখে তারিফ করে, আর আমি লজ্জায় মাটির সাথে মিশে যাই।

দ্বিতীয়ত, মনে আছে বাঙলা স্যার বঙ্কিমবাবুর কথা। দুটি কারণে। প্রথমত, তিনিই আমাকে বাংলা-সাহিত্যের দিকে প্রথম টেনে আনেন। দ্বিতীয়ত, তিনি আমাকে কাছে ডেকে একদিন নিভতে 'মন দিয়ে পড়াশুনা করার' উপদেশের অনুপান হিসাবে কিছু 'দিলতোড় ভবিষ্যদ্বাণী' শুনিয়েছিলেন। জানি না, তাঁর সে আশা পূরণ করতে পেরেছি কিনা। তবে আজ হঠাৎ তাঁর দেখা পেলে বলতুম,

"এই স্কেতারে নেমেছিল তোমার আঙুলের প্রথম দরদর।"

এর মধ্যে আছে তার জাদু

এই তরীটিকে প্রথম দিয়েছিলে তেলে

কিশোর বয়সের শ্যামল পারের থেকে

এর মধ্যে আছে তার বেগ।

আজ মাখনদীতে সারিগান গাইছে ফকির

তোমার নাম পড়বে বাঁধা

তার হঠাৎ তানে।

বিশেষ একটা 'পিরিয়ডের' কথা মনে পড়ছে। উপমান আর উপমেয় কাকে বলে

বোঝাতে তিনি ক্লাসে একটা মনগড়া লম্বা 'মিলটনিক সিমিলি' মুখে মুখে বানিয়ে গেলেন—

“এই যেমন মনে কর, ক্লাসে তোমরা হচ্ছে বত্রিশ পাঁচ দাঁত—কেউ স্বদন্ত, কেউ চর্বণদন্ত, কেউ শোভাদন্ত বা গজদন্ত। আর আমি তোমাদের মাঝখানে ঘেরাও হয়ে আছি; আমি জিহ্বা। আমি প্রতিনিয়ত তোমাদের ভাল করার চেষ্টা করি, গায়ে হাত বুলাই, বাবা-বাছা করি, তোমাদের সাফ-সুতরো রাখার চেষ্টা করি। আর একটু সুযোগ পেলেই তোমরা আমাকে কুটুস্ করে কামড়ে দাও! কী? তাই তো?”

আমরা আর কী বলব? চুপ করে থাকি।

ঠাৎ আমার দিকে ফিরে স্যার বললেন, “কী সান্যাল? তুমি কিছু বল?”

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলাম, “এরপর আমি আর কী বলব, স্যার? তবু তো আপনি হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে আমাদের লজ্জার কথাটা বলেননি।”

—“লজ্জার কথা! সেটা কী রকম?”

—“আমরা, দাঁতেরা যখন কোন কিছু অন্যায় করে বসি—ধরুন, রাগের মাথায় কাউকে কামড়ে দিই, তখন আমরা বত্রিশপাঁচ দাঁত এককটা হয়ে ঠোঁটের দোরে আগল দিই! আর ঐ নিরপরাধ জিহ্বা—কামড়ানোর মধ্যে যার কোন ভূমিকাই ছিল না—তাকে ঘাড় ধরে ঘরের বাইরে বার করে দিই—”

বলেই মনে হল, বাড়াবাড়ি রক্তমের প্রগল্ভতা হয়ে গেছে।

লজ্জায় আমি জিব কাটি—আর বন্ধিমবাবু হো-হো করে সিলিং-ফ্যান-কাঁপানো হাসি হেসে ওঠেন।

চুয়াম বছর পার হয়ে গেছে তারপর। তবু সেই দরাজ-দিল-এর হাসিটা ভুলতে পারিনি।

কিন্তু নাঃ। এইসব বিশ্বতপ্রায় টুকরো-কথার বাসিফুলের মালা গাঁথার ব্য্থ চেষ্টা করব না। যে-কথা বলছিলাম—উনিশ-শ ছত্রিশ-সাঁইত্রিশে আমি ছিলাম কুপমণ্ডুক। মাথার উপর নীলাকাশটা ঠিকই ছিল—অত্রি-অঙ্গিরা-বশিষ্ঠের পদ্মরেণুধন্য অীর্ষের মাহাত্ম্যটা কিন্তু আমি বুঝতে পারিনি। বোকার মতো দূরবীনটা ধরেছিলাম উল্টো করে। আকাশটাকে দেখতে পাইনি—বিপরীত পাথে দেখেছিলাম আইপিসটাকে। এক মুঠো ঐ নীলাকাশেই যে গত শতাব্দীতে প্রোজ্জ্বলপ্রভায় জ্যোতির্ময় নক্ষত্রের বহুসংখ্যক ঠাকুর থোক সত্যেন ঠাকুর, দীনবন্ধু মিত্র থেকে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, দীপ্তিমান ছিলেন, এ-কথা প্রবিধান করার মতো না হয়েছিল বয়স না পেকেছিল বুদ্ধি।

তাই বরং সেই আদিসুরীদের কয়েকজনকে এই মণ্ডুকীয় আপনাদের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানাবার আয়োজন করি—

হিন্দু স্কুল/কলেজের আদিসুরীদের কয়েকজন

জন্মসালের ক্রমে সজ্জিত। চরিত্রের দায়িত্ব লেখকের, সম্পাদকের নয়। হিন্দু কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হবার পূর্বযুগের যে চব্বিশজনকে বেছে নিয়েছি, তাঁরা

ছাড়াও স্বনামধন্য মহাত্মা আরও আছেন। এ অনবধানতা লেখকের। তাই অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী। কেউ কেউ হেয়ার স্কুল হয়েও হিন্দু কলেজে এসেছিলেন।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি. এস. আই.— 1801-'68 হিন্দু কলেজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা গোপীমোহন ঠাকুরের সুযোগ্য পুত্র। পরে তিনি নিজেও ঐ কলেজের গভর্নরের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। বাঙালীর নিজস্ব প্রথম নাট্যশালা 'হিন্দু থিয়েটার' (1831)-এর প্রতিষ্ঠাতা। 'টেগোর ল' অধ্যাপক পদের প্রবর্তক। স্বীকার্য—জমিদারদের মুখপাত্র হিসাবে তিনি সিপাহী-বিদ্রোহের নৈতিক বিরোধিতা করেন।

রসিককৃষ্ণ মল্লিক— 1810-'58 ... ডিরোজিওর প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। ইয়ং বেঙ্গলের অন্যতম নেতা হওয়ায় সরকারী চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। পিতৃগৃহ থেকেও নির্বাসিত হন। আজীবন সংস্কারপন্থী। সাপ্তাহিক 'পার্শ্বেন' পত্রিকার অন্যতম উদ্যোক্তা এবং পরে 'জ্ঞানাবেষণ'/'জ্ঞানসিদ্ধান্তরস' পত্রিকাধ্বয় সম্পাদনা করেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রেভারেন্ড—1813-'85... ডিরোজিও-শিষ্য। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর অন্যতম নেতা। মাইকেলের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন।

রাধানাথ শিকদার—1813-'70.... ডিরোজিও-শিষ্য। ত্রিকোণমিতির সাহায্যে জরীপ করে প্রমাণ করেন হিমালয়ের কোন পর্বতশৃঙ্গটি সর্বোচ্চ। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর 'বড়সাহেব' সার্ভেয়ার-জেনারেল কর্নেল এডারেস্ট-এর নামে ঐ পর্বতশৃঙ্গ বিশ্বে পরিচয় লাভ করেছে। রাধানাথ বিস্মৃতপ্রায়! বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বোর বিরোধী এবং বিধবা বিবাহ ব্যাপারে উৎসাহী এই স্বাধীনচেতা বঙ্গসন্তানটি একবার (1843) আদালত কর্তৃক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। অপরাধ : একজন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একটি নেটিভ কুলীকে বেগার খাটতে বাধ্য করছিল—রাধানাথ তার প্রতিবাদ করেন। গ্রীক ও ল্যাটিনে পণ্ডিত। লক্ষণীয় : কোন সরকারী খেতাব পাননি—এমনকি এডারেস্ট আবিষ্কার করেও!

রামতনু লাহিড়ী—1813-'38... 'এবং তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-খ্যাত Arnold of Bengal ডিরোজিও-শিষ্য। বিধবা-বিবাহের সমর্থক। বিবেকনির্দেশে উপবীত ত্যাগ করে (1851) অর্থাৎ ব্রাহ্মগণ আনুষ্ঠানিকভাবে উপবীত বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের দশরত্নর পূর্বে) একঘরে হয়ে যান। ষ্টনচক্রে বর্তমান লেখকের পিতামহীর জ্যেষ্ঠামশাই।

দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাজা—1814-'78... ডিরোজিওর অন্যতম প্রিয় শিষ্য। খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করায় কৃষ্ণমোহন আত্মীয়-স্বজন কর্তৃক ঘৃণিত হন তখন দক্ষিণারঞ্জন তাঁকে আশ্রয় দেন। পরে বর্ধমানরাজ জেহুচন্দ্রের বিধবা রাণী বসন্তকুমারীকে বিবাহ করায় তাঁর সুহৃদগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। শেষ জীবন লন্ডনে অতিবাহিত করেন। এক সময় শিক্ষাব্রতী হেয়ার-সাহেবকে ষাট হাজার টাকা ঋণ দেন। হেয়ার-সাহেব ঋণশোধে অসমর্থ হয়ে তাঁকে কিছু জমি লিখে দেন। দক্ষিণারঞ্জন সেই জমিটি আবার বেথুন সাহেবের স্বীকৃতি গ্রহণ করেন (1894)। খ্রীশিক্ষা প্রচার করে সেটি বেথুন কলেজের জমি কি না উদ্ধার করতে পারিনি।

প্যারীচাঁদ মিত্র—1814-'83... ডিরোজিও শিষ্য। খ্রীশিক্ষা-প্রচারে অগ্রণী, বিধবা-

বিবাহে উৎসাহী এবং বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী এই পণ্ডিতকে পাদ্রী লঙ্-সাহেব 'ডিকেন্স অফ বেঙ্গল' বলতেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে।

রামগোপাল ঘোষ—1815-'68...ডিরোজিও শিষ্য। অসাধারণ বাখী। হেয়ার ও বেথুনকে নানাভাবে সাহায্য করেন। বাখী ও সমাজ সংস্কারক রামগোপালকে বলা হত: 'ইন্ডিয়ান ডিমহিনিস'।

দিগম্বর মিত্র, রাজা, সি. এস. আই.—1817-'79...ডিরোজিও শিষ্য। সামান্য কেরানী হিসাবে জীবন শুরু করে পরে রাজা খেতাব পান। কলকাতার প্রথম বাঙালী শেরিফ (1874) এবং অবৈতনিক জাস্টিস অফ দ্য পীস। দুর্ভাগ্যবশত এই ডিরোজিও শিষ্যটি বহু-বিবাহ রদ আইন এবং বিধবাবিবাহ প্রচলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মর্যব—1817-1905...প্রথমে রামমোহন প্রতিষ্ঠিত অ্যাংলো-হিন্দু স্কুলে এবং পরে (1831) হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা। 1843 সালে বিশ জন বহু সহ ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ।

দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ড.—1819-'70...অর্থাভাবে হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করতে পারেননি। চাকরি গ্রহণ করে ঐ সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করে কৃতবিদ্যা হন। দেবেন্দ্রনাথের পুত্র পরিচয় বাহুল্যবোধে দিইনি; এবার বলি দুর্গাচরণের পুত্র দেশনেতা সুব্রেন্দ্রনাথ।

দুর্গাচরণ লাহা, মহারাজা, সি. আই. ই.—1822-1904...সার্বক এবং স্বনামখ্যাত ব্যবসায়ী ও দানবীর।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রাজা—1822-'91...বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস চর্চার পথিকৃৎ, পুরাতত্ত্ববিদ, ভাষাবিদ, এই ক্ষণজন্মার সম্বন্ধে ম্যাক্সমুলার লিখেছিলেন "রাজেন্দ্রলাল তাঁর জীবিতাবস্থায় ভারততত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত"। এই 'স্মরণ' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে একটি পৃথক প্রবন্ধ প্রকাশের সভাবনা থাকায় এখানেই পূর্বচ্ছেদ টানছি।

মধুসূদন দত্ত, মহিকেল—1824-'73...ভারতচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের যুগের মাঝখানে শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি।

গৌরদাস বসাক—1826-'99...বড়বাজারের বসাক পরিবারভুক্ত এই ক্ষুদ্র পণ্ডিতটি সমকালীন সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন, মণিও মাইকেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবেই আমরা তাঁকে মনে রেখেছি।

রাজনারায়ণ বসু, ঋষি—1826-'99...হিন্দু কলেজে (1848-'43) স্নাতকনামা ছাত্র। নানান সমাজ সেবায় উৎসাহী। 1878 খ্রীষ্টাব্দে 'স্বাধীনতা সভা' নামে একটি গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি তার সভাপতি হন। বঙ্গ সংস্কৃতির অন্যতম পুরোধা এই ঋষি রাজনারায়ণ এক সময়ে রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষকতা করেছিলেন।

ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সি. আই. ই.—1827-'94...মেধাবী ছাত্র হিসাবে 1842 থেকে হিন্দু কলেজে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতন পেতেন। মাইকেল মধুসূদনের সহপাঠী। 'চাকরীজীবনের কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা-ভুগলী নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যাপকদের জন্য যে

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা হয় তাতে 1858 খ্রীষ্টাব্দে কলেজের সতীর্থ মাইকেল মধুসূদনকে পরাস্ত করে তিনি ঐ পদ পান।" গত শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকায় অধ্যক্ষ লিখেছিলেন, "Bhudev with his C. I. E. and Rs. 1500 a month, is still anti-British."

দীনবন্ধু মিত্র, রায়বাহাদুর—1830-73.... নদীয়ার চৌবাড়িয়া গ্রামে জন্ম। পিতৃদত্ত নাম : গুরুব নারায়ণ। অত্যন্ত দরিদ্র। পিতা তাঁকে বালক বয়সে জমিদারী সেরেস্তায় পিয়নের কাজে নিযুক্ত করেন। সেখান থেকে পালিয়ে কলকাতায় চলে আসেন। কাকার বাড়িতে বাসন মাজতেন দু বেলা এই শর্তে যে, তাঁকে লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে পড়তে দিতে হবে। নিজেই স্কুলে প্রবেশের সময় নাম নেন দীনবন্ধু! কলুটোলা ব্রাণ্ড(হেয়ার) স্কুল থেকে বৃত্তি পেয়ে (1850) হিন্দু কলেজে ভর্তি হন। পর পর তিন বছর সব পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করেন এবং বাংলায় বরাবর সর্বোচ্চ নম্বর পান। তবু অর্থাভাবে শেষ পরীক্ষা দিতে পারেন না। দেড়শ টাকা বেতনে পটিনার পোস্টমাস্টারের চাকরি নিয়ে চলে যান, অল্প দিনের মধ্যেই পোস্টাল ইন্সপেক্টর। 1872 সালে রায় বাহাদুর। ঈশ্বর গুপ্তের বন্ধু। 'নীলদর্পণ' নাটক তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ঢাকা থেকে 'কস্যাটিং পথিকসা' ছদ্মনামে প্রথম প্রকাশ। মাইকেল তার ইংরেজি অনুবাদ করেন (বিদেশী ভাষায় অনূদিত প্রথম বাংলা নাটক)। লঙ্-সাহেব মধুসূদনকে বাঁচাতে আদালতে দাঁড়িয়ে বলেন যে, তিনিই অনুবাদক। লঙ্-এর কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড দুইই হয়। অর্থদণ্ড তৎক্ষণাৎ মিটিয়ে দেন 'ব্রুতোম'—কালীপ্রসন্ন সিংহ। বঙ্কিম স্বয়ং এ নাটকটিকে 'আংকল টম্‌স্‌ কেবিন'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। এ নাটক নানাবাধে তাই বিগত শতাব্দীতে ইতিহাস রচনা করেছে। প্রসঙ্গত এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসে বিদ্যাসাগর মশাই আত্মবিস্মৃত হয়ে অভ্যাচারী নীলকর উড সাহেবের অভিনেতাকে তাঁর 'বিদ্যাসাগরী' চুটি ছুঁড়ে মারেন। অভিনেতা অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, পটক্ষেপণের পর পটের সামনে এসে বলেন, "এই চটির একপাটি আমার অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আমি এটি ফেরত দেব না। আর এক জোড়া এই মাপের চটি আনতে লোক পাঠিয়েছি।"

তারকনাথ পালিত, স্যার—1813-1914.... প্রথম বাঙালী সিভিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহপাঠী। বিলেতে গিয়ে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন। প্রকৃত জ্ঞান ও অর্থ উপার্জন করেন। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ; কিন্তু সরকারের সঙ্গে মতভেদে পদত্যাগ করেন। দেশে উচ্চতর বিজ্ঞানচর্চার প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য সারা জীবনের উপার্জিত সমস্ত পৈন্য লক্ষ টাকা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে যান রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষার সম্প্রসারণে। দানপত্রের শর্ত ছিল—অধ্যাপককে ভারতীয় হতে হবে। উপযুক্ত লোক পাওয়া না গেলে দেশীয় মেধাবী ও কৃতী অধ্যাপককে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভের জন্য বিদেশে পাঠাতে হবে।

যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা বাহাদুর—1831-1928.... পাখুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঠাকুর বংশে জন্ম। পিতৃব্য কৃষ্ণকুমার ঠাকুরের বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হন। মেয়ে হাসপাতাল, দাতব্য সভা ও বিধবাদের দণ্ড দূর করার জন্য বহু অর্থ দান করেন।

মহেন্দ্রলাল সরকার, ডাঃ, সি. আই. ই., এম. ডি.—1833-1904....কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ মেডিকেল ডিগ্রী লাভ করার পরে স্থানীয়মানের আবিস্কৃত হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাপদ্ধতি গ্রহণ করে প্র্যাকটিস করতে থাকেন। Calcutta Journal of Medicine-এর প্রকাশ করেন এবং 'Indian Association for the Cultivation of Science'-এর প্রতিষ্ঠাতা (1876) ; মহেন্দ্রলালের পরামর্শ ও উদ্যোগে বিবাহবিধি (Marriage Act III 1872) পাস হয়। মেয়েদের বিবাহের বয়স ন্যূনতম ষোলো বলে ধার্য করা হয়।

কেশবচন্দ্র সেন—1838-'84....দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র 'ব্রাহ্মানন্দ' কেশবচন্দ্র পূরে ব্রাহ্মসমাজ ত্যাগ করে 'ভারতীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন' ও 'অ্যালবার্ট হল'-এর প্রতিষ্ঠাতা। '72 সালে যে 'সিভিল ম্যারেজ অ্যাক্ট' প্রণীত হয় তার মূলে ছিলেন কেশব। কিন্তু নিজ কন্যা সুনীতির সঙ্গে কুচবিহাররাজের পুত্রের বিবাহ হিন্দু মতে দেন। কন্যার বিবাহের নিম্নতম বয়সসীমাও লঙ্ঘন করেন। ফলে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, আই. সি. এস.—1842-1923.... 1875 সালে প্রথম ব্যাচে এন্ট্রান্স পাস করেন। রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ এবং প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস.। সহধর্মিণী জ্ঞানদানদিনী প্রথম পূর্বা-প্রথা ভেঙে স্বামীর সঙ্গে অঙ্গপৃষ্ঠে পথে নামেন। জ্ঞানদানদিনী গভর্নমেন্ট হাউসে প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে যোগদান করেন। সত্যেন্দ্রনাথ নয়টি বাংলা ও তিনটি ইংরেজি গ্রন্থ ছাড়াও বহু ব্রাহ্মসঙ্গীত রচনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ঐরা দুই স্বনামখ্যাত সন্তান।

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—1844-1906.....যাকে ডাব্লিউ. সি. বনার্জি নামে সহজে চিনতে পারা যাবে। ব্যারিস্টার। বাগ্মী। লন্ডনে ইন্ডিয়ান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। 1885-তে বোম্বাইয়ে এবং 92-তে এলাহাবাদে কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। মতাদর্শে তিনি 'লিবারেল' বা উদারপন্থী ছিলেন। ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁর কল্পনায় ছিল না।



প্রচহদশিল্পী খালেদ চৌধুরী



ভারতীয় দর্শনে একটি কথা আছে : 'অন্ধের হস্তিদর্শন'। জনাছয়েক অন্ধ দার্শনিক রাজপ্রাসাদে এসেছিলেন পিলখানায় প্রবেশ করে তাঁদের সম্মিলিত হস্তদ্বারা প্রণিধান করতে 'হস্তী' বস্তুটা কী জাতের। তাঁদের সম্মিলিত হস্তাবলোপন প্রণিধান : "সূর্য-মুন্ডা-তুণ্ড-চামরবৎ"। মানছি, হাতি তা নয়, কিন্তু পঙ্কায়ুবেদকল্পিত হস্তী হস্তীর বর্ণনায় ঐ তুলনাপূর্ণি বর্তমান, এটাও ঘটনা। অপরপক্ষে ক্লিয়ার জীবিত হাতি পিলখানার পোয়া হাতি না হত ? এমনকি সাধারণ জলী বুনো হাতিও সূর্য্য ঐ যাকে বলে যুগ্মচত বিবাগী-দিওয়ানা-দ্বিদ্-যে দুনিয়ার তেয়ারা বর্ণনা না। হস্তিসূত্রের সমাজবদ্ধতায় যার ক্রক্ষেপ নেই, কোনও হস্তিনীর ন্যাকামিও যে বরদাস্ত করে না, তাদের সঙ্গে সন্তপদ একসঙ্গে যেতে নারাজ ? যুগ্মপতির নির্দেশক বিবেকের কঠিনাথের যাচাই করার আগে বিনাবিচারে যে মানতে সুধীকৃত কুসংগা বাঙলায় যাকে বলে বাঙরা রোগী—ইংরেজিতেও তাই—এ rogue-ই। তাহলে এই অন্ধ দার্শনিক পণ্ডিতেরা তার স্বরূপ কেমন করে সমঝে নিতেন ?

সেই একান্তচায়ী নির্জন সাধককে মাপবার মাপকাঠি কোথায় পাবো? তিনি একলব্যের সাধনায় কী কী 'বিভূতি' লাভ করেছেন তা আমরা জানব কী করে? গান গান, শোনান না। ছবি আঁকেন, প্রদর্শনী করেন না। বাজনা বাজান, দোরে খিল দিয়ে। পথে-ঘাটে পাতার পরে পাতা স্বেচ্ছ করেন, কিন্তু বাড়ি ফেরেন খালি হাতে—সব ছবি বিলিয়ে দিয়ে। অর্ধশতাব্দীকাল তিনি একান্ত সাধনায় মগ্নচৈতন্য। কী তাঁর সাধনার লক্ষ্য? অন্তত বিষয়বস্তু? জানি না। পাশ্চাত্য মার্গসঙ্গীত, না ভারতীয় লোকসঙ্গীত? প্রেক্ষাগৃহের আলো-আঁধারীতে জীবনের প্রতিচ্ছবি আঁকতে—নাট্যকারের এই প্রচেষ্টা, 'দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর'—এ মদত দেওয়া, না জিরো নম্বর-তুলির ডগায় অধরাকে ধরার প্রয়াস? মানছি, আপাতদৃষ্টিতে এমন মিশেল অবাস্তব। পাশ্চাত্য সুরলোকের সেই সেট মেরীর নিস্তরঙ্গ স্তম্ভে দ্বিতপ্রাপ্ত ভাসমান মরাল বাস্তব-দোসর খোঁজে না। বিপ্রতীপ নারসিসাস-প্রেমেরই সে মগ্নচৈতন্য। সেখানে নৈশেক্যই মুখর। আবার অমরাবির অঙ্ককার বিদীর্ণ করে হিমাবর্তের যে নিঃসঙ্গ মানদযাত্রী মরাল তার পক্ষবিধূননের প্রতিফলি-অনুনাদও মহামৌনের অনুষঙ্গ। এই দুইয়ে কোন বিরোধ নেই। দুই রাজহংসের দুঃশূন্য পঙ্খো মালিন্য স্পর্শ করতে পারে না, দুজনেই অধরার সন্ধানে অভিসারিকা, দুজনেই 'পরমহংসের পথরেখার দিশারী'।

কিন্তু তা নিয়ে আমার কেন মাথাব্যথা? অত কথায় আমার কী কাজ? আমার উপর দায়িত্ব বর্তেছে অণু-হস্তাবলোপনে যতটুকু আমার এস্তিয়ারে ততটুকু সমঝে নেওয়া। দেখা এবং দেখানো। বাকিটা থাক না আর চারজন অঙ্ক দার্শনিকের এস্তিয়ারে।

কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। অধিকারভেদ-এর কথা। প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরীকে দেখতে ও দেখাতে হলে যে জিনিসটির প্রয়োজন সর্বাত্মক, তা আমার এস্তিয়ারে নেই; তারুণ্য, সময়। শিল্পীর কাছে বিন্দুমাত্র সাহায্য পাবার সম্ভাবনা নেই। ইতিপূর্বে যারা তাঁর কাছে গেছেন তাঁদের প্রায় দোর থেকেই হাঁকিয়ে দিয়েছেন। নেহাৎ তরুণ বয়স্ক চ্যাঙড়া না হলে ঘরে ঢুকতে দিয়েছেন, কিন্তু বলেছেন, আর দুটো বছর সবুর করুন মশাই, তখন বেশ কালো বর্ডার দিয়ে ওসব কথা বাগিয়ে লিখতে পারবেন, এখন সত্যি কথা লিখলেও পাঁচজন মাং-মাং করে তেড়ে আসবে। তখন বানিয়ে বানিয়ে অনেক আলটু-ফালটু কথা বাড়িয়ে লিখবেন, লোকে মেনে নেবে। বলবে: "আহা লোকটা ভালই ছিল!"

তাঁর কোন ফাইল নেই, যা ঐকেছেন তার ফাইল-কপি নেই, দিনপঞ্জিকী নেই। কবে আঁকতে শুরু করেন, এ-যাবৎ কত ঐকেছেন, কোন কোনটি তাঁর নিজের বিচারে শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদপট যেকোন প্রশ্নের একটিই জবাব আমাকে দিলেন "বাদিন ওসব ফালতু কথা। নতুন কী লিখছেন বলুন?"

সুতরাং এই যুথচ্যুত বিচিত্র শিল্পীর প্রকৃত মূল্যায়ন করতে হলে বিভিন্ন প্রকাশক ও গ্রন্থাগারে গিয়ে তাঁর আঁকা প্রচ্ছদপটের একটি তালিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে প্রথম কাজ। চার দশকে পাঁচ-সাত হাজার প্রচ্ছদ তিনি ঐকেছেন—শিল্পীর ধারণা তারও বেশি। আমার পক্ষে সেই তালিকা প্রণয়ন অসম্ভব কাজ। তবে কেন এ প্রবন্ধ লিখতে স্বীকৃত হলাম? তিনটি হেতুতে। প্রথম কথা: ঐ কাজটির প্রয়োজন ছিল এবং আছে। শরদিন্দু যেমন গোয়েন্দা-গল্পকে লঘু-সাহিত্যের উপত্যকা থেকে কথা-সাহিত্যের মালভূমিতে উন্নত

করেছিলেন, ঠিক তেমনি খালেদও এই অবহেলিত কমার্শিয়াল আর্টকে ফহিন আর্টিস পর্যায়ে উন্নীত করেছেন—কটর নীতিবাগীশেরা মানুন আর না মানুন। দ্বিতীয় কথা : আমার এই শৌখিন মজদুরী পাঠে কোনও ভরূণ গবেষক যদি উৎসাহিত হয়ে এ কাজে ব্রতী হন তাহলেই আমার এ রচনা সার্থক। তৃতীয় কথা : অল্পন্যহনি যে-স্বারে প্রবীণ সাহিত্যিকেরা বিদায় নিচ্ছেন তাতে এরপরে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলার লোকই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমার সঙ্গে তাঁর আলাপ তিন দশকের, ঘনিষ্ঠ আলাপ দুই দশকের। মায় খালেদদার—হ্যাঁ, অঙ্কের হিসাবে তিনি আমার অগ্রজ—প্রাইভেট সেক্রেটারিও আমাকে দেখলে চিনতে পারেন। আদাব জানিয়ে বলেন, “যাইয়ে ভিতর, চৌধুরী সাব হ্যায়।” তাঁর প্রাইভেট-সেক্রেটারিকে চেনেন তো ? দোরের সামনেই তাঁর পান-বিড়ি-পানপরাগের বিপণী। খালেদ চৌধুরীর দরজায় তালা ঝোলানো থাকলে ডাকপিয়ন নির্দিধায় তাঁর ঐ অবৈতনিক সেক্রেটারিকে রেজিস্ট্রি চিঠি ডেলিভারি দিয়ে যায়।

উনিশ শ পঁয়তাল্লিশে সিলেট থেকে শহর কলকাতায় এসে পৌঁছালো একটি শ্যামবর্ণ ভরূণ। ‘তার কপালে লেগেছে সকালের আলো, তার পারানির কড়ি তখনো ফুরায়নি, তার জন্যে পথের জ্ঞানলায়-জ্ঞানলায় কালো চোখের করুণ ক্যমনা অনিমেঘ চেয়ে আছে। রাস্তা তার সামনে খুলে ধরলে নিমন্ত্রণের রাস্তা চিঠি।’....

দু-জাতের স্বপ্ন দেখতো কিশোরটি। গাঁইতে হবে গান, আঁকতে হবে ছবি। সুরের সরবী, আর রেখা-রঙের রাজ্যে ধরতে হবে অধরাকে। কিন্তু যৌবরাজ্যের সিংহদ্বারে উপনীত সেই ভরূণের গলায় গান আটকে যায় : তেতাল্লিশের আকালের স্মৃতি তখন সদ্য অতীত। ব্রাহ্মমুহর্তের রামকেলী থেকে মধ্যরাত্রের দরবারী কানাড়ায় তখনও বাজছে যে‘গৎ তার বাঘী—‘মা-রে, টুক ফ্যান দিবা ?’ অসহ্য সে নিরবচ্ছিন্ন আর্তনাদ। শ্রুতি বুদ্ধ হয়ে আসে। তবু আঙুল চলে, তুলির লগিতে একবাঁও মেলে—স্কেচপেন্-এ ধরা দেয় শ্রীহট্ট থেকে কলকাতাব্যাপী মম্বন্তরের মর্মভূদ মৃত্যুদৃশ্য।

কলকাতায় এসে প্রথমেই বৌজ নিতে গেল সরকারী আর্ট স্কুলের সেশন তখন পুরোদমে চলছে। পরের বছর ভর্তি হবার আবেদন করতে হবে। স্কুলী জমি কোনসূত্রে যোগাযোগ হয়ে গেল প্রগতি লেখক-শিল্পী-সঙ্ঘের সঙ্গে। কে যেমন বলল,—হয়তো অজিত সিংহই হবেন—জয়নাল আবেদিন-এর সুপারিশে কাজ হতে পারে। একগাদা স্কেচ বগলে নিয়ে একদিন হাজির হল জয়নাল আবেদিন-এর ডেরায়।

জয়নাল সে-আমলের প্রখ্যাত লোকশিল্পী। তেতাল্লিশের মম্বন্তর যখন নিঃশেষে হারিয়ে যাবে আমার মতো আজও-টিকে-ধাক্কা মুঠিমেয় কিছু পুরুকেশ মানুষের স্মৃতি থেকে, তখনও তা শাস্ত হতে পারে জয়নাল আবেদিন-এর ছবিতে। শ্যামবর্ণ ভরূণটিকে তিনি আদর করে কাছে টেনে বসালেন। বললেন, আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চাও ? বেশ, আগে দেখাও তোমার স্কেচ খাতাখানা।

বাঙালি-বঁাধা স্কেচ বাড়িয়ে ধরল ভরূণটি। তখনো তার নাম না খালেদ, উপাধি না চৌধুরী। জয়নাল প্রতিটি স্কেচ টিপে টিপে দেখলেন। শেষে বললেন, তোমাকে একটা

পরামর্শ দেব, ব্রাদার, শুনবে ?

—বলুন ?

—আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে যেও না।

সুজিত কিশোরটি জানতে চায়, কেন বলুন তো ?

—তোমার তুলির টানে এমন কিছু সাবলীল মৌলিক সত্তার আছে যা আর্ট স্কুলের চিরাচরিত প্রথা বরদাস্ত করবে না। তুমি ওখানে কিছু শিখতে পারবে কিনা জানি না, খোয়াবে অনেক কিছু ! খোদাতালার দেওয়া এলিমেন্টার কবর দেওয়া হবে সবার আগে।

খালেদ শুধু মেনেই নিল না কথাটা, মনে নিল। আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার বাসনটি ত্যাগ করল। তাহলে কীর কাছে শিখবে ? কেন ? 'প্রকৃতি'। সে-আমলে ডেরা-ভাঙা গেড়েছিল চৌদ্দ নম্বর সার্কাস রো-তে। ঐ সময় বন্ধুত্ব হয় কামারুন হাসানের সঙ্গে। সেও পথশিল্পী। দুজনের গভীর বন্ধুত্ব। ঝোলা-ব্যাগ কাঁধে ফেলে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় স্বেচ্ছা একে বেড়ায় দুজনে। একা মানুষ। বিড়ি-সিগারেট-মদ খায় না। খরচ অল্প। মাঝে-মাঝে দু-একটা ছবি আঁকার কাজ পায়। অজিত সিংহ, অসিত গুপ্ত ডেকে কাজ দিতেন। ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ আলাপ হয়েছে আই. পি. টি. এ.-র একাধিক দিকপালের সঙ্গে। এমনকি তাদের ব্যবস্থাপনায় 'নবান্ন'-র যে সর্বশেষে অভিনয় হয় মেদিনীপুরে, সৈবারে বাধ্য হয়ে একটি চরিত্রে অভিনয়ও করতে হয়, নির্ধারিত শিল্পী অসুস্থ হয়ে পড়ায়। ঐ যে নিরাম মানুষটি ক্ষুধার জ্বালায় নিজের মেয়েকে বিক্রয় করে দিয়েছিল !

ছেচলিশে কিছুদিনের জন্য কলকাতার বাইরে গেছিল। ফিরে এল বর্ষার পরে। ইতিমধ্যে মহা সর্বনাশ হয়ে গেছে। প্রবল বন্যায় খালেদদার একতলার ঘরখানি ছিল এক কোমর জলের নিচে—পুরো এক সপ্তাহ ১৭'৩০র যা কিছু সপ্তয়—সবই চিরকালের মতো হারিয়ে গেছে—'বামি'র হাতে নিবে যাওয়া দীপশিখাটির মতো। জামা-কাপড়, ছবি-স্কেচ, লোকসংগীতের সংগ্রহ—যা কিছু ! তখন সন্ধ্যা-রাত, ঘরের যা অবস্থা ভিতরে ঢেকা গেল না। পরদিন সে চেষ্টা করা যাবে বলে শুয়ে পড়ল প্রতিবেশীর দাওয়ায়।

নিশ্চিন্ত ভাব নেই। পরদিন ভোর হল। খালেদ দেখল, তার হাতব্যাগটি কোনও হস্তলাঘব নিঃশব্দে উঠিয়ে নিয়ে গেছে। তার ভিতর ছিল ওর শেষ স্বপ্ন, কিছু জামা-কাপড় ও টাকা-পয়সা।

আক্ষরিক অর্থে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে শিল্পী কপর্দকহীন অবস্থায় পথে নামল। সার্কাস রো ছেড়ে সার্কুলার রোড-এ। শহর কলকাতার অনেককেই চেনে। প্রকৃতি-লেখক সঙ্ঘের তারশঙ্কর থেকে অনেকেই। কিন্তু হাত-পাতাটা যে শেখেনি। গান গাইতে জানে, বাজনা বাজাতে জানে, ছবি আঁকতে জানে, কিন্তু হাতের তালুটা চিৎ করে পাততে জানে না। বক্তৃত অভুত অবস্থায় ছাপান ঘণ্টা কলকাতার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত ঘুরেছে কাজের সন্ধানে। পায়ে হেঁটে। মিডডে-কনসেশনে সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে চড়ার মতো দোয়ানিটাও জেব-এ নেই। শব্দ মিশ্র তখন কলকাতার বাইরে। বোধহয় 'ধরতি-কি-লাল' শূটিং-এ বোম্বাইতে। চিন্মোহন সেহানবিশ কী একটা সৌভাগ্যে পত্রিকার দেখাশোনা করেন। অজিত সিংহ-র সঙ্গেও দেখা করল। কোথাও কোন কাজ জোগাড় হল না। কাজ পেলে তবেই তো অগ্রিমের কথা উঠবে। আইলেই আবার নতুন করে কাগজ, পেনসিল, তুলি,

রঙ কেনা সম্ভব। অবস্থাটা যে 'অদ্যভক্ষ্যধনুর্গুণ' সেটা কারও কাছে স্বীকার করতেও পারল না। টলতে টলতে গিয়ে বসেছে বিধান রায়ের বাড়ির বিপরীতে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে। ঠিক সেই মুহূর্তে 'নবাব'-র কোন নিরপেক্ষ চরিত্রে অভিনয়ের আহ্বান পেলে খালেদ বিনা মেক-আপেই মঞ্চে ঢুকে পড়তে পারত।

কোথাও কিছু নেই পিঠে পড়ল এক বিরশি-সিক্কা থাপ্পড় - খালেদ না?

দুর্বল মানুষটা তার ঘোলাটে চোখজোড়া তুলে দেখল। দৃষ্টিটা কেমন যেন ঝাপসা। সামনের মানুষটাকে চেনা-চেনা লাগল—কিন্তু ঠিক চিনতে পারছে না। স্মৃতিশক্তির দোষ নেই। মস্তিস্ক বহুক্ষণ রক্তের যোগান পায়নি।

—কী রে হতভাগা? চিনতে পারছিস না?

খালেদের ঠোঁট দুটি নড়ে উঠল। মুখে কথা ফুটল না। মনে হল, অনেক-অনেক দূরে, উইংস-এর আড়াল থেকে প্রম্পটার পরিচিত ডায়ালগটা প্রম্পট করল : মা-রে, টুক ফ্যান দিবা?

কামারুন হাসান দৃঢ়মুষ্টিতে বন্ধুর মণিবন্ধটা চেপে ধরে বললে, কী হয়েছে রে খালেদ?

সকাল থেকে কিছু পেটে পড়েনি মনে লাগে।

খালেদ কোনক্রমে বললে, পরশু থেকে!

আধঘণ্টা পরে সাদুভালী রেস্তোরাঁয় খালেদ অনুভব করল তার চোখের তারায় তারাকুল ফোটা থেমেছে, কানের ভিতর সেই একটানা ভোঁ-ভোঁটা বন্ধ হয়েছে। লাজুক-লাজুক মুখে বললে, হাসান, তেতাল্লিশের আকালটা যে কী, তা আদিনি ঠিক বুঝিনি.....

বাধা দিয়ে হাসান বললে, ভুল বললি খালেদ। সাধারণ মানুষ খিদের জ্বালা বোঝে জঠর দিয়ে, শিল্পী বোঝে মস্তিস্ক দিয়ে, হৃদয় দিয়ে.....

—বাদ্দে ওসব তাত্ত্বিক আলোচনা। আমাকে খুঁজছিলি কেন?

—শোন বলি!

কাজ পেল খালেদ। অনেক-অনেক কাজ। পোস্টার আঁকার কাজ। ইস্পাহানী-সাহেব নতুন এয়ারওয়েজ খুলেছেন। 'ওরিয়েন্ট এয়ারওয়েজ'। বুলবুল চৌধুরী তার পাবলিক রিলেশন অফিসার। কামারুন হাসান এক-হাতে ম্যানেজ করতে পারছে না। সুযোগ পেলেই গেছে মার্কাস রো-তে। যথারীতি তালা তুলছে। এতদিনে ঘটনাক্রমে সে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে খুঁজে পেয়েছে তার হারানো বন্ধুকে। খালেদ এগিয়ে এল জোয়ালের অপর প্রান্তে কাঁধ পেতে দিতে।

এরপর থেকে বাকি জীবনে 'জঠর জ্বালা' কাকে বলে তা অনুভব করতে হয়নি খালেদকে।

গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করেছেন। বাউল, কীর্তন, ভটিয়ালী, শ্যামাসঙ্গীত, গাজন, আগমণী, জারি-সারি-ভাওয়াইয়া। বুমুর-টসু-ভাদু। মুরশিদা-আলকাপ-গুস্তীরা। মায় পাট-কোটার গান, ধান-মড়াইয়ের গান, ছাদ-পেটানোর গান, এমনকি হাতি পোষ-মানানোর মাহুতি গান। সে এক বিচিত্র সংকলন! পাশ্চাত্য মার্গ

সঙ্গীত যে কোথায়, কেমন করে, কার কাছে শিখেছেন জানি না, কিন্তু নিরঙ্করতা দূরীকরণ সমিতির বিশ্বকোষে একাধিক এন্ট্রি পড়ে বুঝেছি খালেদ ও বিষয়ে এক কনোসর ! এদিকে যাত্রা-সিনেমা-রেকর্ডে কোন গান কে করে গেয়েছেন, কে তার সুরকার। ওদিকে পোস্টার, প্রাচীরপত্র, ফোভার। নাটকের মণ্ডসজ্জা ও পশ্চাদপট সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী অথরিটির প্রামাণ্য বস্তুব্যবহার হক-হুদিস। প্রথম যুগে বহুরূপীর প্রতিটি নাট্য প্রচেষ্টার পিছনে আছে খালেদ চৌধুরীর তুলির স্পর্শ।

কিন্তু সে সব তো হস্তিদেহের অন্যান্য প্রভাস। আমার এস্তিয়ারের বাইরে।

‘প্রচ্ছদশিল্প’-জগতে খালেদ চৌধুরীর যেটি শ্রেষ্ঠ অবদান তা তাঁর লিপিত্যত্ব নয়, বর্ণিকাভাস নয়, রঙের বাহার নয় : তাঁর ‘ঐকান্তিক নিষ্ঠা’। লেখক তাঁর রচনায় ঠিক কী বলতে চান তারই পরিপূরক হওয়া চাই প্রচ্ছদপট। তাঁর কাজ তবলচির—ঠিক মতো ঠোকা দেওয়া। লেখক যখন ধুনে চড়ে তখনই খালেদ তেহাই-এর বোল তোলেন, নচেৎ নয়। কোন রকমে দর্শনধারী একটা রঙ-চঙের আকর্ষণীয় মলটি আঁকাকে খালেদ ‘প্রচ্ছদপট আঁকা’ বলেন না। এ আমি নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। আমার আশি-নব্বই খানি ছাপা বইয়ে আজ পর্যন্ত কয়েক ডজন শিল্পী কাজ করেছেন, তার মধ্যে খালেদ ঐকছেন স্থান-পনের। এমনকি তিন চারখানি দুবার করে। এই পর্যায়ে কিছু উদ্ধৃতি শোনাই আমার একটি উপন্যাসের কৈফিয়ৎ (ভূমিকা) থেকে। বস্তুত এটি আমার লেখা প্রথম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশকালে তার নাম ছিল ‘রাওয়ানা’। সেবার আমি নিজেই প্রচ্ছদ আঁকি। সেটা 1956 সাল। নাম পরিবর্তন করে নতুন করে লিখে তার নাম হয় ‘মহাকালের মন্দির’। তার প্রথম প্রকাশ 1968 ; কিন্তু আমি যে উদ্ধৃতি দিচ্ছি তা কল্পনা প্রকাশনীর তৃতীয় সংস্করণ থেকে ! সেটা 1977 সালের কথা—

“দ্বিতীয় ঘটনা সাম্প্রতিক কালের। তার নায়ক বর্তমান সংস্করণের প্রচ্ছদশিল্পী খালেদ চৌধুরী-সাহেব। সুখীজন মনেই জানেন—বই ছাপাখানা থেকে বের হয়ে আসার শেষ পর্যায়ে লেখক ও প্রচ্ছদশিল্পীর একটা আনুষ্ঠানিক মূল্যাকাংক্ষা ঘটে থাকে। এ-ক্ষেত্রে সে মূল্যাকাংক্ষা খালেদ-সাহেব আমাকে কাং করেছেন। লেখকের দায় কাহিনীর চুখকসার শিল্পীকে বুঝিয়ে দেওয়া। খালেদ-সাহেব একটা বিচিত্রধর্মী প্রচ্ছদশিল্পী। উনি বললেন, ‘চুখকসারটার নয়, গোটা গল্পটা আমি প্রথমে পড়ে নিতে চাই। তারপর বিজ্ঞানসূচক কিছু থাকলে লেখকের কাছ থেকে জেনে নেব।’ এতটা পরিশ্রম কোনও প্রচ্ছদশিল্পী করেন বলে জানি না। তবে নাকি ব্যতিক্রমই নিয়মের পরিচায়ক। যাই হোক ফাইল-কপি আদ্যন্ত পড়ে উনি বললেন, ‘আমার একটাই আপত্তি আছে। ১৯৬০ পৃষ্ঠায় মুকুল কেন বলল, ...তুমি দুটো করিও না। পিসীর কথা শুনিও, আমার মায়ের কথা শুনিও.....এখানে পিসী কে?’ আমি বললুম, ‘কেন ? তিলাঞ্জলি !’

—তিলাঞ্জলি তো সম্পর্কে মুকুলের দিদি। তাই নয় ?

আমি নক্ আউট ! তিন-তিনবার ছাপা হওয়া সত্ত্বেও এ পর্যন্ত কোন পাঠক....”

দীর্ঘ উদ্ধৃতি দিলাম শুধু বোঝাতে খালেদের নিষ্ঠা-বোধটা কত আন্তরিক।

আর একটা ঘটনার কথা বলি। ঐ সত্তরের দশকেই। আমার একটি বই ছাপার কাজ প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। প্রকাশক মশাই বলেন, ‘প্রচ্ছদশিল্পী সম্বন্ধে আপনার



বিশ্বাসঘাতক



অরণ্যের অধিকার



মৃত্যুকাম



প্রবঞ্চক



সেলিম চিত্তির দরগা



ইবাদৎ-খানা-ই-আম'-এর কেন্দ্রীয় স্তম্ভ



তাজমহল

কোন প্রেফারেন্স আছে?' আমি জানিলাম আছে। তাঁর নাম করতেই প্রকাশক তাঁকে উঠলেন। বললেন, কেন দাদা? জরাসন্ধ ছাড়া কি বাজারে প্রচ্ছদশিল্পী নেই।

আমি প্রতিবাদ করি, আরে না না, আমি চারুদার কথা বলিনি। তিনি প্রচ্ছদ আঁকেন না আদৌ। বলছি, খালেদ চৌধুরীর কথা।

—আমিও তাঁর কথাই বলছি। কথাশিল্পে 'জরাসন্ধ' হচ্ছেন চারুচন্দ্র চক্রবর্তী, আর প্রচ্ছদশিল্পে 'জরাসন্ধ' হচ্ছেন খালেদ চৌধুরী। সারা কলেজ স্টীট জানে একথা। আপনি জানেন না?

স্বয়ং খালেদদাকেই প্রশ্ন করেছিলাম। উনি বললেন, তাই নাকি? ওরা বুঝি আমাকে আড়ালে 'জরাসন্ধ' বলে? তা বলতে পারে। দোষ ওদের নয়। দোষ আমারই।

—কী দোষ?

—ঐ ভীমের মতো ফেড়ে ফেলা। যাকগে, বাড়িনি ওসব ফালতু কথা। এখন কী লিখছেন বলুন?

'জরাসন্ধ' খেতাবটি উনি কী ভাবে লাভ করেন সে কথা পরে শুনিছি।

একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কব্বাসাহিত্যিকের একখানি ঢাউস বইয়ের প্রচ্ছদপট আঁকার দায়িত্ব নিয়েছেন খালেদ চৌধুরী। নিজের অলিখিত আইনে আদ্যোপান্ত পাড়ে ফেললেন। সাড়ে পাঁচশ পাতার ফাইল-কপি শেষ করে কাজে হাত দিলেন পরের সপ্তাহে। ছবিখানি নিয়ে প্রকাশককে যেদিন দিতে গেলেন সেদিন লেখকও সেখানে উপস্থিত। তিনি ছবিখানি যত্ন নিয়ে দেখলেন। কাছে থেকে, দূরে ধরে। ডাইনে বেঁকে, বাঁয়ে হেলে। শেষে বললেন, আমি তো ঠিক এ কথা বলতে চাইনি।

খালেদ ঢোক গিললেন। প্রশ্ন করলেন, তাহলে কী কথা বলতে চান আপনি?

লেখক ইতস্তত করে বললেন, সেটা এককথায় কী করে বোঝাই?

প্রকাশক বলেন, বট্টেই তো।

খালেদ বুঝে ওঠেন, 'বট্টেই তো' মানে? উনি তো পাঁচশ তিপার পাতা ধরে বলবার সুযোগ পেয়েছেন, আমিই না বলেছি এক পাতায়? কিন্তু সেই নিগূঢ় কথাটা কী? আমাকে সমঝে নিতে দিন।

প্রকাশক নির্বিরোধী মানুষ। তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, যাগ্গে! আঁক! যখন হয়েই গেছে—

লেখক বলেন, তাহলে এই 'ভার্মিলিয়ান' রঙটা লীল করে দ্বিন। সত্যিই তো, এত পরিশ্রম করে ছবিটি যখন 'ফিনিশ' করে ফেলেছেন...

আবার বাধ্য দিলেন খালেদ চৌধুরী : আঙ্কে ম্যা! ফিনিশিং টাচটুকু দেওয়া বাকি। দিন, ছবিটা আমার হাতে....

ছবিটা তুলে নিলেন গ্রাসটপ টেবিল থেকে। তারপর 'স্বয়া হৃদীকেশ' অন্তরে ওঁকে কোন নির্দেশ দিলেন কি না জানি না। একেবারে মধ্যমপাতলী কায়দায় জরাসন্ধ বধ হয়ে গেল! ছিল একখানা ছবি, নষ্টিয়ে দিলেন দু'খানা। প্রকাশকের দিকে ফিরে বললেন, চলি, রুমস্কার!

দ্বার পর্যন্ত গিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ালেন। দেখলেন, তখনো কেউ স্বাভাবিকতা ফিরে

পায়নি। বললেন, ভাল কথা মনে পড়ল। ঐ রঙটাকে 'ভার্শিলিয়ান' বলে না, ওটার চিত্রশিল্পস্বীকৃত প্রচলিত নাম 'ক্রিমসন লেক'।

উনিশশ বাহার সাল নাগাদ বুঝলেন ভাত-কাপড়-এর মেটিমুটি সংস্থান হয়ে যাবে। বিড়ি-সিগ্রেট-মদের খরচ নেই। প্রয়োজনে ট্রামের সেকেন্ড-ক্লাসে চাপতে সম্ভোচ নেই। যে দেড়-কামরার ঘরখানিতে তিন-চার দশক কাটিয়ে দিলেন তার ভাড়া কত জানি না, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে হলে যে আবর্জনা-স্তুপ পার হতে হবে তাতে 'কাঁঠালের ভুতি' বা 'মরা বেড়ালের ছানা'র দেখা পেলে আশ্চর্য হবেন না। সেসব বাধা অতিক্রম করে যদি বুদ্ধদ্বারের সামনে গিয়ে কলিং বেল-এ হাত হোঁয়ানোর হিম্মৎ হয় তাহলে যিনি দোর খুলে দেবেন তাঁর পরনেও নেই ঢাকহি শাড়ি, কপালেও নেই সিঁদুর। বাজখঁই গলায় লুপি পরা এক ভদ্রলোক জানতে চাইবেন : কী চাই?

বিশ্বাসই হবে না ওঁরই ভুলিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বাজে সিঁদুর-ব্যারোয়ার তান।

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ছে।

'মাছের কাঁটা' নামে একটি গোয়েন্দা গল্পের ফাইল-কপি ওঁকে দিয়ে এসেছি। পড়ে বললেন, প্রচ্ছদে একটা 'ভার্টিব্রাল কলাম' আঁকতে হবে। আপনার কাছে হিউম্যান অ্যানাটমির কোনও স্ট্যান্ডার্ড বই আছে?

আমার সাহস হল না বলতে যে, মানুষের মেবুদভের হাড় মাছের কাঁটার সঙ্গে সম্পর্ক-বিরহিত। তাহলেই আমার ফাইল-কপির জরাসন্ধ বধ হয়ে যাবে। বললুম, আছে। দিয়ে যাব।

তারপর প্রায় দু-বছর কেটে গেছে। 'মাছের কাঁটার' এডিশন পর্যন্ত হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন রাতে টেলিফোন বাজল। আমি ধরতেই বললেন, কে? নারায়ণবাবু? আমি খালেদ। শুনুন মশাই, কাল সকালে একবার আমার বাসায় আসতে পারবেন?

অবাক হয়ে বলি, কেন? কী ব্যাপার?

—আমাকে ওরা কাল বিকালে নার্সিং হোমে রিমুভ করবে। কী সব কাটা-ছেঁড়ার ব্যাপার। ফিরে তো নাও আসতে পারি। আপনার সেই অ্যানাটমির বইখানা তাহলে খোয়া যাবে। ওটা এসে নিয়ে যান।

আমি স্তম্ভিত হয়ে বলি, আপনাকে নার্সিং-হোমে রিমুভ করবে? কেন? কী হয়েছে আপনার?

—বাড়িন ওসব ছেঁদো কথা। কাল সকালে চলে আসুন। কে জানে সেটাই এ যাত্রায় আমাদের শেষ আড্ডা কি না।

কাটা-ছেঁড়া করে মানুষকে বাঁচানো চলে, শিল্পকর্মের মূল্যায়ন হয় না, জানি। কিন্তু শিল্প বিচার করতে হলে সেই অশ্রিয় কাঁড়টা বেরতাই হয়। 'গুণ' বিচার করতে আমরা 'ভাগ' করি।

প্রথম শ্রেণীর প্রচ্ছদ 'চারিত্রপঙ্কজ' শিল্পী। অল্প বর্ণিত নায়কের বা নায়িকার যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লেখক দেখাতে চান তার প্রতিষ্ঠাটিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। নায়কের প্রতিকৃতি। আলোকচিত্র সচরাচর ওঁর পছন্দ নয়। দুটি বা তির্যক ক্ষেত্রে তা আমার নজরে পড়েছে।

প্রথমটি 'ব্রাত্যজনের রুদ্ধসঙ্গীত'। দ্বিতীয়টি 'ষাট-একষটি'। প্রতিকৃতি যদি দিতেই হয় তবে তা তুলিতে আঁকেন। যেমন ধরুন, 'আমি নেতাজীকে দেখেছি'। নেতাজীর একটি ভাল আলোকচিত্র অতি সহজেই জোগাড় করা সম্ভব। সেটাকে মাঝখানে বসিয়ে চারপাশে নানান আলোকচিত্রের 'কোলাজ' করে সস্তায় বাজিমাৎ করা যেত। নেতাজী সংক্রান্ত দশ-বিশখানা বাঙলা বইয়ে দেখবেন—সেটাই বাঁধা ফর্মুলা। খালেদ তাতে গররাজি। পরিবর্তে নেতাজীর 'পরিলেখ' একে অর ভিতর ছোট ছোট চৌখুপিতে নেতাজীর কর্মকাণ্ডের আটটি মর্মাস্তিক দৃশ্য গড়ে তুললেন—সিঙাপুরে প্রথম আবির্ভাব থেকে ঐ সিঙাপুরেরই শহীদস্তুভ।

ঐ প্রচ্ছদপটটি দেখলে আমার মনে পড়ে যায় অজন্তার দ্বিতীয় গুহায় সিলিঙে দেখা একটি নকশার কথা। একটি বিরাট বৃত্তের আলিম্পন। তার ব্যাস প্রায় দুই মিটার। বৃত্তের পরিধি ঘিরে একটা হাঁসের শোভাযাত্রা। গুণে দেখবেন হাঁসের সংখ্যা তেইশটি। প্রশ্ন হচ্ছে : 'তেইশ' কেন? বৃত্তকে যে চার সমকোণে এবং তিনশ ষাট ডিগ্রিতে ভাগ করা হয় একথা সেই আসীরিয় সভ্যতার যুগ থেকে সবাই জানে। অজন্তার শিল্পী যখন ছবিটি আঁকেন তার অন্তত হাজার বছর পূর্বকাল থেকেই ভারতীয় গণিত তা জানত। তাহলে কেন শিল্পী ক্ষমা-যেনা করে আর একটি হাঁসকে ঐ হংসপাঁতিতে প্রবেশ করতে দিলেন না? সেটুকু দক্ষিণা দেখালে প্রতিটি হাঁসের ভাগে জুটত $360 \div 24 = 15^\circ$ স্থান। কিন্তু না! ঐ সহজ-সরল সমাধান বরদাস্ত হল না অজন্তা শিল্পীর। তিনি চোখ-আন্দাজে তিনশ ষাট ডিগ্রিকে সমান তেইশ ভাগ করতে বসলেন! ঠিক যেমন খালেদ চৌধুরী নেতাজীর সহজলভ্য আলোকচিত্রকে বাতিল করে আটটি চৌখুপিতে নেতাজীর মুখের আউট-লাইনের ক্ষুদ্র পরিসরে নিপুণ তুলিতে আঁকতে বসলেন আটটি দৃশ্যের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ একান্তিকা!

কী বলবেন একে? শিল্পীর খেয়াল? একবর্ণগামি? গোঁয়ারতুমি? মূর্খামি? বলুন। যা ইচ্ছে হয় বলুন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আপনাকে মেনে নিতে হবে শিল্পী 'কমার্শিয়াল আর্ট'-এর গোত্রভুক্ত নন, তিনি 'ফাইন আর্টস' ঘরানার! কমার্শিয়াল আর্টিস্টের কাছে সময়ের দাম টাকায়, প্রকৃত শিল্পীর কাছে সময়ের পরিমাপ আনন্দের অনুভূতিতে—সৃষ্টির এবং পরিবেশনের!

ধরুন, 'নেতাজী রহস্য সন্ধান'। এবারেও ফটা গ্রাফ হল না। সেই পরিলেখ বা আউট-লাইন। কিন্তু সে মুখে শ্রাবণধারার মতো ছিটিয়ে পড়েছে এক বাঁক প্রশ্নবোধক চিহ্ন! সে চিহ্নের বিন্দুগুলি রক্ত দিয়ে আঁকা না অক্ষজলে, বোঝা যায় না।

'আমি রাসবিহারীকে দেখেছি' গ্রন্থের প্রচ্ছদ উনিশ-দুবার একেছেন। প্রথমবার, 1973 সালে, 'আনন্দধারা প্রকাশনী'র প্রচ্ছদপটটি খালেদ একটি ফটা ব্যবহার করেছিলেন। চৌদ বছর পরে 'করুণা প্রকাশনী'র এডিশনে যখন উনি ঐ একই গ্রন্থের প্রচ্ছদ নতুন করে আঁকতে বসেন, তখন আমি তাঁকে তাঁর পূর্বকৃত প্রচ্ছদটি দাখিল করেছিলাম। তিনি তা খারিজ করেন। এবার প্রচ্ছদে প্রধানায়ক রাসবিহারীর যে প্রতিকৃতি আঁকলেন তার রস উপলব্ধি করতে হলে বাঁক অন্তত তিন মিটার দূরে রেখে দেখতে হয়। জানতে চেয়েছিলাম, পুরানো প্রচ্ছদটি বাতিল করলেন কেন? হেসে বললেন : ফোর্স

ডাইমেনশন ! টাইম। চৌদ্দ বছর কেটে গেছে যে। অ্যাঙ্গিনে বাঙালী বিলকুল ভুলে গেছে রাসবিহারীকে। তাঁর এক মুঠি ছাই এ চৌদ্দ বছরেও টোকিও থেকে আনা গেল না, দেখছেন না ! মহানায়কের ছবি তাই অস্পষ্ট রেখাতে নতুন করে আঁকতে হল।

লক্ষণীয়, এই কায়দাটা কিন্তু তিনি 'লিভবার্গ' বা 'হাজার চুরাশির মা' গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে আঁকেননি। দুটি ভিন্ন হেতুতে। নেতাজী বা রবীন্দ্রনাথ, কাননবালা বা উত্তমকুমারের ছবি দেখেই বাঙালী পাঠক যেভাবে চিনবে, কর্নেল লিভবার্গকে সেভাবে চিনবে না। পরিচয় পেলে চিনবে। তাই যদিও গ্রন্থের ভিতর লিভবার্গের জন্ম থেকে মৃত্যু বর্ণিত তবু উনি একটি বিশেষ ঘটনাকে গুরুত্ব দিলেন প্রচ্ছদপটে। ওঁর মতে সেটাই ছিল লেখকের মূল প্রতিপাদ্য : সেই উনিশ শ' সাতাশ সালের অবক্ষয়ী দুনিয়ার গালে কর্নেল লিভবার্গ একটি থাপ্পড় মেরে তার সম্মিত ফিরিয়ে এনেছিলেন। এই তথ্যটাই প্রচ্ছদে বিধৃত।

"হাজার চুরাশির মা"—এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটা লেখিকা হাজার বিরাশি বা হাজার সাতাশি করলে কাহিনীর কিছু ইতর-বিশেষ হত না। একই ভঙ্গিমায প্রচ্ছদপটে একই বৃদ্ধাকে মৃত সন্তান ক্রোড়ে বসে থাকতে হত। কারণ হাজার চুরাশি-চিহ্নিত কয়েদীর মা একটা যুগের, একটা আদর্শের, একটা যৌথ আত্মত্যাগের গদ্যোত্তী। ম্যাক্সিম গোর্কির দেশে জন্মালেও ঐ 'মা'-কে ঐ একই ভঙ্গিতে বসে থাকতে হত। তাকে ঘিরে মৃত সন্তান ছাড়া আরও যে ছয়-ছয়টি চরিত্র। দুটি শুয়েছে অভিম শয়ানে, দুটি দ্রুত ধাবমান, বাকি দুজনের হাতে উদ্যত মারণাস্ত্র। এই সব কিছু নিয়েই যে হাজার চুরাশির মায়ের ইতিকথা। যার দুঃখ-ছাপানো মহানুভবতার কথা বলতে চেয়েছেন লেখিকা, কালিকলমে ; শিল্পী, রঙে তুলিতে।

শালগিরার ডাকে আরণ্যক মানুষগুলি দীর্ঘায়ত। চোটিমুণ্ডা আর তার সান্নিপাতরা এল। গ্রেকোর মানুষকেও যেন দৈর্ঘ্যে হারিয়ে দিতে চায়। কিন্তু কবি "বন্দ্যখটি গাঞ্জির জীবন ও মৃত্যু" গ্রন্থের প্রচ্ছদপট রূপায়িত করার সময় একই শৈলীতে ঐকে তার উপর কবির একটি অনবদ্য রেখাচিত্র যোগ করেছেন। কারণ আছে। অলিভার ক্রমওয়েল দেখতে সুন্দর ছিলেন কিনা মানুষ জানতে চায় না—শৌখিনীয়েই তাঁর পরিচয়, যেমন অরণ্যের অধিকার-এর সুগঠিত তনু নায়কের। কিন্তু শৈলী-কীটস-রবীন্দ্রনাথকে শিল্পের প্রয়োজনে সুন্দর হতেই হবে। ফলে প্রচ্ছদপট জুড়ে কবি বন্দ্যখটির মুখমণ্ডলের উপর একটি পরিলেখ।

পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন—খালেদ চৌধুরীর সেকালের প্রচ্ছদপট আমি নতুন করে জোগাড় করতে পারিনি। অনেক বই কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যায় না, গ্রন্থাগারে সেসব বই নতুন করে বাঁধাই হয়ে গেছে। স্মৃতি থেকে বরাতে পারি জ্যোতির্দ্র নদীর 'মীরার দুপুর', প্রতিভা বসুর 'মনের ময়ূর' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল খালেদের প্রচ্ছদ মাথায় নিয়ে। 'বিবাহিত স্ত্রী'-র মাথায় ছিল খালেদের ভুলে দেওয়া ঘোমটা। সমরেশের প্রথম যুগের একাধিক বই, শত্ৰু মিত্রর 'প্রসঙ্গসংকলন', 'নাভানা প্রকাশনী'র অনেক প্রচ্ছদ, 'রূপা'-র অনেক অনেক মলাট, স্বামী প্রসন্নসিংহের একাধিক ধর্মগ্রন্থ। বরিস পাস্তার্নাক-এর একটি অনবদ্য গ্রন্থ বাঙলায় অনূদিত হয়—অনুবাদকের কাছে অপরাধী রয়ে যাচ্ছি—তাঁর নামটা মনে পড়ছে না। মনে আছে খালেদের অনবদ্য প্রচ্ছদটি আর বাঙলা

বইয়ের নামটা : শেষ গ্রীষ্ম ! অবনীন্দ্রনাথ রচনাবলীর মলাটও বোধ হয় খালেদের আঁকা। 'একজন সি. আর. পি. আর একটি নকশাল ভূত' ইদানীং কালের একটি উল্লেখযোগ্য প্রচ্ছদ। কবিতার বইয়ের প্রচ্ছদও একেছেন, এখন ঠিক মনে পড়ছে না। একটি কথা মনে পড়ছে 'আজ ভাল থাক'। হাস্যরসাত্মক গ্রন্থে কার্টুনধর্মী প্রচ্ছদ যদি খালেদ একে থাকেন—যতীন সেন, শৈল চক্রবর্তী, চট্টী লাহিড়ীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, তবে তাও আমার স্মৃতিপথে রেখাপাত করেনি। 'শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা'-র প্রচ্ছদ দেখলে মনে হয় বটে যে ওটা কার্টুন, বাস্তবে তা নয়! 'গণেশ' চরিত্রটিকে লেখিকা যেভাবে একেছেন, প্রচ্ছদে তাকে উপস্থিত করলে কার্টুন বলে ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক। কোন কোন প্রচ্ছদে লিপি-কুশলতার মাধ্যমে গ্রন্থের মেজাজ বা বাতাবরণ ফুটে উঠেছে। এ পদ্ধতি ইংরেজি বইতে বহুবার দেখেছি। বাংলাতেও 'ওমর খৈয়ামের রুবাইয়াৎ'-এ ইতিপূর্বেই দেখা গেছে। আমাদের বক্তব্য, সেই রাগনৈপুণ্যের সুন্দর ব্যবহার খালেদও বহুবার করেছেন। যেমন ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়, লা-জবাব দেহলী—অপরূপা আত্মা অথবা জাপান থেকে ফিরে, প্রভৃতি। পূরবৈয়া, নৈম্বাতে মেঘ, প্রবণক, সুভনুকা কোন দেবদাসীর নাম নয় প্রভৃতি গ্রন্থের প্রচ্ছদপটে কাহিনীর যৌথ বক্তব্য-বিষয় অপূর্ব দক্ষতায় প্রতিভাত।

খালেদ চৌধুরীর আঁকা শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদ কোনটি এ নিয়ে মতভেদ হতেই পারে। শিল্পীকে প্রশংসা করেছিলাম। একই জবাব দিলেন : বাদিন ওসব ফালতু কথা!

কয়েক সহস্র গ্রন্থের ভিতর মাত্র তিনটির উল্লেখ এখানে করে প্রবন্ধের ছেদ টানছি :

এক : অরণ্যের অধিকার : মূল প্রশ্নটি—অরণ্যের অধিকার কার? কাঠুরিয়ার? জংলী সাঁওতালদের? না তো। অরণ্যচারী যাবতীয় প্রাণীর। হাতি থেকে কাঠবিড়ালী, ধনেশ থেকে দুর্গা টুনটুনি, বহুরূপী থেকে প্রজাপতির। কেন্দ্রস্থলে ধনুর্বাণহাতে অরণ্যচারী নায়কের পরিলেখ। সে ঐ দলের। বনকাটির ইজারাপ্রাপ্ত ঠিকাদার আর ঠিকাদারের কাছ থেকে 'এর্থি'-প্রাপ্ত বনরক্ষকের দলের সে নয়। ঐ পরিলেখ বা আউটলাইনের ভিতর আরণ্যক-জীবনের খণ্ড খণ্ড 'ভিগ্‌নেট'। গাছপালা, পাখি-প্রজাপতি, তীর-ধনুক আর সূর্যরশ্মিপায়ী দলের প্রাণপুরুষ মার্ত্তণ্ডদেব। ম্যাজেন্টা পশ্চাদপটে আগুনের যে লেলিহান শিখা ওটা দাবানল নয়, স্বাভাবিক ক্রোধানল। লক্ষ্য করুন আখরগুলো—মিপির মাঝখানে সবুজাভা যেন ক্ষয়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে! নিচে তীরধনুক হাতে এক সূর্য-আদিম আরণ্যক মানুষ : যেন আফ্রিকার থর্ন নদীর অববাহিকার কোন গুহাচিত্র। এই মানুষগুলিও দৈর্ঘ্যে এল, গ্রেকোর মডেলদের পাল্লা দেয়—যেন একসারু দেবদারু গাছ ছুটে চলেছে।

দুই : বিশ্বাসঘাতক : গ্রন্থটির ঠিকমতো জ্ঞাতনির্ণয় করা যাচ্ছে না। প্রচ্ছদেও তাই: স্থানিকটা গোয়েন্দা গল্প, স্থানিকটা হিরোসিমার বিস্ময়কর। আতস কাঁচের ভিতর দিয়ে পড়া যাচ্ছে U_{235} ; এ-পাশে লোহ-আলুমিনিয়াম চাবি, ওপাশে ক্যামেরা। লিপ্যঙ্কনটি লক্ষণীয়। সেটি দু-রঙা, কিন্তু জোড়ার দাগটা অতি সামান্য সরে নড়ে গেছে। যেমন মানবসভ্যতার অজান্তে অলঙ্ঘ্য সর্বোচ্চ সীমা ভূগর্ভে টেকটনিক প্লেট। অথবা মানুষের বিশ্বাসপ্রবণতার বনিয়াদ : মৃত্যুপারিক্ণতি সবুজ রঙের—প্রত্যাশিত শ্বেতকবুতর নয় : যেন তারুণ্যের মৃত্যু। পাখিটি রিয়ালিস্টিক নয়। ক্যামেরা, বহিনোকুলার বা চাবির মতো বাস্তবের হুবহু নকল নয়। যেন শিশুর সরল বিশ্বাসে আঁকা সবুজ 'আয়রে পাখি'। লেখক

যে কথা বলতে পেরেছেন-কি-পারেননি, প্রচ্ছদশিল্পী সে-কথা স্পষ্টাঙ্করে বলেছেন। তাই শোণিতবর্ণের বিস্ফোরণ স্তূপ আর কৃষ্ণবর্ণের কালিমামেঘের ভিতর দু'চারটি ক্ষীণকায় সাদা-মেঘের ডেলা! আর আপনার দৃষ্টি যদি খুব তীক্ষ্ণ হয়, তাহলে নজর করে-দেখুন—ঐ রক্তবর্ণের স্তূপে ডানদিকের কিনারা ঘেঁষে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাদা রঙের ছোপ! হোক এক মিলিমিটারের দশভাগের একভাগ বোধ-এর—শুভ্রতটুকু নিঃশেষে অবলুপ্ত হয়নি। হারিয়ে যায়নি, হারিয়ে যায় না : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ!'

তিন : সত্যকাম : আমার মতে খালেদকৃত শ্রেষ্ঠ প্রচ্ছদ !

আলোছায়ার বৈপরীত্যের যে প্রয়োগ কৌশল তা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ থেকে শিল্পজগতে নিরবচ্ছিন্ন ধারায় স্বীকৃত। ইংরেজিতে তাকে বলে—Chiaroscuro. বাংলা প্রতিশব্দ জানি না। বোধ করি মাসাচ্চিও এর আদি জনক, কিন্তু কারাভাগ্যগো, রুবেন্স এবং বিশেষ করে রেমব্রান্ট তার বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই শৈলী অবলম্বনের এক অলিখিত শর্ত আছে। প্রথর আলোর প্রভাব প্রতিটি চরিত্রে, প্রতিটি বস্তুতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে পড়বে। আলোর যে রঙ, বস্তুতেও সেই রঙ। সেটাই স্বাভাবিক। এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব কারাভাগ্যগো থেকে রেমব্রান্ট সবাই মেনে নিয়েছেন। খালেদও এতকাল তা মেনে চলেছেন। উদাহরণ : তাঁর আঁকা প্রচ্ছদ : 'সম্মুখে ফার্নেস'। কিন্তু এবার তিনি সে রীতির ব্যত্যয় করলেন। সজ্ঞানে। উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। চিত্রার আগুনের আভা পড়েছে নায়ক ও নায়িকার মুখে। কিন্তু নায়কের মুখে আগুনের রক্তিমভাভ নেই—সেখানে সাদা-কালোর (গাঢ় নীল) বৈপরীত্য। চিত্রার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছে শুধুমাত্র সত্যকামজননী জবালার অনিন্দ্য আনন! না, লোকলজ্জায় আজ আর তা রক্তিম নয়—এ লালিমার অর্থ ভিন্নতর : ও এখন বালার্ক-সূর্যের উপমানস্বরূপে রক্তিম। আর তথাকথিত বাবা এবং গর্ভধারিণী সত্যপ্রিয়ী জননীর মাঝখানে সত্যকুলজাত বালককে চিত্রার লেলিহান শিখা বিদ্যুতমাত্র প্রভাবিত করতে পারেনি। Chiaroscuro-র প্রচলিত আইন অস্বীকার করে খালেদ তাকে ঐকিচ্ছেন শুভ্রতার পরিলেখ-এ। সে যেন রোদীয়ার 'খিঙ্কার'-এর ক্ষুদ্র সংস্করণ—চিন্তা করছে!

খালেদের মতেও সে 'দ্বিজোত্তম, সে সত্যকুলজাত!'

খালেদ আজও আছেন আমাদের মধ্যে। যদিও দৃষ্টিজনিত-কারণে তাঁর দৃষ্টি অবসর নিয়েছে প্রায়। তিনি দীর্ঘদিন থাকুন আমাদের মধ্যে—সুস্থ শরীরে, সজীবচেতন, আনন্দঘন হয়ে। কিন্তু যে কাজটি এ বিষয়ে আমি একা হাতে করতে পারলাম না সেটা কি আর কেউ করতে পারেন না? নিদেন পক্ষে খালেদ চৌধুরীর উপস্থিতিতে তাঁর একটি প্রচ্ছদ-প্রদর্শনী? কোন সাংস্কৃতিক সংস্থা বা ক্লাব, অথবা কোনো কলেজ স্ট্রিক্টে তিনি অর্ধশতাব্দীকাল সেবা করেছেন সেই কলেজ স্ট্রিক্টে তাঁর প্রকাশক-সংস্থা কি বই-মেলায় ঐ জাতীয় একটা মণ্ডপ বানিয়ে আমাদের দেখবার সুযোগ দিতে পারেন না?

আমিও আশাবাদী। আমিও বিশ্বাস করি : 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ!'

সংকলন-সূত্র

এই গ্রন্থে 'হাতে-হাতে-ধরি-ধরি' 'রিং-এ-রিং অ' রোজেন্স' বেলার আগে এই 'পকেটফুল অফ প্রোজেন্স' পত্রিকা জগতের 'মিউজিকাল চেয়ার-এ কে কোথায় স্থান পেয়েছিল :

1. লিওনার্দোর নেটিবই : 'প্রমা' রজতজয়ন্তী সংখ্যা।
2. গোপদে প্রতিবিম্বিত পুষ্প : আচার্য সুনীতিকুমারের শ্রাণের পর পল্লব ফিরে সম্পাদিত "সমসাময়িকের দৃষ্টিতে সুনীতিকুমার।"
3. ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপত্য বিভাগের মাসিক পত্রিকা।
4. কুৎস্ব কি হেলানো হিন্দু ম্যাজিক ? : আজকাল-14.6.81
5. আলিওয়াল খাঁ : একজন 'রাজা'র নাম : "প্রমা"-জানুয়ারি 1981.
6. ফতেপুর সিক্রি স্থাপত্য : আজকাল-30.8.91, 1.1.91.
7. তাজমহল ও হিন্দু শিল্পশাস্ত্র : আজকাল- -6.6.82.
8. তাজমহলের নব-মূল্যায়ন : আজকাল।
9. কলকাতা স্থাপত্য কেমন করে এল : আজকাল-23.8.81.
10. বিপের শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা : ব্যস্তবে : শারদীয়া বসুমতী 13.1.81.
11. হিন্দু ধর্মের উষ্মা ও আশ্রি : হিন্দু কলেজের একশো পঁচাত্তরতম পৃষ্ঠি বর্ষে প্রকাশিত 'স্মরণ' পত্রিকা।
12. প্রজ্ঞদশিলী খালেদ চৌধুরী : "খালেদ চৌধুরী বিশেষ সংখ্যা"র আমন্ত্রিত রচনা।